জীববিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণি

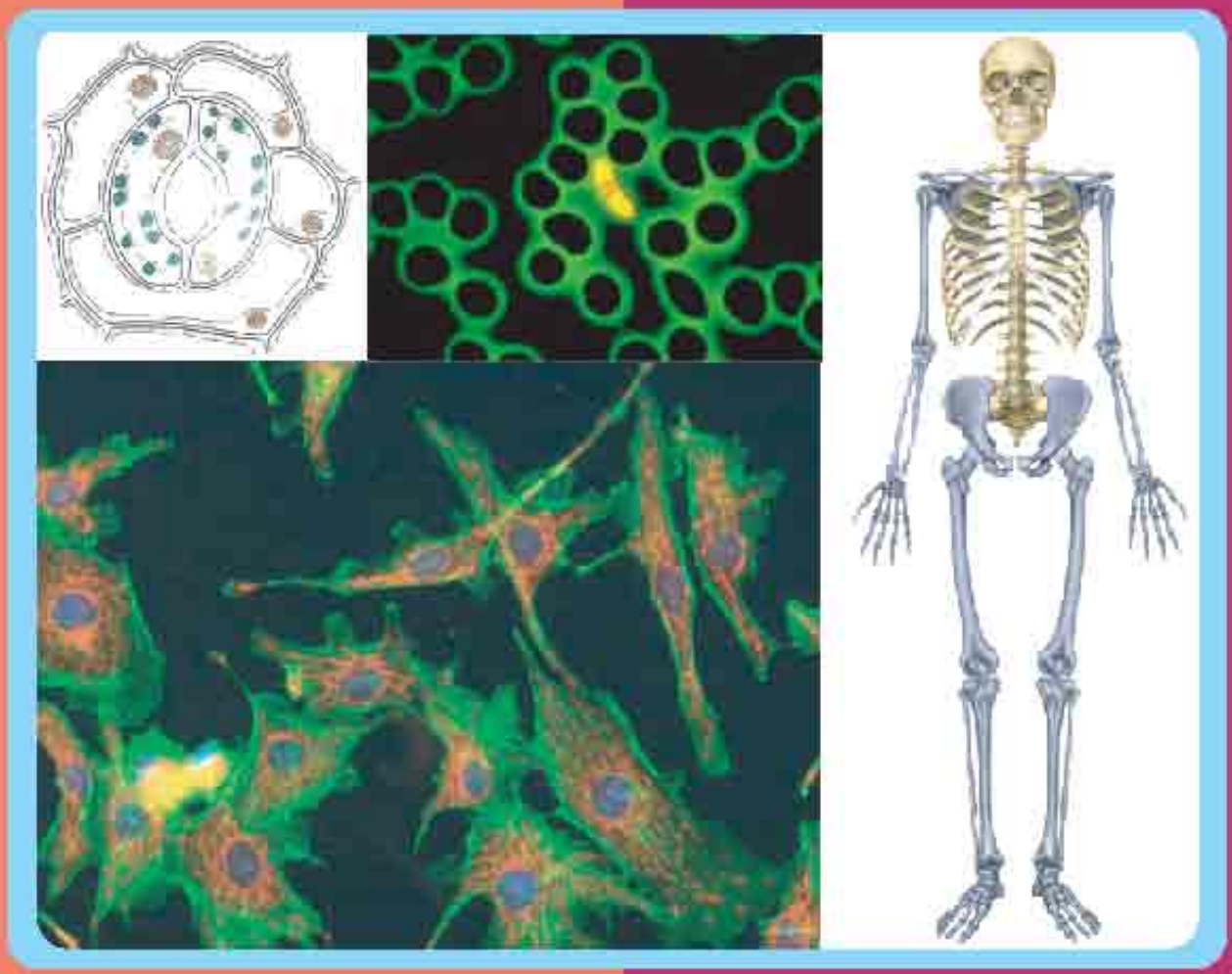

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

PDF Edited By:

MyMahbub.Com

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

RxeweÁvb

beg-`kg †kwY

রচনা

এস. এম. হায়দার

ড. এম. নিয়ামুল নাসের

গুল আনার আহমেদ

মোঃ ইদ্রিস হওলাদার

m¤úv`bv

ড. সৈয়দ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির

ড. মোঃ ইমদাদুল হক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯ZK †evW

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[cKvkK KZK me¯^Z msiw¶Z]

cix¶vgjK ms¯‹iY

c_g cKvk : A‡±vei- 2012

cvV¨c¯K cYq‡b mgšqK

সাহানা আহমেদ

ফাতেমা নাসিমা আখতার

Kw¤cDUvi K‡¤cvR
†jRvi ¯‹¨vb wjwg‡UW

প্রচ্ছদ
m`kb evQvi
mRvDj Av‡e`xb

wPÎv¼b
msMnxZ

wWRvBb
RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯ZK †evW

miKvi KZK webvg‡j¨ weZi‡Yi Rb¨

---

g`Y :

cm½-K_v

wk¶v RvZxq Rxe‡bi me‡ZvgLx Dbq‡bi cekZ| Avi `Z cwieZbkxj we‡ki P¨v‡jÄ †gvKv‡ejv K‡i evsjv‡`k‡K Dbqb I mgwPwi w`‡K wb‡q hvIqvi Rb¨ c‡qvRb mwkw¶Z Rbkw³| fvlv Av‡›`vjb I gw³h‡Pwi †PZbvq †`k Movi Rb¨ wk¶v_xi Aš—wbwnZ †gav I m¤¢vebvi cwicY weKv‡k mvnvh¨ Kiv gva¨wgK wk¶vi Ab¨Zg j¶¨| GQvov cv_wgK ¯—‡i AwRZ wk¶vi †gŠwjK Ávb I `¶Zv m¤¢cmwiZ I mmsnZ Kivi gva¨‡g D"PZi wk¶vi †hvM¨ K‡i †ZvjvI G ¯—‡ii wk¶vi D‡Ïk¨| ÁvbvR‡bi GB cwµqvi wfZi w`‡q wk¶v_x‡K †`‡ki A_©bwZK, mvgwRK, mvs¯‹wZK I cwi‡ekMZ cUfwgi †cw¶‡Z `¶ I †hvM¨ bvMwiK K‡i †ZvjvI gva¨wgK wk¶vi Ab¨Zg we‡eP¨ welq|

RvZxq wk¶vbxwZ-2010 Gi j¶¨ I D‡Ïk¨‡K mvg‡b †i‡L cwigwRZ n‡q‡Q gva¨wgK ¯—‡ii wk¶vµg| cwigwRZ GB wk¶vµ‡g RvZxq Av`k, j¶¨, D‡Ïk¨ I mgKvjxb Pwn`vi cwZdjb NUv‡bv n‡q‡Q, †mB mv‡_ wk¶v_x‡`i eqm, †gav I MnY¶gZv Abhvqx wkLbdj wbaviY Kiv n‡q‡Q| GQvov wk¶v_xi ^bwZK I gvbweK gj¨‡eva †_‡K ïi K‡i BwZnvm I HwZn¨ †PZbv, gnvb gw³h‡Pwi †PZbv, wkí-mwnZ¨-ms¯‹wZ‡eva, †`k‡cg‡eva, cKwZ-†PZbv Ges ag-eY-†MvÎ I bvix-cil wbwe‡k‡l mevi cwZ mgghv`v‡eva RvMZ Kivi †Póv Kiv n‡q‡Q| GKwU weÁvbgb¯‹ RwZ MV‡bi Rb¨ Rxe‡bi cwZwU †¶‡Î weÁv‡bi ¯^Zt ù Z c‡qvM I wWwRUvj evsjv‡`‡ki রূcKí-2021 Gi j¶¨ ev¯—evq‡b wk¶v_x‡`i m¶g K‡i †Zvjvi †Póv Kiv n‡q‡Q|

bZb GB wk¶vµ‡gi Av‡jv‡K cYxZ n‡q‡Q gva¨wgK ¯—‡ii cvq mKj cvV¨c¯—K| D³ cvV¨c¯—K cYq‡b wk¶v_x‡`i mvg_¨, ceYZv I ce AwfÁZv ¸i‡Zi m‡½ we‡ePbv Kiv n‡q‡Q| cvV¨c¯—K¸‡jvi welq wbevPb I Dc¯'vc‡bi †¶‡Î wk¶v_xi mRbkxj cwZfvi weKvk mva‡bi w`‡K we‡klfv‡e ¸iZ †`Iqv n‡q‡Q| cwZwU Aa¨v‡qi ïi‡Z wkLbdj h³ K‡i wk¶v_xi AwRZe¨ Áv‡bi Bw½Z c`vb Kiv n‡q‡Q Ges wewPÎ KvR, mRbkxj ck I Ab¨vb¨ ck ms‡hvRb K‡i gj¨vqb‡K mRbkxj Kiv n‡q‡Q|

GKwesk kZvãx n‡"Q RxeweÁv‡bi weKv‡ki GKwU ¸iZcY kZK| RxeweÁvb wk¶vi gj DcRxe¨ n‡"Q Rxeb †_‡K ZwËK I cv‡qwMK wk¶v MnY| Avi wk¶v Mn‡Yi avivewnKZvq cKwZ I Rxeb‡K Rvbv GKwU Ab¯^xKvh welq| beg I `kg †kwYi RxeweÁv‡bi bZb wk¶vµ‡g Avb‡›`i mv‡_ RxeRMZ‡K Rvbvi †mB m‡hvM mwó Kiv n‡q‡Q| GLv‡b RxeweÁvb‡K Rvbvi Rb¨ ^eÁvwbK aviYv I Z‡Ëi cvkvcwk RxebwfwËK cv‡qwMK †¶‡Îi Dcil ¸iZ †`Iqv n‡q‡Q| Gi gva¨‡g wk¶v_x‡`i gL¯'wbfiZv eûjvs‡k nvm cv‡e I Zviv AwRZ Ávb I Abaveb ev¯—e Rxe‡b c‡qvM Ki‡Z I †h‡Kv‡bv welq‡K wePvi-we‡kl‡Y I gj¨vqb Ki‡Z cvi‡e|

GKwesk kZ‡Ki A½xKvi I cZ¨q‡K mvg‡b †i‡L cwigwRZ wk¶vµ‡gi Av‡jv‡K iwPZ cvV¨c¯ÍKwU cix¶vgjK ms¯‹iY wn‡m‡e cKwkZ n‡jv| Kv‡RB cvV¨c¯ÍKwUi AvIl mgwPwmva‡bi Rb¨ †h †Kv‡bv MVbgjK I hw³m½Z civgk ¸i‡Zi m‡½ we‡ewPZ n‡e| cvV¨c¯ÍK cYq‡bi wecj Kgh‡Á AwZ ¯^í mg‡qi g‡a¨ c¯ÍKwU iwPZ n‡q‡Q| d‡j wKQ fjÎwU †_‡K †h‡Z cv‡i| cieZx ms¯‹iY¸‡jv‡Z cvV¨c¯ÍKwU‡K AvIl m›`i, †kvfb I ÎwUg³ Kivi †Póv Ae¨vnZ _vK‡e| cvV¨c¯—KwU‡Z evbv‡bi †¶‡Î AbmZ n‡q‡Q evsjv GKv‡Wgx KZK cYxZ evbvbixwZ|

cvV¨c¯ÍKwU iPbv, m¤úv`bv, wPÎv¼b, bgbv ckw` cYqb I cKvkbvi Kv‡R hviv AvšÍwiKfv‡e †gav I kg w`‡q‡Qb Zv‡`i ab¨ev` Ávcb KiwQ| cvV¨c¯ÍKwU wk¶v_x‡`i Avbw›`Z cvV I cZ¨wkZ `¶Zv ARb wbwðZ Ki‡e e‡j Avkv Kwi|

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

Aa¨vq	we l qe¯‘	cô
প্রথম	জীবন পাঠ	১
দ্বিতীয়	জীব কোষ ও টিস্যু	১১
তৃতীয়	কোষ বিভাজন	৩২
চতুর্থ	জীবনীশক্তি	৪০
পÂম	খাদ্য, পুষ্টি এবং পরিপাক	৫৪
ষষ্ঠ	জীবে পরিবহণ	৮২
সপ্তম	গ্যাসীয় বিনিময়	১০৪
অষ্টম	মানব রেচন	১১৭
নবম	দৃঢ়তা প্রদান ও চলন	১২৪
দশম	সমন্বয়	১৩৪
একাদশ	জীবের প্রজনন	১৫২
দ্বাদশ	জীবের বংশগতি ও বিবর্তন	১৬৭
ত্রয়োদশ	জীবের পরিবেশ	১৭৮
চতুর্দশ	জীব প্রযুক্তি	১৯৩

প্রথম অধ্যায়

জীবন পাঠ

মানব সভ্যতা বিকাশে বর্তমান শতকের চ্যালেঞ্জ খাদ্য উৎপাদনে, চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়নে এবং বিরূপ পরিবেশে জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় জীববিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিসীম। এই অধ্যায়ে জীববিজ্ঞানের সংজ্ঞা, শাখাসমূহের নাম ও জীবের নামকরণের পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

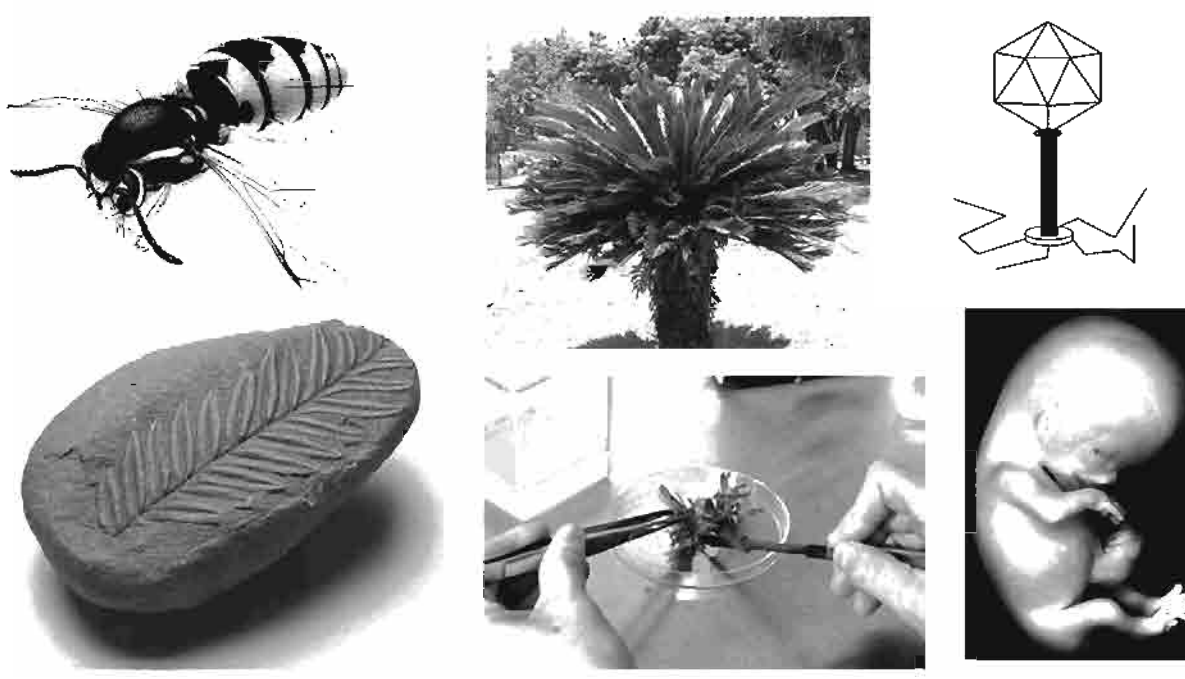

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- জীববিজ্ঞানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীববিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- জীবের শ্রেণিবিন্যাসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারব।
- জীবের শ্রেণিবিন্যাসকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- দ্বিপদ নামকরণের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তবজীবনে জীবের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে পারব।

জীববিজ্ঞানের ধারণা

প্রকৃতিতে আমরা সাধারণত জড় পদার্থ ও জীব এই দুই ধরনের বস্তু দেখতে পাই। জড় পদার্থের গুণাগুণ পদার্থ বা রসায়ন বিজ্ঞান শাখায় পর্যালোচনা করা হয়। আর জীবের জীবন ও গুণাগুণ নিয়ে যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে জীববিজ্ঞান বলে। জীববিজ্ঞান প্রকৃতি বিজ্ঞানের একটি প্রাচীনতম শাখা। পৃথিবীতে প্রথম জীবের আগমনের আগেই এর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল, এ সম্বন্ধে তোমরা উচ্চতর শ্রেণিতে আরও জানতে পারবে।

জীববিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্ভিদ, বিভিন্ন প্রাণী ও মানব জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। সৃষ্টিজগতে জীবকোষের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন এক রহস্যপূর্ণ বিষয়। এ কারণে জীববিজ্ঞানের জ্ঞান জীবদেহের বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গের গঠন, বিভিন্ন রাসায়নিক কার্যক্রম, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, পুষ্টি গ্রহণ কিংবা প্রজননে প্রধান ভূমিকা রাখে। জীবনের সব ধাপে কোষের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের দৈনন্দিন কাজে ও অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে। অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের উপাদানে জীববিজ্ঞানের মূল ভিত্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে। হাঁটা–চলা করার সময় পা পরিচালনা করে আমাদের পেশি, পেশিকে চালনা করে স্নায়ুতন্ত্র, আর রক্ত সংবহনতন্ত্র পেশির রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে অক্সিজেন, পুষ্টি ও শক্তি যোগায়। এক কোষী প্রাণী একইভাবে অক্সিজেন, পুষ্টি ও শক্তি ব্যবহার করে বেঁচে থাকে। আর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন অক্সিজেন ও শক্তি। প্রাণী এ শক্তি সবুজ উদ্ভিদ দ্বারা উৎপাদিত খাদ্য ও অন্যান্য উৎস থেকে পেয়ে থাকে।

বিজ্ঞানের অন্যতম একটি মৌলিক শাখা জীববিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানের ইংরেজি পরিভাষা Biology। Biology শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দ bios অর্থ জীবন এবং logos অর্থ জ্ঞান এর সমন্বয়ে গঠিত। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলকে (খৃস্টপূর্ব ৩৮৪–৩২২) জীববিজ্ঞানের জনক বলা হয়। বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের গঠন, জৈবনিক ক্রিয়া এবং জীবনধারণ সম্পর্কে সম্যক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পাওয়া যায় তাকেই জীববিজ্ঞান (Biology) বলা হয়।

জীববিজ্ঞানের শাখাসমূহ

জীবের ধরন অনুসারে জীববিজ্ঞানকে প্রধান দুটি শাখায় ভাগ করা হয়, যথা উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান। জীবের কোন দিক নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে জীববিজ্ঞানকে আবার ভৌত জীববিজ্ঞান ও ফলিত জীববিজ্ঞান এ দুটি শাখায় ভাগ করা হয়।

ভৌত জীববিজ্ঞান

ভৌত জীববিজ্ঞান শাখায় তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এতে সাধারণত নিচে উল্লিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়:

১. **অঙ্গসংস্থান (Morphology) :** জীবের সার্বিক অঙ্গসংস্থানিক বা দৈহিক গঠন বর্ণনা। দেহের বাহ্যিক বর্ণনার বিষয়কে বহিঃঅঙ্গসংস্থান (external morphology) এবং দেহের অভ্যন্তরীণ বর্ণনার বিষয়কে আন্তঃঅঙ্গসংস্থান (internal morphology) বলা হয়।

২. **শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা বা ট্যাক্সোনমি (Taxonomy) :** জীবের শ্রেণিবিন্যাস ও রীতিনীতিসমূহ এ শাখার আলোচিত বিষয়।

৩. **শারীরবিদ্যা (Physiology)** : জীবদেহের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জৈবরাসায়নিক কার্যাদি এ শাখায় আলোচিত হয়। এছাড়াও জীবের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজের বিবরণ এ শাখায় পাওয়া যায়।

৪. **হিস্টোলজি (Histology)** : জীবদেহের টিস্যুসমূহের গঠন, বিন্যাস ও কার্যাবলি এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

৫. **ভ্রূণবিদ্যা (Embryology) :** জীবের ভ্রূণের পরিস্ফুরণ সম্পর্কে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

৬. **কোষবিদ্যা (Cytology):** জীবদেহের একক কোষের গঠন, কার্যাবলি ও বিভাজন সম্পর্কে যাবতীয় আলোচনা এ শাখার বিষয়।

৭. **বংশগতিবিদ্যা বা জেনেটিক্স (Genetics) :** জিন ও বংশগতিধারা সম্পর্কে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

৮. **বিবর্তনবিদ্যা (Evolution) :** পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ, জীবের বিবর্তন এবং ক্রমবিকাশের তথ্যসমূহের আলোচনা এ শাখার বিষয়।

৯. **বাস্তুবিদ্যা (Ecology) :** প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে জীবের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক বিজ্ঞান।

১০. **এন্ডোক্রাইনোলজি (Endocrinology) :** জীবদেহে হরমোন (hormone)-এর কার্যকারিতা বিষয়ক জ্ঞান আলোচনা এ শাখার বিষয়।

১১. **জীবভূগোল (Biogeography) :** জীবের ভৌগোলিক বিস্তারের সাথে ভূমন্ডলের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত বিদ্যা।

ফলিত জীববিজ্ঞান

জীবন–সংশ্লিষ্ট প্রায়োগিক বিষয়সমূহ এ শাখার অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শাখা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. **প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা (Palaeontology) :** জীববিজ্ঞানের এ শাখায় প্রাগৈতিহাসিক জীবের বিবরণ এবং জীবাশ্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

২. **জীবপরিসংখ্যান বিদ্যা (Biostatistics) :** জীব পরিসংখ্যান বিষয়ক বিজ্ঞান।

৩. **পরজীবীবিদ্যা (Parasitology) :** পরজীবিতা, পরজীবী জীবের জীবনপ্রণালি এবং রোগ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

৪. **মৎস্যবিজ্ঞান (Fisheries):** মাছ, মাছ উৎপাদন, মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

৫. **কীটতত্ত্ব (Entomology) :** কীটপতঙ্গের জীবন, উপকারিতা, অপকারিতা, ক্ষয়ক্ষতি, দমন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

৬. **অণুজীববিজ্ঞান (Microbiology) :** ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং অন্যান্য অণুজীব সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

৭. **কৃষিবিজ্ঞান (Agriculture) :** কৃষি বিষয়ক বিজ্ঞান।

৮. **চিকিৎসাবিজ্ঞান (Medical science) :** মানব জীবন, রোগ, চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

৯. **জিন প্রযুক্তি (Genetic Engineering) :** জিন প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

১০. **প্রাণরসায়ন (Biochemistry) :** জীবের প্রাণরাসায়নিক কার্যপ্রণালি, রোগ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

১১. **মৃত্তিকা বিজ্ঞান (Soil science) :** মাটি, মাটির গঠন ও পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

১২. **পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental science) :** পরিবেশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

১৩. **সমুদ্র বিজ্ঞান (Oceanography) :** সমুদ্র ও সমুদ্র সম্পদ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

১৪. **বন বিজ্ঞান (Forestry) :** বন, বন সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

১৫. **জীব প্রযুক্তি (Biotechnology) :** মানব ও পরিবেশের কল্যাণে জীব ব্যবহারের প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

১৬. **ফার্মেসি (Pharmacy) :** ঔষধ শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিজ্ঞান।

১৭. **বন্যপ্রাণিবিদ্যা (Wildlife) :** বন্যপ্রাণী বিষয়ক বিজ্ঞান।

১৮. **বায়োইন্‌ফরমেটিকস্ (Bioinformatics) :** কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর জীববিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য যেমন ক্যানসার ইত্যাদি বিশ্লেষণ বিষয়ক বিজ্ঞান।

কাজ : নিচের চিত্র দেখে কোনটি জীববিজ্ঞানের কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

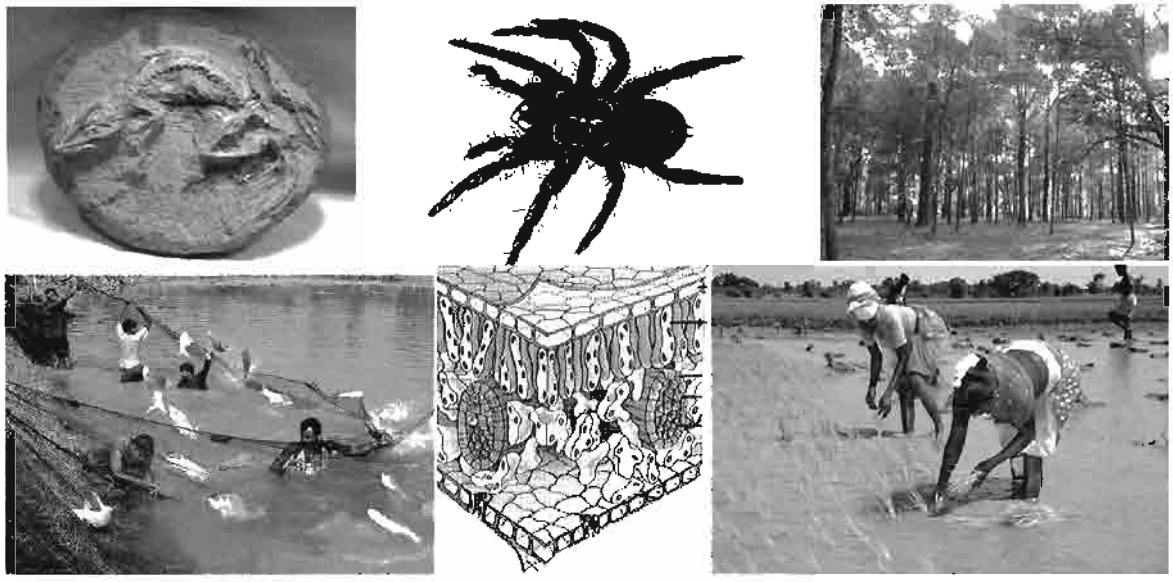

শ্রেণিবিন্যাস

আজ পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রায় চার লক্ষ ও প্রাণীর প্রায় তের লক্ষ প্রজাতির নামকরণ ও বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ সংখ্যা চূড়ান্ত নয়, কেননা প্রায় প্রতিদিনই আরও নতুন নতুন প্রজাতির বর্ণনা সংযুক্ত হচ্ছে। অনুমান করা হয় যে, ভবিষ্যতে সব জীবের বর্ণনা শেষ হলে এর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় এক কোটিতে। জানা, বোঝা এবং শেখার সুবিধার্থে এই অসংখ্য প্রাণীকে সুষ্ঠুভাবে বিন্যাস করা বা সাজানোর প্রয়োজন। প্রাণিজগৎকে একটি স্বাভাবিক নিয়মে শ্রেণিবিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য অনেক আগেই প্রকৃতিবিদগণ অনুভব করেছিলেন। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই জীববিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে এখন গড়ে উঠেছে ট্যাক্সোনমি বা শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা। শ্রেণিবিন্যাসের লক্ষ্য মূলত একটাই। তা হচ্ছে এই বিশাল ও বৈচিত্র্যময় জীবজগৎকে সহজভাবে অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সময়ে সঠিকভাবে জানা।

শ্রেণিবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন সুইডিস প্রকৃতিবিদ ক্যারোলাস লিনিয়াস (১৭০৭–১৭৭৮)। ১৭৩৫ সালে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভের পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ, বিশেষ করে ফুল সংগ্রহ ও জীবের শ্রেণিবিন্যাসে তার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম জীবের পূর্ণ শ্রেণিবিন্যাসের এবং নামকরণের ভিত্তি প্রবর্তন করেন। অসংখ্য জীবনমুনার বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে তিনি জীবজগতকে দুটি ভাগে যথা উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগৎ হিসেবে বিন্যস্ত করেন।

Systema Naturae গ্রন্থের ১০ম সংস্করণে (১৭৫৮) লিনিয়াস জীবের নামকরণের ক্ষেত্রে দ্বিপদ নামকরণ নীতি প্রবর্তন করেন এবং গণ (Genus) ও প্রজাতির (Species) সংজ্ঞা দেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকৃতি, গঠন ও বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে তাদের নামকরণ করা হয়। পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে জীবকে বিভিন্ন দলে বিভক্তকরণকে শ্রেণিবিন্যাস বলে।

শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য

শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি জীবের দল ও উপদল সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা। জীবজগতের ভিন্নতার প্রতি আলোকপাত করে আহরিত জ্ঞানকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা এবং প্রতিটি জীবকে শনাক্ত করে তার নামকরণের ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি জীবজগৎ ও মানব কল্যাণে প্রয়োজনীয় জীবসমূহকে শনাক্ত করে তাদের সংরক্ষণ অথবা প্রজাতিগত সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া।

জীবজগৎ

ক্যারোলাস লিনিয়াস–এর সময়কাল থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জীবজগৎকে উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগৎ হিসেবে বিবেচনা করে দু'টি রাজ্যে (Kingdom) শ্রেণিবিন্যাস করা হতো। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় বর্তমানে কোষের ডি.এন.এ ও আর.এন. এ–এর প্রকারভেদ, জীবদেহে কোষের বৈশিষ্ট্য, কোষের সংখ্যা ও খাদ্যাভ্যাসের তথ্য–উপাত্তের উপর ভিত্তি করে আর. এইচ. হুইট্‌টেকার (R. H. Whittaker) ১৯৬৯ সালে জীবজগৎকে পাঁচটি রাজ্য বা ফাইভ কিংডমে (Five Kingdom) ভাগ করার প্রস্তাব করেন। পরবর্তীকালে মারগুলিস (Margulis) ১৯৭৪ সালে Whittaker–এর শ্রেণিবিন্যাসের পরিবর্তিত ও বিস্তারিত রূপ দেন। তিনি সমস্ত জীবজগৎকে দুটি সুপার কিংডমে ভাগ করেন এবং পাঁচটি জগৎকে এই দু'টি সুপার কিংডমে আওতাভুক্ত করেন।

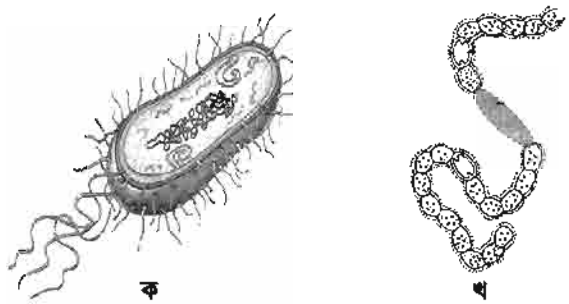

চিত্র ১.১ : ক) ব্যাকটেরিয়া, খ) *Nostoc* (নীলাভ সবুজ শৈবাল)

সুপার কিংডম–১ : প্রোক্যারিওটা (Prokaryota)

এরা আদিকোষ বিশিষ্ট এককোষী, আণুবীক্ষণিক জীব

রাজ্য– ১: মনেরা (Monera)

বৈশিষ্ট্য : এরা এককোষী, ফিলামেন্টাস, কলোনিয়াল বা মাইসেলিয়াল। কোষে ক্রোমাটিন বস্তু থাকে কিন্তু নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার পর্দা নেই। এদের কোষে প্লাস্টিড, মাইট্রোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা ইত্যাদি নাই, কিন্তু রাইবোসোম আছে। কোষ বিভাজন দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। প্রধানত শোষণ পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণ করে। তবে কেউ কেউ ফটোসিনথেটিক বা কেমোসিনথেটিক (রাসায়নিক সংশ্লেষ) পদ্ধতিতে খাদ্য প্রস্তুত করে।

উদাহরণ : নীলাভ সবুজ শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া।

সুপার কিংডম–২ : ইউক্যারিওটা (Eukaryota)

এরা প্রকৃত কোষবিশিষ্ট এককোষী বা বহুকোষী এককভাবে অথবা কলোনি আকারে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে।

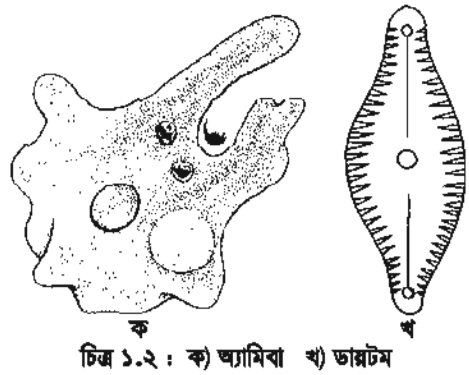

চিত্র ১.২ : ক) অ্যামিবা খ) ডায়টম

রাজ্য– ২ : প্রোটিস্টা (Protista)

বৈশিষ্ট্য : এরা এককোষী বা বহুকোষী, একক বা কলোনিয়াল বা ফিলামেন্টাস এবং সুগঠিত নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট। কোষে ক্রোমাটিন বস্তু নিউক্লিয়ার পর্দা দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে। ক্রোমাটিন বস্তুতে DNA, RNA ও প্রোটিন থাকে। কোষে সকল ধরনের অঙ্গাণু থাকে। খাদ্য গ্রহণ

শোষণ, গ্রহণ বা ফটোসিনথেটিক পদ্ধতিতে ঘটে। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অযৌন প্রজনন ঘটে এবং কনজুগেশনের মাধ্যমে যৌন প্রজনন ঘটে। কোনো ভ্রূণ গঠিত হয় না।

উদাহরণ : প্রোটোজোয়া (অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম) ও এককোষী শৈবাল, যেমন ডায়াটম।

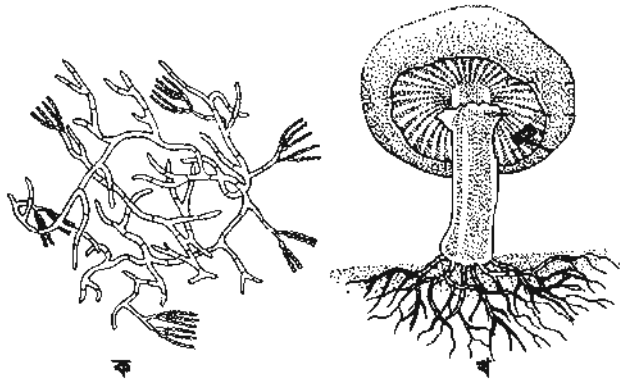

ক খ

চিত্র ১.৩ : ক *Penicillium* খ মাশরুম

রাজ্য– ৩ : ফানজাই (Fungi)

বৈশিষ্ট্য : অধিকাংশই স্থলজ, মৃতজীবী বা পরজীবী। দেহ এককোষী অথবা মাইসেলিয়াম দিয়ে গঠিত। এদের নিউক্লিয়াস সুগঠিত। কোষপ্রাচীর কাইটিন বস্তু দিয়ে গঠিত। খাদ্যগ্রহণ শোষণ পদ্ধতিতে ঘটে। ক্লোরোপ্লাস্ট অনুপস্থিত। হ্যাপ্লয়েড স্পোর দিয়ে বংশ বৃদ্ধি ঘটে। মিয়োসিস এর মাধ্যমে কোষ বিভাজন ঘটে।

উদাহরণ : ঈস্ট, *Penicillium,* মাশরুম ইত্যাদি।

রাজ্য– ৪ : প্লানটি (Plantae)

বৈশিষ্ট্য : এরা প্রকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত সালোকসংশ্লেষণকারী উদ্ভিদ। এদের উন্নত টিস্যুতন্ত্র বিদ্যমান। এদের ভ্রূণ সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে ডিপ্লয়েড পর্যায় শুরু হয়। প্রধানত স্থলজ তবে অসংখ্য জলজ প্রজাতি আছে। এদের যৌন জনন অ্যানাইসোগ্যামাস ধরনের। এরা আর্কিগোনিয়েট ও পুষ্পক উদ্ভিদ।

উদাহরণ : উন্নত সবুজ উদ্ভিদ, বহুকোষী শৈবাল।

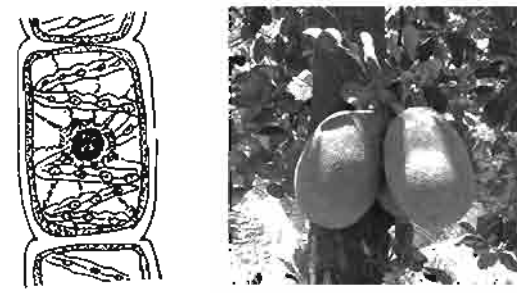

ক খ

চিত্র ১.৪ : ক) *Spirogyra* (বহুকোষী শৈবাল) খ) কাঁঠাল গাছ

রাজ্য– ৫ : অ্যানিমেলিয়া (Animalia)

বৈশিষ্ট্য : এরা সুকেন্দ্রিক ও বহুকোষী প্রাণী। এদের কোষে কোনো জড় কোষপ্রাচীর, প্লাস্টিড ও কোষ গহ্বর নাই। প্লাস্টিড না থাকায় এরা হেটারোট্রাফিক অর্থাৎ পরভোজী, এবং খাদ্য গলাধঃকরণ করে ও হজম করে, দেহে জটিল টিস্যুতন্ত্র বিদ্যমান। এরা প্রধানত যৌন জননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। পরিণত ডিপ্লয়েড পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীর জননাঙ্গ থেকে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট উৎপন্ন হয়। ভ্রূণ বিকাশকালীন সময়ে ভ্রূণীয় স্তর সৃষ্টি হয়।

চিত্র ১.৪ : রয়েল বেঙ্গল টাইগার

উদাহরণ : সকল অমেরুদন্ডী (প্রোটোজোয়া ছাড়া) এবং মেরুদন্ডী প্রাণী।

২০০৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টমাস কেভলিয়ার–স্মিথ (Thomas Cavalier-Smith) জীবজগতের প্রোটিস্টাকে প্রোটোজোয়া (Protozoa) ও ক্রোমিস্টা (Chromista) নামে দুইটি ভাগে ভাগ করেন এবং মনেরাকে ব্যাকটেরিয়া রাজ্য হিসেবে পুনঃনামকরণ করেন। এভাবে তিনি জীবজগৎকে মোট ছয়টি রাজ্যে ভাগ করেছেন। এ বিষয়ে তোমরা উপরের শ্রেণিতে আরও বিস্তারিত জানবে।

শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপ

জীবের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য কতগুলো একক বা ধাপ আছে, সর্বোচ্চ একক হলো জগৎ ও সর্বনিম্ন একক হলো প্রজাতি। একটি জীবকে প্রজাতি পর্যন্ত বিন্যাসের ক্ষেত্রে মূলত ৭টি ধাপ আছে। ধাপগুলো হলো :

জগৎ (Kingdom)
পর্ব (Phylum)/ বিভাগ (Division)
শ্রেণি (Class)
বর্গ (Order)
গোত্র (Family)
গণ (Genus)
প্রজাতি (Species)

আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসে এই ধাপগুলোকে প্রয়োজনে আরও নির্দিষ্ট উপ–ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি

একটি জীবের বৈজ্ঞানিক নাম দুটি অংশ বা পদ নিয়ে গঠিত হয়। প্রথম অংশটি তার গণের নাম ও দ্বিতীয় অংশটি তার প্রজাতির নাম। যেমন গোলআলুর বৈজ্ঞানিক নাম Solanum tuberosun। এখানে Solanum গণ নাম ও tuberosum প্রজাতির নাম, এরূপ দুটি পদ নিয়ে গঠিত নামকে দ্বিপদ নাম এবং নামকরণের প্রক্রিয়াকে দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি বলে। দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির লক্ষ্য একটাই। তা হচ্ছে এই বৈচিত্র্যময় জীবজগতের প্রতিটি জীবকে আলাদা নামে সঠিকভাবে জানা। আন্তর্জাতিকভাবে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে জীবের বৈজ্ঞানিক নাম নির্ধারণ করা হয়। উদ্ভিদের নাম International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) কর্তৃক এবং প্রাণীর নাম International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) কর্তৃক স্বীকৃত নিয়মানুসারে হতে হবে। প্রকৃত পক্ষে এই code পুস্তকাকারে লিখিত দলিল। নামকরণ ল্যাটিন শব্দে হওয়ায় কোনো জীবের বৈজ্ঞানিক নাম সারা বিশ্বে একই নামে পরিচিত হয়।

সুইডিস বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস তাঁর *Systema Naturae* গ্রন্থের ১০ম সংস্করণে দ্বিপদ নামকরণ নীতি প্রবর্তন করেন এবং গণ ও প্রজাতির সংজ্ঞা দেন। তিনিই প্রথম ঐ গ্রন্থে জীবের শ্রেণি, বর্গ, গণ এবং প্রজাতি ধাপগুলো ব্যবহার করেন। লিনিয়াসের এই দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার আবিষ্কার। এ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি জীবের –

১. নামকরণে অবশ্যই ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করতে হবে।
২. বৈজ্ঞানিক নামের দুটি অংশ থাকবে, প্রথম অংশটি গণ নাম এবং দ্বিতীয় অংশটি প্রজাতি নাম। যেমন: *Labeo rohita*। এটি রুই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম, এখানে Labeo rohita গন নাম এবং প্রজাতিক নাম।
৩. জীবজগতের প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নামকে অনন্য (unique) হতে হয়। কারণ একই নাম দুটি পৃথক জীবের জন্য ব্যবহারের অনুমতি নেই।
৪. বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম অংশের প্রথম অক্ষর বড় অক্ষর হবে বাকি অক্ষরগুলো ছোট অক্ষর হবে এবং দ্বিতীয় অংশটির নাম ছোট অক্ষর দিয়ে লিখতে হবে। যেমন– পিঁয়াজ– *Allium cepa*, সিংহ– *Panthera leo*।

৫. বৈজ্ঞানিক নাম মুদ্রণের সময় সর্বদা ইটালিক অক্ষরে লিখতে হবে। যেমন: ধান– *Oryza sativa,* কাতল মাছ– *Catla catla*।

৬. হাতে লেখার সময় গণ ও প্রজাতিক নামের নিচে আলাদা আলাদা দাগ দিতে হবে। যেমন: Oryza sativa, Catla catla।

৭. যদি কয়েকজন বিজ্ঞানী একই জীবকে বিভিন্ন নামকরণ করেন, তবে অগ্রাধিকার আইন অনুসারে প্রথম বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত নামটি গৃহীত হবে।

৮. যিনি প্রথম কোনো জীবের বিজ্ঞানসম্মত নাম দিবেন তাঁর নাম সনসহ উক্ত জীবের বৈজ্ঞানিক নামের শেষে সংক্ষেপে সংযোজন করতে হবে।

কয়েকটি জীবের দ্বিপদ নাম :

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
ধান	*Oryza sativa*
পাট	*Corchorus capsularis*
আম	*Mangifera indica*
কাঁঠাল	*Artocarpus heterophyllus*
শাপলা	*Nymphea nouchali*
জবা	*Hibiscus rosa-sinensis*
কলেরা জীবাণু	*Vibrio cholerae*
ম্যালেরিয়া জীবাণু	*Plasmodium vivax*
আরশোলা	*Periplaneta americana*
মৌমাছি	*Apis indica*
ইলিশ	*Tenualosa ilisha*
কুনো ব্যাঙ	*Bufo melanostictus*
দোয়েল	*Copsychus saularis*
রয়েল বেঙ্গল টাইগার	*Panthera tigris*
মানুষ	*Homo sapiens*

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জীববিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব কী?

২. জীববিজ্ঞানের ভৌত শাখাগুলোর নাম লিখ।

৩. জীববিজ্ঞানের ফলিত শাখাগুলোর নাম লিখ।

৪. দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি কী?

৫. শ্রেণিবিন্যাসের ধাপগুলো উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জীবের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা কী?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জীববিজ্ঞানের কোন শাখায় কীটপতঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়?

ক. এন্টোমোলজি খ. ইকোলজি

গ. এন্ডোক্রাইনোলজি ঘ. মাইক্রোবায়োলজি

২. শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো–

i. জীবের উপদল সম্পর্কে জানা

ii. জীবের এককের নামকরণ করতে পারা

iii. বিস্তারিতভাবে জ্ঞানকে উপস্থাপন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

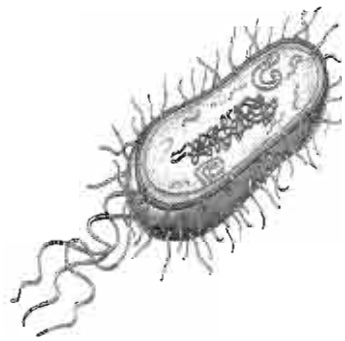

৩. চিত্রে জীবটির নাম কী?

ক. অ্যামিবা খ. ডায়াটম

গ. প্যারামেসিয়াম ঘ. ব্যাকটেরিয়া

৪. উদ্দীপকের চিত্রে প্রদর্শিত জীবটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা–

i. চলনে সক্ষম

ii. খাদ্য তৈরিতে অক্ষম

iii. নিউক্লিয়াস সুগঠিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

চিত্র ১

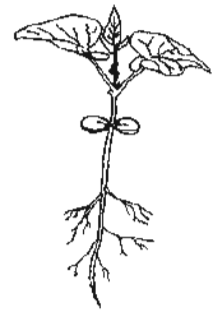

চিত্র ২

ক. শ্রেণিবিন্যাসের একক কী?

খ. বংশগতিবিদ্যাকে জীববিজ্ঞানের ভৌত শাখা বলা হয় কেন?

গ. চিত্র–২ এর উদ্ভিদটির নামকরণের ক্ষেত্রে কীভাবে তুমি ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্র–১ এবং চিত্র–২ এর মধ্যে কোন জীবটি অধিক উন্নত, কারণসহ বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবকোষ ও টিস্যু

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে তোমরা জীবকোষ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ। ঐসব ধারণার উপর ভিত্তি করে তোমরা আরও অনেক কিছু জানতে পারবে। সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা একটি জীবকোষ আর ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা ঐ একই জীবকোষের গঠন কি এক রকম?

এ অধ্যায়ে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা কোষ ও টিস্যু সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

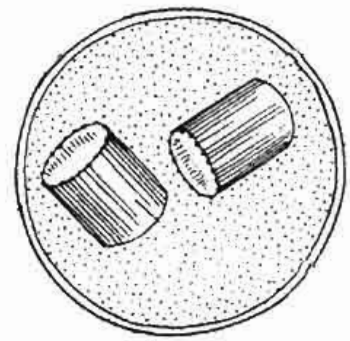

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণুর কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের তুলনা করতে পারব।
- স্নায়ু, পেশি, রক্ত, ত্বক এবং অস্থির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে বিভিন্ন প্রকার কোষের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- উদ্ভিদ দেহে কোষের উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব।
- উদ্ভিদ টিস্যু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণী টিস্যু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- একই রকম কোষ সমষ্টির ও একই কাজ সম্পন্ন করার ভিত্তিতে টিস্যুর কাজ মূল্যায়ন করতে পারব।
- টিস্যু, অঙ্গ এবং তন্ত্রে কোষের সংগঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্রের ধারণা এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষ পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারব।
- সঠিকভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারব।
- জীবের নানা কার্যক্রমে কোষের অবদান অনুধাবন করতে পারব।

পূর্বের শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে, কোষ জীবদেহের একক। একটি ইমারত যেমন হাজার হাজার ইট দিয়ে তৈরি হয় সেভাবে একটি জীবদেহ লক্ষ লক্ষ জীবকোষ দ্বারা গঠিত হয়। এই জীবকোষ কী? কোনো কোনো বিজ্ঞানী জীবকোষকে জীবদেহের গঠন ও জীবজ ক্রিয়াকলাপের একক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। লোয়ী (Loey) এবং সিকেভিজ (Siekevitz) ১৯৬৯ সালে বৈষম্য ভেদ্য (selectively permeable) পর্দা দ্বারা আবৃত এবং জীবজ ক্রিয়াকলাপের একক যা অন্য সজীব মাধ্যম ব্যতিরেকেই নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে সক্ষম তাকে কোষ বলেছেন।

কোষের প্রকারভেদ

নিউক্লিয়াসের সংগঠনের ভিত্তিতে কোষ দুই ধরনের যথা– আদি কোষ ও প্রকৃত কোষ।

ক) আদি কোষ (Prokaryotic cell) : এ ধরনের কোষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস (nucleus) থাকে না। এ জন্য এদের আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষও বলা হয়। এসব কোষের নিউক্লিয়াস কোনো পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে না। ফলে নিউক্লিয়বস্তু সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে। এসব কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি অঙ্গাণু থাকে না তবে রাইবোজোম উপস্থিত থাকে। ক্রোমোজোমে কেবল DNA অথবা RNA থাকে, নীলাভ সবুজ শৈবাল, ব্যাকটেরিয়ায় এ ধরনের কোষ থাকে।

খ) প্রকৃত কোষ (Eukaryotic cell) : এসব কোষের নিউক্লিয়াস সুগঠিত অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ঝিল্লী (nuclear membrane) দ্বারা নিউক্লিওবস্তু পরিবেষ্টিত ও সুসংগঠিত। ক্রোমোজোমে DNA প্রোটিন, হিস্টোন ও অন্যান্য উপাদান থাকে। অধিকাংশ জীবকোষ এ ধরনের হয়। শৈবাল থেকে শুরু করে সপুষ্পক উদ্ভিদ এবং অ্যামিবা থেকে উন্নত প্রাণীর দেহেও এ ধরনের কোষ থাকে। এসব কোষে রাইবোজোম ছাড়া অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে।

কাজের ভিত্তিতে প্রকৃত কোষ দুই প্রকার, যথা– দেহ কোষ ও জনন কোষ।

i) **দেহ কোষ (Somatic cell) :** বহুকোষী জীবের দেহ গঠনে এসব কোষ অংশগ্রহণ করে। মাইটোটিক ও এমাইটোটিক বিভাজনের মাধ্যমে কোষ বিভাজিত হয়। এভাবে দেহের বৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন তন্ত্র ও অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ গঠনে দেহ কোষ অংশ নেয়।

ii) **জনন কোষ (Gametic cell) :** যৌন প্রজনন ও জনুক্রম দেখা যায় এমন জীবে জনন কোষ উৎপন্ন হয়। মিয়োসিস পদ্ধতিতে জনন মাতৃকোষের বিভাজন ঘটে এবং জনন কোষ উৎপন্ন হয়। জনন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহ কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক থাকে। মাতৃ ও পিতৃ জনন কোষ মিলিত হয়ে নতুন জীবের দেহ গঠনের সূচনা করে। এ প্রথম কোষটিকে জাইগোট (Zygote) বলে। জাইগোট বার বার বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহ গঠন করে।

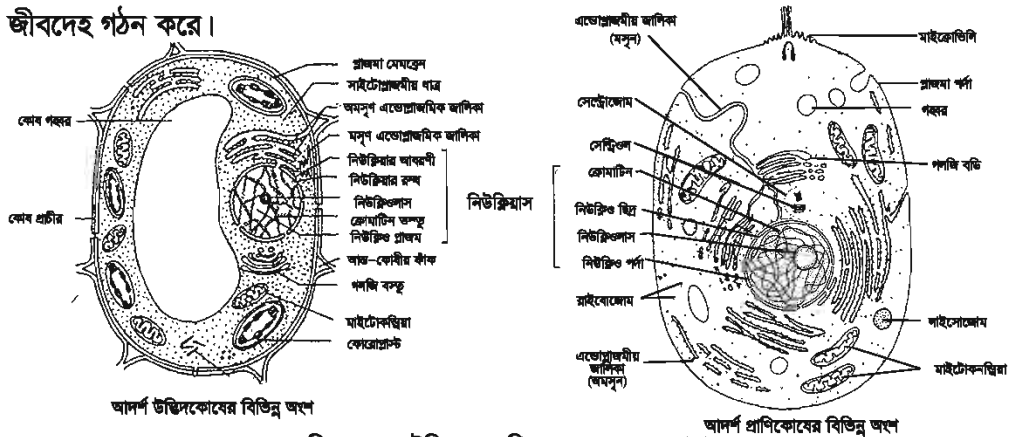

চিত্র–২.১: উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণুসমূহ।

উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণুর কাজ

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় এমন কিছু কোষঅঙ্গাণুর কাজের সাথে এবার আমরা পরিচিত হব।

ক) কোষ প্রাচীর (Cell wall) : কোষ প্রাচীর উদ্ভিদ কোষের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এটি মৃত বা জড়বস্তু দ্বারা গঠিত। এর রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। এতে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন, পেকটিন, সুবেরিন নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। তবে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর প্রোটিন ও লিপিড দ্বারা গঠিত।

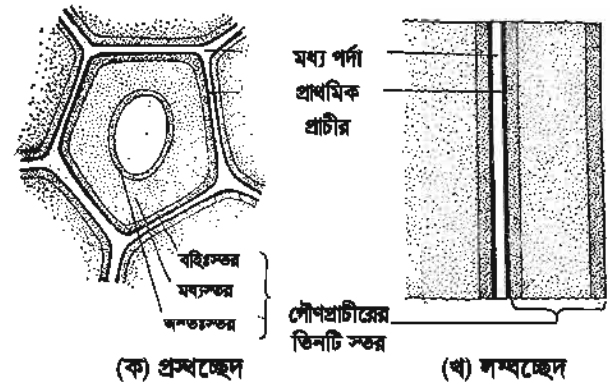

চিত্র–২.২: কোষ প্রাচীরের আণুবীক্ষণিক চিত্র।

প্রাথমিক কোষপ্রাচীরটি একস্তর বিশিষ্ট। মধ্য পর্দার উপর প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত কয়েক প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য জমে ক্রমশ গৌণ প্রাচীর সৃষ্টি হয়। এ প্রাচীর গঠনকালে মাঝে মাঝে ছিদ্র তৈরি হয়, যাকে কূপ বলে। কোষ প্রাচীর কোষকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে। কোষের আকার ও আকৃতি বজায় রাখে। পার্শ্ববর্তী কোষের সাথে প্লাজমোডেজমাটা সৃষ্টির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে। পানি ও খনিজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাণীকোষে কোষপ্রাচীর থাকে না।

খ) কোষঝিল্লী (Plasmalemma): প্রোটোপ্লাজমের বাইরে যে দ্বিস্তরবিশিষ্ট পর্দা থাকে তাকে কোষঝিল্লী বা প্লাজমালেমা বলে। উদ্ভিদকোষে কোষপ্রাচীরের সাথে লাগানো কোষের অভ্যন্তরে এর অবস্থান। এটি দুইস্তর বিশিষ্ট একটি স্থিতিস্থাপক পর্দা। কোষঝিল্লীর ভাঁজকে মাইক্রোভিল্লি বলে। এটি প্রধানত লিপিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

কোষঝিল্লী একটি বৈষম্য ভেদ্য পর্দা হওয়ায় অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি ও খনিজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে ও পার্শ্ববর্তী কোষগুলোকে পরস্পর থেকে আলাদা করে রাখে।

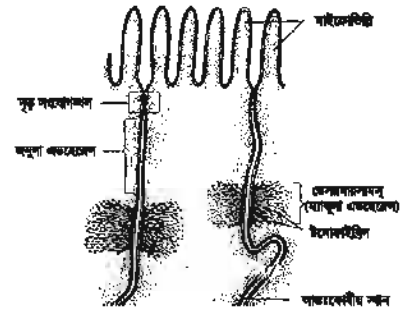

চিত্র–২.৩: দ্বিস্তর বিশিষ্ট কোষঝিল্লী।

গ) সাইটোপ্লাজমিয় অঙ্গাণু : সাইটোপ্লাজম কি তা তোমরা নিচের শ্রেণিতে জেনেছ। কোষের ভিতরে যে অর্ধস্বচ্ছ, থকথকে জেলির ন্যায় বস্তু থাকে তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে। কোষঝিল্লী দ্বারা ঘেরা সমুদয় বস্তুই প্রোটোপ্লাজম। এ প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকাটিকে সরিয়ে দিলে যে জেলি সদৃশ বস্তুটি থেকে যায় সেটিই সাইটোপ্লাজম। এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনেক ধরনের অঙ্গাণু থাকে। এদের প্রত্যেকের কাজ আলাদা। এবার দেখা যাক এসব অঙ্গাণুর কাজ কী কী।

১) **মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria):** শ্বসনে অংশগ্রহণকারী এ অঙ্গাণুটি বেনডা (Benda) ১৮৯৮ সালে আবিষ্কার করেন। এটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট আবরণী বা ঝিল্লী দিয়ে ঘেরা। ভিতরের স্তরটি ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থাকে। এদের ক্রিস্টি (cristae) বলে। ক্রিস্টির গায়ে বৃন্তযুক্ত গোলাকার বস্তু থাকে, একে অক্সিজোম (oxisome) বলে। অক্সিজোমে উৎসেচকগুলো সাজানো থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়নের ভিতরে থাকে ম্যাট্রিক্স (matrix)।

জীবের শ্বসনকার্যে সাহায্য করা মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রধান কাজ। তোমরা জেনেছ যে শ্বসন ক্রিয়ার প্রধান ধাপ দুটি। এর প্রথম ধাপ গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ায় ঘটে না। তবে দ্বিতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়াগুলো এ অঙ্গাণুর মধ্যেই সম্পন্ন হয়। ক্রেবস চক্রে অংশগ্রহণকারী সব উৎসেচক এতে উপস্থিত থাকায় এ বিক্রিয়াগুলো মাইটোকন্ড্রিয়াতেই সম্পন্ন হয়। ক্রেবস চক্রে সর্বাধিক শক্তি উৎপাদিত হয়। এ জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বা পাওয়ার হাউস বলা হয়। এ শক্তি জীব তার বিভিন্ন কাজে খরচ করে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে এদের পাওয়া যায়।

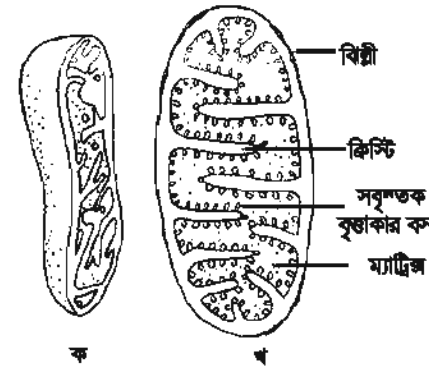

চিত্র ২.৪: মাইটোকন্ড্রিয়া, ক, খ–লম্বচ্ছেদ

২। **প্লাস্টিড (Plastids) :** প্লাস্টিড উদ্ভিদ কোষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু। প্লাস্টিডের প্রধান কাজ খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সঞ্চয় করা ও উদ্ভিদ দেহকে বর্ণময় ও আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা। প্লাস্টিড তিন ধরনের যথা– ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও লিউকোপ্লাস্ট।

ক) **ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) :** সবুজ রঙের প্লাস্টিডকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে। পাতা, কচি কান্ড ও অন্যান্য সবুজ অংশে এদের পাওয়া যায়। প্লাস্টিডের গ্রানা (grana) অংশ সূর্যালোককে আবদ্ধ করে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই আবদ্ধ সৌরশক্তি স্টোমা (stoma)-তে অবস্থিত উৎসেচক সমষ্টি, বায়ু থেকে গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি থেকে সরল শর্করা উৎপন্ন করে। এই প্লাস্টিডে ক্লোরোফিল থাকে তাই এদের সবুজ দেখায়। এছাড়া এতে ক্যারোটিনয়েড নামক রঞ্জকও থাকে।

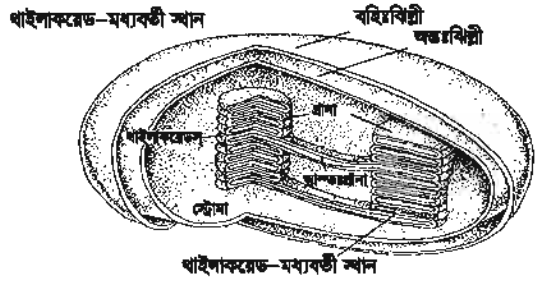

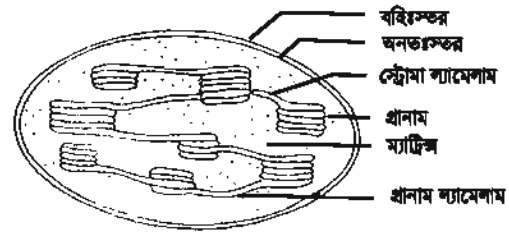

ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন অংশ (ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট এবং সরলীকৃত)।

চিত্র: ২.৫: একটি প্লাস্টিড কণা (খন্ডিত)।

খ) **ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplasts) :** এরা রঙিন প্লাস্টিড তবে এরা সবুজ নয়। এসব প্লাস্টিড জ্যান্থফিল, ক্যারোটিন, ফাইকোএরিথ্রিন, ফাইকোসায়ানিন ইত্যাদি বর্ণের কণিকা ধারণ করে তাই কোনোটিকে হলুদ, কোনোটিকে নীল আবার কোনোটিকে লাল দেখায়। এদের মিশ্রণজনিত কারণে ফুল, পাতা ও উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। রঙিন ফুল, পাতা ও গাজরের মূলে এদের পাওয়া যায়। ফুলকে আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা এদের প্রধান কাজ। এরা বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থ সংশ্লেষণ ও জমা করে।

গ) **লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast) :** যেসব প্লাস্টিড কোনো রঞ্জক পদার্থ ধারণ করে না তাদের লিউকোপ্লাস্ট বলে। যে সব কোষে সূর্যের আলো পৌঁছায় না সেখানে এদের পাওয়া যায়, যেমন– মূল, ভ্রূণ, জনন কোষ ইত্যাদি।

এদের প্রধান কাজ খাদ্য সঞ্চয় করা। আলোর সংস্পর্শে এলে লিউকোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্ট বা ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে।

> **কাজ :** প্লাস্টিডের চিত্র অংকন।
> **উপকরণ :** বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিডের চিত্র, পোস্টার পেপার, সাইন পেন।
> বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিডের চিত্র অংকন করে বোর্ডে ঝুলিয়ে দাও ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

৩। **সেন্ট্রিওল :** প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে দুটি ফাঁপা নলাকার বা দণ্ডাকার অঙ্গাণু দেখা যায়, তাদের সেন্ট্রিওল বলে, সেন্ট্রিওল সাধারণত একটি স্বচ্ছ দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত থাকে। এ এলাকাকে সেন্ট্রোজোম বলে। উদ্ভিদকোষে সেন্ট্রিওল সাধারণত থাকে না। তবে নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদকোষে যেমন– ছত্রাকে থাকে। প্রাণিকোষ বিভাজনের সময় এস্টার–রে গঠন করা সেন্ট্রিওলের প্রধান কাজ।

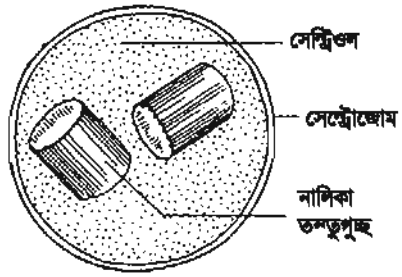

চিত্র ২.৬ : সেন্ট্রিওল

৪। **রাইবোজোম (Ribosome) :** প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় প্রকার কোষেই এদের পাওয়া যায়। এই পর্দাবিহীন অঙ্গাণুটি প্রধানত আমিষ সংশ্লেষণে সাহায্য করে। কোথায় আমিষ সংশ্লেষণ হবে তার স্থান নির্ধারণ করা এর কাজ। প্রোটিনের পলিপেপটাইডচেইন সংযোজন এই রাইবোজোমে হয়ে থাকে। এছাড়া এ কাজে প্রয়োজনীয় উৎসেচক সরবরাহ করে থাকে।

৫। **গলজি বস্তু (Golgi body) :** গলজি বস্তু প্রধানত প্রাণিকোষে পাওয়া যায়। তবে বহু উদ্ভিদ কোষেও এদের দেখা যায়। এটি সিসটার্নি ও কয়েক প্রকার ভেসিকল নিয়ে গঠিত। এর পর্দায় বিভিন্ন উৎসেচকের পানি বিয়োজন সম্পন্ন হয়। জীবকোষে বিভিন্ন পদার্থ নিঃসৃতকরণের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। হরমোন নিঃস্বরণেও এর ভূমিকা লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো বিপাকীয় কার্যের সাথে এরা সম্পর্কিত। কখনও কখনও এরা প্রোটিন সঞ্চয় করে রাখে।

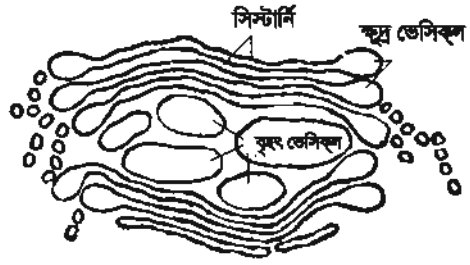

চিত্র:২.৭: একটি গলজি বস্তু

৬। **এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum) :** এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এর আবরণীর গায়ে প্রায়ই রাইবোজোম লেগে থাকে, তাই স্বাভাবিকভাবেই সব স্থানে আমিষ সংশ্লেষণের ঘটনা ঘটে। কোষে উৎপাদিত পদার্থসমূহের প্রবাহ পথ হিসেবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ব্যবহৃত হয়। এরা কখনও প্লাজমা মেমব্রেনের সাথে যুক্ত থাকে, তাই ধারণা করা হয় যে এক কোষ থেকে অন্য কোষে উৎসেচক ও কোষে উৎপাদিত অন্যান্য দ্রব্যাদি এর মাধ্যমে চলাচল করে। মাইটোকন্ড্রিয়া, কোষগহ্বর ইত্যাদি সৃষ্টিতে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় কোষেই এরা উপস্থিত থাকে।

৭। **সেন্ট্রোজোম (Centrosome) :** এটি প্রাণিকোষের বৈশিষ্ট্য। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ কোষে কদাচিৎ এদের দেখা যায়। সেন্ট্রোজোমে বিদ্যমান সেন্টিওল কোষ বিভাজনের সময় এস্টার রে উৎপাদন করে। এছাড়া স্পিন্ডল যন্ত্র

সৃষ্টিতেও এর অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ক্লাজেলা সৃষ্টিতে এরা অংশগ্রহণ করে। প্রধানত প্রাণিকোষে এদের পাওয়া যায়।

৮। **কোষ গহ্বর (Vacuole) :** বৃহৎ কোষ গহ্বর উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান কাজ কোষরস ধারণ করা। বিভিন্ন প্রকার অজৈব লবণ, আমিষ, শর্করা, চর্বিজাতীয় পদার্থ, জৈব এসিড, রঞ্জক পদার্থ, পানি ইত্যাদি এই কোষরসে থাকে। প্রাণিকোষে কোষ গহ্বর সাধারণত অনুপস্থিত থাকে, তবে যদি কখনও থাকে তবে তা আকারে ছোট হয়।

৯। **লাইসোজোম (Lysosome):** লাইসোজোম জীব কোষকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে। এর উৎসেচক আগত জীবাণুগুলোকে হজম করে ফেলে। এর পরিপাক উৎসেচকগুলো একটি পর্দা দ্বারা আলাদা করা থাকে তাই অন্যান্য কোষ এর সংস্পর্শে এলেও হজম হয় না। দেহে অক্সিজেনের অভাব হলে লাইসোজোমের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর সাথে লাগানো কোষগুলোর মৃত্যু ঘটে।

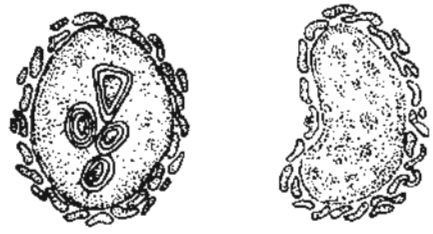

চিত্র–২.৮: লাইসোজোম কণা।

১০। **নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা (Nucleus) :** কোষের সব জৈবনিক ক্রিয়া বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে নিউক্লিয়াস। এর আকৃতি গোলাকার, ডিম্বাকার বা নলাকার। সিভকোষ ও লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। নিউক্লিয়াসে বংশগতির বৈশিষ্ট্য নিহিত। এটি কোষে সংঘটিত বিপাকীয় কার্যাবলীসহ সব ক্রিয়া–বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। সুগঠিত কেন্দ্রিকায় নিচের অংশগুলো দেখা যায়।

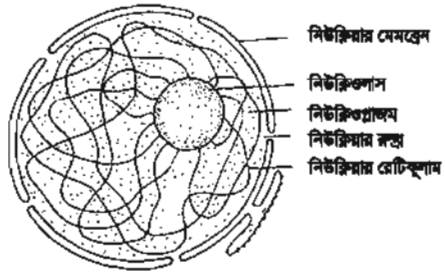

চিত্র–২.৯: লাইসোজোম কণা।

ক) **নিউক্লিয়ার ঝিল্লী (Nuclear membrane) :** নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখে যে ঝিল্লী তাকে নিউক্লিয়ার ঝিল্লী বা কেন্দ্রিকা ঝিল্লী বলে।এটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট ঝিল্লী। এ ঝিল্লী লিপিড ও প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। এ ঝিল্লীতে মাঝে মাঝে কিছু ছিদ্র থাকে একে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র বলে। এই ছিদ্রের মাধ্যমে কেন্দ্রিকা ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু বস্তু চলাচল করে। এই ঝিল্লী সাইটোপ্লাজম থেকে কেন্দ্রিকার অন্যান্য বস্তুকে পৃথক করে ও বিভিন্ন বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

খ) **নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm) :** কেন্দ্রিকা ঝিল্লীর অভ্যন্তরে জেলির ন্যায় বস্তু বা রসকে কেন্দ্রিকারস বা নিউক্লিওপ্লাজম বলে। কেন্দ্রিকারসে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, উৎসেচক ও কতিপয় খনিজ লবণ থাকে।

গ) **নিউক্লিওলাস (Nucleolus) :** কেন্দ্রিকারসের মধ্যে ক্রোমোজোমের সাথে লাগানো গোলাকার বস্তুকে নিউক্লিওলাস বা কেন্দ্রিকাণু বলে। ক্রোমোজোমের রঙঅগ্রাহী অংশের সাথে এরা লেগে থাকে। এরা RNA ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। এরা নিউক্লিক এসিড মজুদ করে ও প্রোটিন সংশ্লেষণ করে।

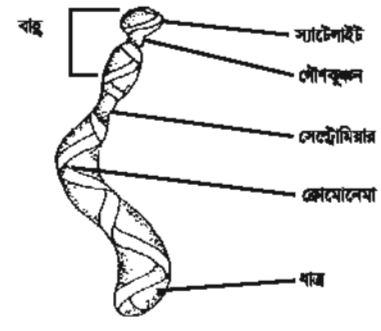

চিত্র–২.১০: একটি ক্রোমোজোম।

ঘ) **ক্রোমাটিন জালিকা (Chromatin reticulum) :** কোষের বিশ্রামকালে কেন্দ্রিকায় কুন্ডলী পাকানো সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় অংশই ক্রোমাটিন জালিকা। কোষ বিভাজনের সময় এরা মোটা ও খাটো হয় তাই তখন তাদের আলাদা আলাদা ক্রোমোজোম হিসেবে দেখা যায়। ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলো বংশগতির গুণাবলী বহন করে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে নিয়ে যায়। কোনো একটি জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা ঐ জীবের জন্য নির্দিষ্ট। এসব ক্রোমোজোমে বংশধারা বহনকারী জিন (gene) অবস্থান করে। পুরুষানুক্রমে বংশের বৈশিষ্ট্য বহন করা ক্রোমোজোমের কাজ।

মানবদেহের স্নায়ু, পেশি, রক্ত, ত্বক এবং অস্থির কাজ পরিচালনায় বিভিন্ন প্রকার কোষের ভূমিকা

কোষ প্রাণী দেহের একক। এককোষী ও বহুকোষী প্রাণীদের কোষের কাজ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হয়। আদি পৃথিবীর প্রাণের আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এককোষী প্রাণী প্রোটোজোয়া পর্বের প্রজাতিগুলো তাদের দেহের সব ধরনের ক্রিয়াকলাপ যেমন খাদ্যগ্রহণ, দেহের বৃদ্ধি ও প্রজনন ঐ এক কোষের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। বহুকোষী প্রাণীদের দেহকোষের মাঝে ভিন্নতা আছে, আছে বৈচিত্র্যতা।

মানব দেহে নানা ধরনের কোষ আছে যারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিয়োজিত। মানব দেহের স্নায়ুকোষ দেহজুড়ে জালের মতন ছড়িয়ে থাকে। দেহের যে কোনো অংশের উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করা, আবার মস্তিষ্কের কোনো বার্তা শরীরের নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছে দেওয়াই এদের কাজ। চোখের স্নায়ুকোষগুলো দেখতে এবং কানের স্নায়ুকোষগুলো শুনতে সাহায্য করে। মানব চোখের মতো বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুকোষ না থাকায় বেশিরভাগ প্রাণীই পৃথিবীর দৃশ্যমান বস্তুগুলো রঙিন দেখতে সক্ষম হয় না। অনেক প্রাণী শুধু দিনে অথবা রাতে দেখতে পায়। আমাদের কাজেকর্মে, হাটাচলায় এবং নড়াচড়ায় পেশিকোষ ব্যবহৃত হয়। তিন ধরনের রক্তকোষ মানবদেহের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। লোহিত রক্তকণিকা কোষগুলো ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণ করে হৃদযন্ত্রের সাহায্যে ধমণির মাধ্যমে কৈশিক নালি হয়ে দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে। শ্বেত রক্তকণিকা দেহের রোগ প্রতিরোধ করে। রক্তের অনুচক্রিকা কোষগুলো শরীরের কেটে যাওয়া অংশ থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে। শরীরের ত্বকীয় কোষগুলো দেহের আবরণ দেওয়া ছাড়াও শরীরের অবস্থানভেদে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। মাথার ত্বকীয় কোষ থেকে চুল গজিয়ে থাকে। শরীরের ত্বকীয় কোষগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ঘাম নির্গমন কোষ থেকে ঘাম নির্গত করে। অস্থিকোষ দেহে অস্থি অথবা কোমলাস্থি তৈরি করে দেহের দৃঢ়তা দিয়ে থাকে। দেহের আকার, গঠন, অস্থির বৃদ্ধি ইত্যাদিতে অস্থিকোষের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ টিস্যু (Plant tissue)

একই গঠনবিশিষ্ট একগুচ্ছ কোষ একত্রিত হয়ে যদি একই কাজ করে এবং তাদের উৎপত্তিও যদি অভিন্ন হয় তখন তাদের টিস্যু বা কলা বলে। টিস্যু দুই ধরনের যথা– ভাজক টিস্যু ও স্থায়ী টিস্যু। ভাজক টিস্যু বিভাজনে সক্ষম কিন্তু স্থায়ী টিস্যু বিভাজিত হতে পারে না। স্থায়ী টিস্যু দুই প্রকার, যথা– সরল টিস্যু ও জটিল টিস্যু।

সরল টিস্যু (Simple tissue) : যে স্থায়ী টিস্যুর প্রতিটি কোষ আকার, আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে অভিন্ন তাকে সরল টিস্যু বলে। কোষের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সরল টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যথা– ১) **প্যারেনকাইমা, ২) কোলেনকাইমা ও ৩) স্ক্লেরেনকাইমা।**

১) **প্যারেনকাইমা (parenchyma) :** উদ্ভিদ দেহের সব অংশে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ টিস্যুর কোষগুলো জীবিত, সমব্যাসীয়, পাতলা প্রাচীরযুক্ত ও প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ। এই টিস্যুতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক দেখা যায়।

কোষপ্রাচীর পাতলা ও সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। এসব কোষে যখন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে তখন তাকে ক্লোরেনকাইমা (chlorenchyma) বলে। জলজ উদ্ভিদের বড় বড় বায়ুকুঠুরীযুক্ত প্যারেনকাইমাকে এ্যারেনকাইমা (aerenchyma) বলে। প্যারেনকাইমা টিস্যুর প্রধান কাজ দেহ গঠন করা, খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সঞ্চয় করা ও খাদ্যদ্রব্য পরিবহন করা।

২) **কোলেনকাইমা (collenchyma) :** এরা বিশেষ ধরনের প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ ও পেকটিন জমে পুরু হয়। তবে এদের কোষের প্রাচীর অসমভাবে পুরু এবং কোণাগুলো অধিক পুরু হয়। এ টিস্যুর কোষগুলো লম্বাটে ও সজিব। এরা প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ কোষ দ্বারা গঠিত। এতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকতে পারে। কোষপ্রান্ত চৌকোণাকার, সরু বা তীর্যক হতে পারে। খাদ্য প্রস্তুত ও উদ্ভিদ দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করা এদের প্রধান কাজ। পাতার শিরা, পত্রবৃন্তে এদের দেখা যায়। কচি ও নমনীয় কান্ড, যেমন কুমড়া ও দন্ডকলসীর কান্ডে এ টিস্যু দৃঢ়তা প্রদান করে। এ কোষে যখন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে তখন এরা খাদ্য প্রস্তুত করে।

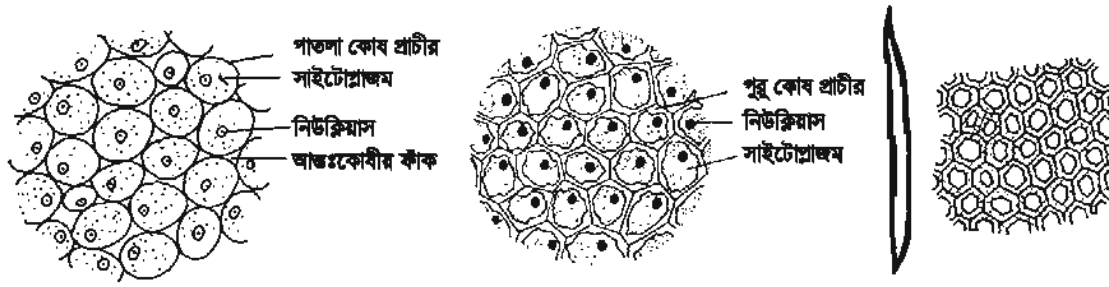

চিত্র–২.১১ :বিভিন্ন প্রকারের সরল টিস্যু, ক– প্যারেনকাইমা, খ–কোলেনকাইম,গ– স্ক্লেরেনকাইমা।

৩) **স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma) :** এ টিস্যুর কোষগুলো শক্ত, অনেক লম্বা ও পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট হয়। প্রোটোপ্লাজমবিহীন, লিগনিনযুক্ত এবং যান্ত্রিক কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোষ দ্বারা গঠিত টিস্যুকে স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু বলে। প্রাথমিক অবস্থায় কোষগুলোতে প্রোটোপ্লাজম উপস্থিত থাকলেও খুব তাড়াতাড়ি তা নষ্ট হয়ে মৃত কোষে পরিণত হয়। কোষগুলো প্রধানত দুই ধরনের, যথা– ফাইবার ও স্ক্লেরাইড। উদ্ভিদ দেহে দৃঢ়তা প্রদান এবং পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন করা এর মূল কাজ।

ক) **ফাইবার বা তন্তু (Fibre) :** এরা অত্যন্ত দীর্ঘ, পুরু প্রাচীরযুক্ত, শক্ত এবং দুই প্রান্ত সরু। তবে কখনো ভোঁতা হতে পারে। প্রাচীরের গায়ে ছিদ্র থাকে। এ ছিদ্রকে কূপ বলে। অবস্থান ও গঠনের ভিত্তিতে এদের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, যথা– বাস্ট ফাইবার, সার্কেস ফাইবার, জাইলেম তন্তু বা কাষ্ঠতন্তু।

খ) **স্ক্লেরাইড (Sclereids):** এদেরকে স্টোন সেলও বলা হয়। এরা খাটো, সমব্যাসীয়, কখনও লম্বাটে আবার কখনও তারকাকার হতে পারে। এদের গৌণপ্রাচীর খুবই শক্ত, অত্যন্ত পুরু ও লিগনিনযুক্ত। পরিণত স্ক্লেরাইড কোষ সাধারণত মৃত থাকে। কোষপ্রাচীর কূপযুক্ত হয়।

নগ্নবীজী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কর্টেক্স, ফল ও বীজত্বকে স্ক্লেরাইড টিস্যু দেখা যায়। বহিঃত্বক জাইলেম ও ফ্লোয়েমের সাথে একত্রে পত্রবৃন্তে কোষগুচ্ছরূপে থাকতে পারে।

কাজ : তিন ধরনের সরল টিস্যুর চিত্র অংকন।
উপকরণ : পোস্টার পেপার ও সাইনপেন
তিন ধরনের সরল টিস্যুর চিহ্নিত চিত্র আঁক এবং এদের পার্থক্যগুলো উপস্থাপন কর।

জটিল টিস্যু (Complex tissues)

বিভিন্ন প্রকারের কোষ সমন্বয়ে যে স্থায়ী টিস্যু গঠিত হয় তাকে জটিল টিস্যু বলে। এরা উদ্ভিদে পরিবহনের কাজ করে, তাই এদের পরিবহন টিস্যুও বলা হয়। এ টিস্যু দুই ধরনের, যথা– জাইলেম ও ফ্লোয়েম। জাইলেম ও ফ্লোয়েম একত্রে উদ্ভিদের পরিবহন টিস্যু গুচ্ছ (vascular bundle) গঠন করে।

জাইলেম (Xylem) : জাইলেম দুই ধরনের– প্রাথমিক ও গৌণ জাইলেম। প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে সৃষ্ট জাইলেমকে প্রাথমিক জাইলেম বলে। প্রাথমিক বৃদ্ধি শেষে যেসব ক্ষেত্রে গৌণবৃদ্ধি ঘটে সেখানে গৌণ জাইলেম সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক জাইলেম দুই ধরনের। প্রাথমিক অবস্থায় একে প্রোটোজাইলেম এবং পরিণত অবস্থায় মেটাজাইলেম বলে। মেটাজাইলেমের অভ্যন্তরীণ ফাঁকা গহ্বরটি বড় থাকে।

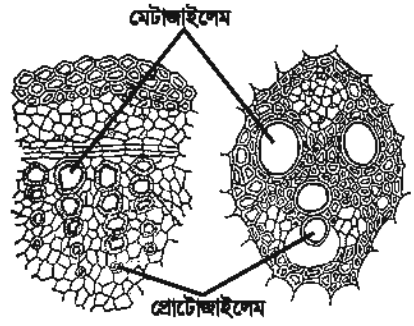

চিত্র–২.১২: একটি পরিবহন টিস্যু গুচ্ছ।

জাইলেমে কয়েক ধরনের কোষ থাকে, যেমন– ট্রাকিড, ভেসেল, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম ফাইবার।

ক) **ট্রাকিড (Tracheids) :** ট্রাকিড কোষ লম্বা। এর প্রান্তদ্বয় সরু ও সুঁচালো। প্রাচীরে লিগনিন জমে পুরু হয়ে অভ্যন্তরীণ গহ্বর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পানির চলাচল পার্শ্বীয় জোড়া কূপ (paired pits) এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। প্রাচীরের পুরুত্ব কয়েক ধরনের হয়, যেমন– বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালিকাকার ও কূপাঙ্কিত। ফার্নবর্গ, নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের প্রাথমিক ও গৌণ জাইলেম কলায় ট্রাকিড দেখা যায়। কোষ রসের পরিবহন অঙ্গাকে দৃঢ়তা প্রদান প্রধান কাজ। তবে কখনও খাদ্য সঞ্চয়ের কাজও এ টিস্যু করে থাকে।

খ) **ভেসেল (Vessels) :** ভেসেল কোষগুলো খাটো চোঙের ন্যায়। কোষগুলো একটির মাথায় একটি সজ্জিত হয়ে এবং প্রান্তীয় প্রাচীর গলে একটি দীর্ঘ নলের ন্যায় অঙ্গের সৃষ্টি করে। এর ফলে কোষরসের উর্ধ্বারোহণের জন্য একটি সরু পথ সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় এ কোষগুলো প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ থাকলেও পরিণত বয়সে এরা মৃত ও প্রোটোপ্লাজমবিহীন। ভেসেলের প্রাচীর ট্রাকিডের মতো বিভিন্নরূপে পুরু হয়, যেমন– সোপানাকার, সর্পিলাকার, বলয়াকার, কূপাঙ্কিত ইত্যাদি। ভেসেল সাধারণত কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা হয়। তবে বৃক্ষ বা আরোহী উদ্ভিদ আরও অধিক লম্বা হতে পারে। এদের প্রধানত গুপ্তবীজী উদ্ভিদের সব অঙ্গে দেখা যায়। নগ্নবীজী উদ্ভিদের মধ্যে উন্নত উদ্ভিদ, যেমন– নিটামে (*Gnetum*) প্রাথমিক

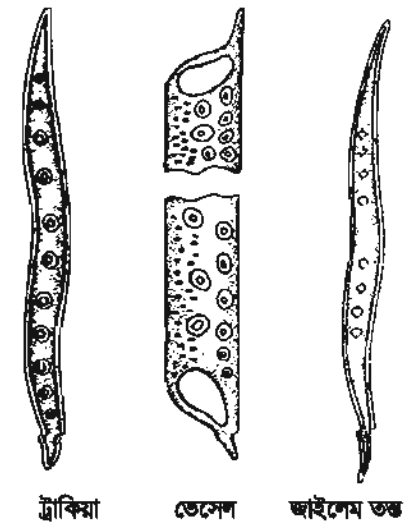

চিত্র–২.১৩: বিভিন্ন ধরনের জাইলেম

পর্যায়ের ভেসেল থাকে। পানি ও খনিজ পরিবহনে এবং অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা এর প্রধান কাজ।

গ) **জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenchyma) :** জাইলেমে অবস্থিত প্যারেনকাইমা কোষকে জাইলেম প্যারেনকাইমা বা উড প্যারেনকাইমা (wood parenchyma) বলে। এদের প্রাচীর পুরু বা পাতলা হতে পারে। প্রাইমারি জাইলেমে অবস্থিত প্যারেনকাইমার কোষ পাতলা প্রাচীরযুক্ত। তবে গৌণ জাইলেমে এরা পুরু প্রাচীরযুক্ত হয়ে থাকে। খাদ্য সঞ্চয় ও পানি পরিবহন করা এদের প্রধান কাজ।

ঘ) **জাইলেম ফাইবার (Xylem fibre) :** জাইলেমে অবস্থিত স্ক্লেরেনকাইমা কোষই জাইলেম ফাইবার। এদের উড ফাইবারও বলে। এ কোষগুলো লম্বা। এদের দু'প্রান্ত সরু। পরিণত কোষে প্রোটোপ্লাজম থাকে না বলে এরা মৃত। উদ্ভিদে এরা যান্ত্রিক শক্তি যোগায়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সব জাইলেমে এরা অবস্থান করে। পানি ও খনিজ পদার্থ পরিবহন, খাদ্য সঞ্চয়, উদ্ভিদকে যান্ত্রিক শক্তি ও দৃঢ়তা প্রদান করা জাইলেম টিস্যুর প্রধান কাজ।

ফ্লোয়েম (Phloem) : এরা জাইলেমের সাথে একত্রে পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ গঠন করে। সীভনল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও ফ্লোয়েম তন্তু নিয়ে ফ্লোয়েম টিস্যু গঠিত হয়।

জাইলেম যেমন খাদ্যের কাঁচামাল পানি সরবরাহ করে তেমনি ফ্লোয়েম পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করে।

ক) **সিভকোষ (Sieve cell) :** এরা বিশেষ ধরনের কোষ। দীর্ঘ, পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত ও জীবিত এ কোষগুলো লম্বালম্বিভাবে একটির উপর একটি পরপর সজ্জিত হয়ে সিভনল (Sieve tube) গঠন করে। এ কোষগুলো চালুনির মতো ছিদ্রযুক্ত সিভপ্লেট দ্বারা পরস্পর থেকে আলাদা থাকে। সিভকোষে প্রোটোপ্লাজম প্রাচীর ঘেঁষে থাকে ফলে একটি কেন্দ্রীয় ফাঁপা জায়গার সৃষ্টি হয়, যা খাদ্য পরিবহনে নল হিসেবে কাজ করে। এদের প্রাচীর লিগনিনযুক্ত। পরিণত সিভকোষে কোনো কেন্দ্রিকা থাকে না। সকল প্রকার গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে সিভকোষ ও সিভনল উপস্থিত থাকে। পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করা এদের প্রধান কাজ।

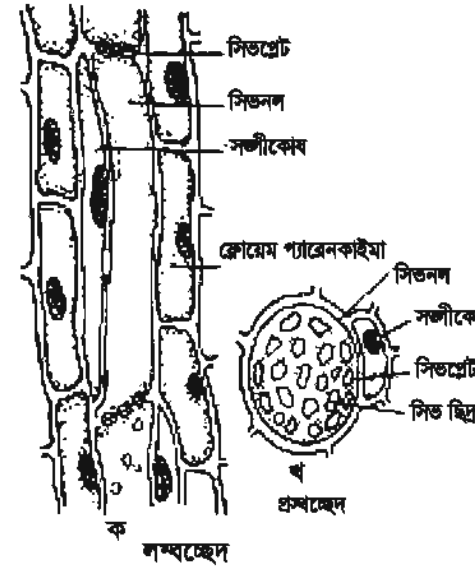

চিত্র–২.১৪: ফ্লোয়েম টিস্যু।

খ) **সঙ্গীকোষ (Companion cell) :** প্রতিটি সিভকোষের সাথে প্যারেনকাইমা জাতীয় একটি করে কোষ অবস্থান করে। এদের কেন্দ্রিকা বেশ বড়। ধারণা করা হয় যে, এই কেন্দ্রিকা সিভকোষের কার্যাবলি কিছু পরিমাণে হলেও নিয়ন্ত্রণ করে। এ কোষ প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত। ফার্ন ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে এদের উপস্থিতি নেই।

গ) **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem parenchayma) :** ফ্লোয়েমে উপস্থিত প্যারেকাইমা কোষগুলোই ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা। এদের কোষ সাধারণ প্যারেনকাইমার মতো পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত এবং প্রোটোপ্লাজমযুক্ত। এরা

খাদ্য সঞ্চয় করে ও খাদ্য পরিবহনে সহায়তা করে। একবীজপত্রী উদ্ভিদ ব্যতীত দ্বিবীজপত্রী, আবৃতবীজী ও নগ্নবীজী এবং ফার্ন উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে এদের পাওয়া যায়।

ঘ) **ফ্লোয়েম ফাইবার বা তন্তু (Phloem fibre) :** স্ক্লেরেনকাইমা কোষ সমন্বয়ে ফ্লোয়েম ফাইবার গঠিত হয়। এগুলো একপ্রকার দীর্ঘ কোষ যাদের প্রান্তদেশ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। এদের বাস্ট ফাইবারও বলে। পাটের আঁশ এক ধরনের বাস্ট ফাইবার। উদ্ভিদ অঙ্গের গৌণবৃদ্ধির সময় এ ফাইবার উৎপন্ন হয়। এসব কোষের প্রাচীরে কূপ দেখা যায়। ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে পাতায় উৎপাদিত শর্করা ও মূলে সঞ্চিত খাদ্য একই সাথে উপরে–নিচে পরিবাহিত হয়।

প্রাণিটিস্যুর কাজ

বহুকোষী প্রাণী দেহে অনেক কোষ একত্রে কোন বিশেষ কাজে নিয়োজিত থাকে। একই ভ্রূণীয় কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এক বা একাধিক ধরনের কিছুসংখ্যক কোষ জীবদেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সমষ্টিগতভাবে একটা কাজে নিয়োজিত থাকলে ঐ কোষগুলো সমষ্টিগতভাবে টিস্যু (Tissue) বা তন্ত্র তৈরি করে। একটি টিস্যুর কোষগুলোর উৎপত্তি, কাজ এবং গঠন একই ধরনের হয়। টিস্যু নিয়ে আলোচনাকে টিস্যুতত্ত্ব (Histology) বলে। কোষ ও টিস্যুর মধ্যে পার্থক্য খুবই নির্দিষ্ট। কোষ টিস্যুর গঠনগত ও কার্যকরী একক। যেমন লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা বিভিন্ন ধরনের রক্তকোষ। এদের একত্রে তরল যোজক টিস্যু বলা হয়। তরল যোজক টিস্যু রক্ত দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয়।

প্রাণিটিস্যুর প্রকারভেদ

প্রাণিটিস্যু তার গঠনকারী কোষের সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিঃসৃত পদার্থের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রধানত চার ধরনের হয়। নিচে প্রকারসহ বিভিন্ন টিস্যুর কাজের বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. আবরণী টিস্যু (Epithelial Tissue)

আবরণী টিস্যুর কোষগুলো ঘন সন্নিবেশিত এবং একটি ভিত্তিপর্দার উপর বিন্যস্ত থাকে। কোষের আকৃতি, প্রাণিদেহে অবস্থান ও কাজের প্রকৃতিভেদে এ টিস্যু তিন ধরনের হয়। যথা:

ক. **স্কোয়ামাস আবরণী টিস্যু :** এই টিস্যুর কোষগুলো মাছের আঁশের মতো চ্যাপটা ও নিউক্লিয়াস বড় আকারের হয়। উদাহরণ: বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল প্রাচীর। প্রধানত আবরণ ছাড়াও ছাঁকন কাজে লিপ্ত থাকে।

খ. **কিউবয়ডাল আবরণী টিস্যু :** এই টিস্যুর কোষগুলো ঘনাকার বা কিউব আকৃতির অর্থাৎ কোষগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রায় সমান। উদাহরণ: বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা। প্রধানত পরিশোষণ এবং আবরণ কাজে লিপ্ত ।

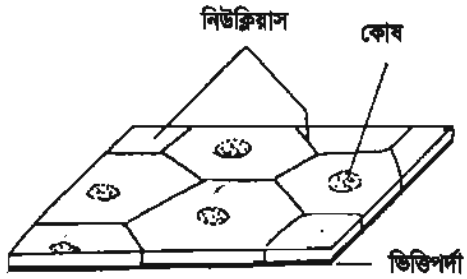

চিত্র ২.১৫ : স্কোয়ামাস (আঁইশাকার) আবরণী টিস্যু

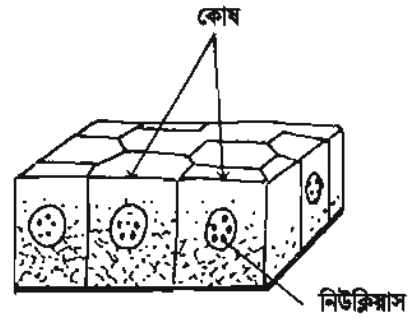

চিত্র ২.১৬ : কিউবয়ডাল (ঘনাকৃতি) আবরণী টিস্যু

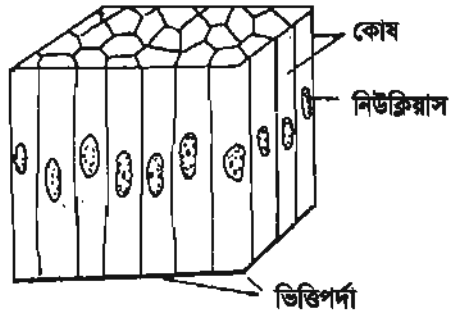

চিত্র ২.১৭ : কলাম্‌নার (স্তম্ভাকার) এপিথেলিয়াল টিস্যু

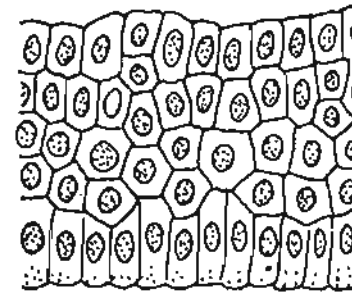

চিত্র ২.১৮ : স্ট্র্যাটিফাইড (স্তরীভূত) বা যৌগিক আবরণী টিস্যু

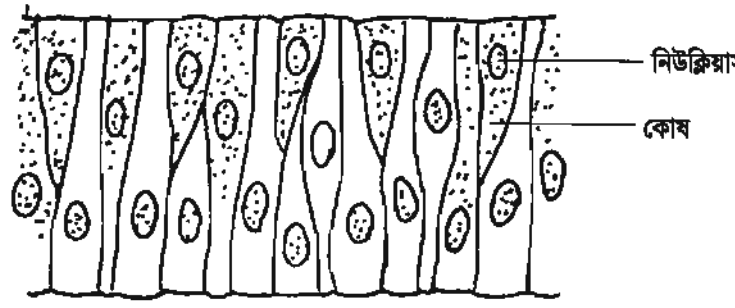

চিত্র ২.১৯ : সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াল টিস্যু

গ. **কলামনার আবরণী টিস্যু :** এই টিস্যুর কোষসমূহ স্তম্ভের মতো সরু ও লম্বা। উদাহরণ: প্রাণীর অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরের কোষগুলো প্রাধনত ক্ষরণ, রক্ষণ ও শোষণ কাজে লিপ্ত। প্রাণী দেহে ভিত্তিপর্দার উপর সজ্জিত কোষগুলোর সংখ্যার ভিত্তিতে এপিথেলিয়াল টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

i. সাধারণ আবরণী টিস্যু : ভিত্তিপর্দার উপর কোষসমূহ একস্তরে সজ্জিত। উদাহরণ: বৃক্কের বোম্যানস ক্যাপসুল, বৃক্কীয় নালিকা, অন্ত্র প্রাচীর।

ii. স্ট্রাটিফাইড আবরণী টিস্যু : ভিত্তিপর্দার উপর কোষগুলো একাধিক স্তরে সজ্জিত। উদাহরণ: মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ত্বক।

iii. সিউডো–স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু : এই টিস্যুর কোষগুলো ভিত্তিপর্দার উপর একস্তরে বিন্যস্ত থাকে। তবে কোষগুলো বিভিন্ন উচ্চতার হওয়ায় এই টিস্যুকে দেখতে স্তরীভূত টিস্যু মনে হয়। উদাহরণ ট্রাকিয়া। আবরণী টিস্যু কোষগুলো বিভিন্ন কাজের জন্য নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। যেমন–

১. সিলিয়াযুক্ত আবরণী টিস্যু– মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্বাসনালির প্রাচীরে দেখা যায়।

২. ফ্লাজেলাযুক্ত আবরণী টিস্যু– হাইড্রার এন্ডোডার্মে থাকে।

৩. ক্ষণপদযুক্ত আবরণী টিস্যু– হাইড্রার এন্ডোডার্মে এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্ত্রে দেখা যায়।

৪. জননকোষের আবরণী টিস্যু– বিশেষভাবে রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু যা থেকে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কোষ উৎপন্ন হয়।

দেখা যাচ্ছে যে আবরণী টিস্যু কোনো অঙ্গের বা নালির ভিতরের ও বাইরের অংশ তৈরি করে থাকে। আবার এই টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে রক্ষণ, ক্ষরণ, শোষণ, ব্যাপন, পরিবহন ইত্যাদি কাজে অংশ নেয়। আবরণী টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে গ্রন্থি টিস্যু এবং জনন টিস্যুতে পরিণত হয়ে দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে।

২. যোজক টিস্যু (Connective Tissue)

যোজক টিস্যুতে মাতৃকার (Matrix) পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কোষের সংখ্যা কম। গঠন ও কাজের ভিত্তিতে কানেকটিভ টিস্যু প্রধানত তিন ধরনের হয়। যথা–

ক. **ফাইব্রাস যোজক টিস্যু :** এই ধরনের যোজক টিস্যু দেহত্বকের নিচে পেশির মধ্যে থাকে। এদের মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের তন্তুর আধিক্য দেখা যায়।

খ. **স্কেলিটাল যোজক টিস্যু :** দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠনকারী টিস্যুকে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু বলে। এই টিস্যু দেহের অভ্যন্তরীন কাঠামো গঠন করে। দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি ও দৃঢ়তা দেয়। অঙ্গ সঞ্চালন ও চলনে সহায়তা করে। দেহের নরম ও নাজুক অঙ্গসমূহকে যেমন– মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জুকর্ড, ফুসফুস, হৃৎপিন্ড ইত্যাদিকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা উৎপাদন করে। ঐচ্ছিক পেশিসমূহের সংযুক্তির ব্যবস্থা করে। গঠনের ভিত্তিতে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু দু'ধরনের হয়। যেমন– কোমলাস্থি ও অস্থি। কোমলাস্থি (Cartilage) এক ধরনের নমনীয় স্কেলিটাল যোজক টিস্যু। মানুষের নাকের ও কানের পিনা কোমলাস্থি দিয়ে তৈরি।

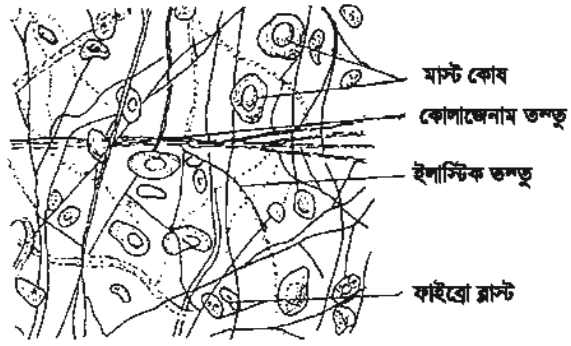

চিত্র ২.২০ : কানেক্টিভ টিস্যু

অস্থি বিশেষ ধরনের দৃঢ়, ভঙ্গুর এবং অনমনীয় স্কেলিটন কানেকটিভ টিস্যু। এদের মাতৃকায় ক্যালসিয়াম জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে অস্থির দৃঢ়তা প্রদান করে।

গ. **তরল আবরণী টিস্যু (Fluid connective tissue) :** তরল আবরণী টিস্যুর মাতৃকা তরল। মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই টিস্যুর প্রধান কাজ দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরিবহন করা, রোগ প্রতিরোধ ও রক্ত জমাট বাঁধায় বিশেষ ভূমিকা রাখা।

রক্ত এক ধরনের ক্ষারীয়, ঈষৎ লবণাক্ত, লালবর্ণের তরল আবরণী টিস্যু। ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত অভ্যন্তরীণ পরিবহনে অংশ নেয়। উষ্ণরক্তবাহী প্রাণীর দেহে রক্ত তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে। রক্তের উপাদান দুটি, যথা– রক্তরস ও রক্তকণিকা। রক্তরস (Plasma) রক্তের তরল অংশ। এর রং ঈষৎ হলুদাভ। এর প্রায় ৯১–৯২% অংশ পানি এবং ৮–৯% অংশ জৈব ও অজৈব পদার্থ। এসব রক্তরসের ভিতর বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন ও বর্জ্য পদার্থ থাকে। রক্তকণিকা তিন ধরনের, যথা– লোহিত রক্তকণিকা (Erythrocyte বা Red blood corpuscles), শ্বেত রক্তকণিকা (Leucocyte or white blood corpuscle) ও অনুচক্রিকা (Thrombocytes Blood platilate)। লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামে একটি লৌহজাত যৌগ থাকে, যার জন্য রক্ত লাল হয়। হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেন একটি অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে অক্সিজেন পরিবহন করে। শ্বেত রক্তকণিকা জীবাণু ধ্বংস করে দেহের প্রকৃতিগত আত্মরক্ষায় অংশ নেয়। মানবদেহে বেশ কয়েকধরনের শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধায় অংশ নেয়। মানবদেহে বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে (Inter cellular space) যে জলীয় পদার্থ জমা হয় সেগুলো কতগুলো ছোট নালির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে একটি স্বতন্ত্র নালিকাতন্ত্র গঠন করে,

যাকে লসিকাতন্ত্র (Lymph system) বলে। টনসিল লসিকাতন্ত্রের অংশ। লসিকার মধ্যে কিছু রোগপ্রতিরোধী কোষ থাকে। এদের লসিকা কোষ (Lymphoid cell) বলে।

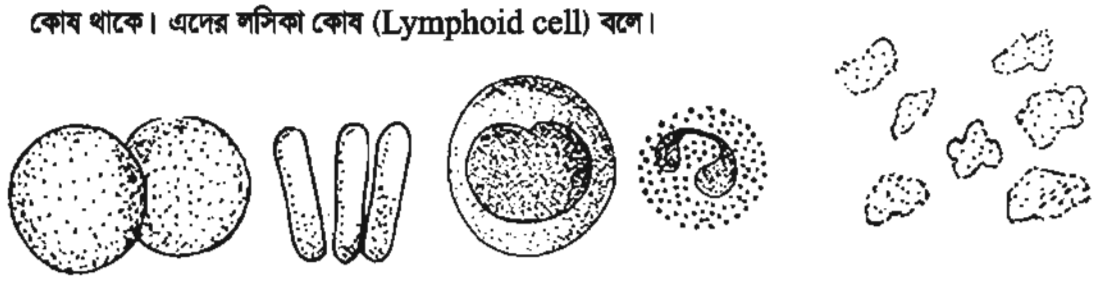

চিত্র ২.২১ : বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

৩. পেশি টিস্যু (Muscular Tissue)

ভ্রূণ মেসোডার্ম থেকে তৈরি সংকোচন প্রসারণশীল বিশেষ ধরনের টিস্যুকে পেশি টিস্যু বলে। এদের মাতৃকা প্রায় অনুপস্থিত। পেশি কোষগুলো সরু, লম্বা ও তন্তুময়। যেসব তন্তুতে আড়াআড়ি ডোরা কাঁটা থাকে তাদের ডোরাকাটা পেশি (Straited muscle) এবং ডোরাবিহীন তন্তুকে মসৃণপেশি (Smooth muscle) বলে। পেশি কোষ সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন, চলন ও অভ্যন্তরীণ পরিবহন ঘটে। অবস্থান, গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে পেশি টিস্যু তিন ধরনের, যথা– ঐচ্ছিক পেশি, অনৈচ্ছিক পেশি ও হৃদ পেশি। ঐচ্ছিক পেশি (Voluntary) বা ডোরাকাটা পেশি প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। ঐচ্ছিক পেশি টিস্যুর কোষগুলো নলাকার, শাখাবিহীন ও আড়াআড়ি ডোরাযুক্ত হয়। এদের সাধারণত একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। এই পেশি দ্রুত সংকোচিত ও প্রসারিত হতে পারে। ঐচ্ছিক পেশি অস্থিতন্ত্রে সংলগ্ন থাকে। উদাহরণ–মানুষের পায়ের পেশি।

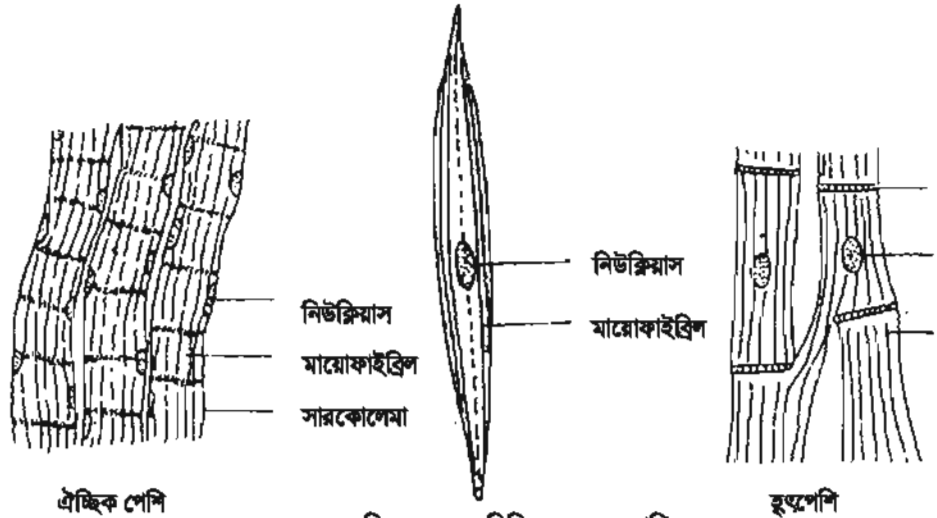

চিত্র ২.২২ : বিভিন্ন ধরনের পেশি

অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary muscle) বা মসৃণ পেশি টিস্যুর সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। এ পেশি কোষগুলো মাকু আকৃতির। এদের গায়ে আড়াআড়ি দাগ থাকে না। এজন্য এ পেশিকে মসৃণ পেশি বলে। মেরুদন্ডী প্রাণীদের রক্তনালি, পৌষ্টিকনালি ইত্যাদির প্রাচীরে অনৈচ্ছিক পেশি থাকে। অনৈচ্ছিক পেশি প্রধানত দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির সঞ্চালনে অংশ নেয়। যেমন খাদ্য হজম প্রক্রিয়ায় অন্ত্রের ক্রমসংকোচন। কার্ডিয়াক পেশি বা হৃদপেশি (Cardiac muscle) মেরুদন্ডী প্রাণিদের হৃৎপিন্ডের এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি। এই টিস্যুর কোষগুলো নলাকৃতি (অনেকটা ঐচ্ছিক

পেশির মতো), শাখান্বিত ও আড়াআড়ি দাগযুক্ত। এ টিস্যুর কোষগুলোর মধ্যে ইন্টারক্যালাটেড ডিস্ক (Intercalated disc) থাকে। এদের সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ কার্ডিয়াক পেশি গঠন ঐচ্ছিক পেশির মতো হলেও কাজ অনৈচ্ছিক পেশির মতো। কার্ডিয়াক পেশির কোষগুলো শাখার মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে। হৃৎপিন্ডের সব কার্ডিয়াক পেশি সমন্বিতভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। মানব ভ্রূণ সৃষ্টির একটা বিশেষ পর্যায় থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত হৃৎপিন্ডের কার্ডিয়াক পেশি একটা নির্দিষ্ট গতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে দেহের মধ্যে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া সচল রাখে।

৪. স্নায়ু টিস্যু (Nerve tissue)

দেহের বিশেষ সংবেদী কোষ নিউরন বা স্নায়ু কোষগুলো একত্রে স্নায়ু টিস্যু গঠিন করে। স্নায়ু টিস্যু অসংখ্য নিউরন দিয়ে গঠিত। এর গঠন সম্পর্কে তোমরা দশম অধ্যায়ে জানতে পারবে। স্নায়ু টিস্যু পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা যেমন তাপ, স্পর্শ, চাপ ইত্যাদি গ্রহণ করে দেহের ভিতরে মস্তিষ্কে পরিবাহিত করে এবং মস্তিষ্কের বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপযুক্ত কাজ করে থাকে। একটি আদর্শ নিউরনের তিনটি অংশ থাকে, যথা– অ্যাক্সন, ডেনড্রাইট ও কোষদেহ। নিউরন কোষদেহ বহুভুজাকৃতি এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত। কোষের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিবডি, রাইবোসোম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি থাকে, তবে নিউরণের সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় সেন্ট্রিওল থাকে না বলে নিউরন বিভাজিত হয় না। নিউরনের কোষদেহ থেকে একটি লম্বা স্নায়ুতন্তু নিউরনের ডেনড্রাইটের সাথে যুক্ত থাকে তাকে অ্যাক্সন বলে। একটি নিউরনের একটি মাত্র অ্যাক্সন থাকে। পরপর দুটি নিউরনে প্রথমটির অ্যাক্সন এবং পরেরটির ডেনড্রাইটের মধ্যে একটি স্নায়ুসন্ধি গঠন হয় তাকে সিনাপস (Synaps) বলে। সিনাপস এর মধ্য দিয়েই একটি নিউরন থেকে উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনে পরিবাহিত হয়। স্নায়ুটিস্যু উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে পরিবাহিত হয় এবং তাতে সাড়া দেয়। উচ্চতর প্রাণীতে স্নায়ু টিস্যু মস্তিষ্কে স্মৃতি সংরক্ষণ (Memorise) করা সহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

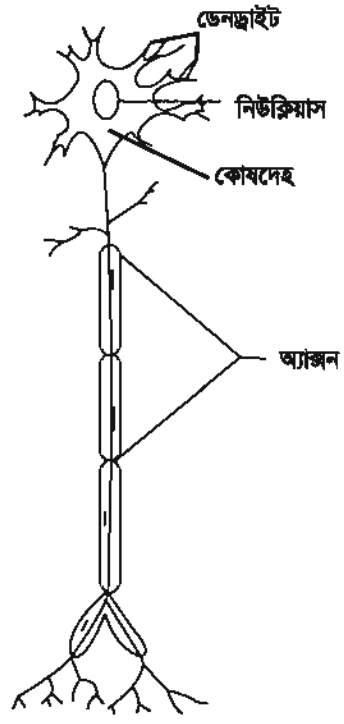

চিত্র ২.২৩ : একটি নিউরন

অঙ্গ ও তন্ত্র

এক বা একাধিক টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত এবং নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে সক্ষম প্রানী দেহের অংশবিশেষকে অঙ্গ (Organ) বলে। অর্থাৎ কোনো অঙ্গে একই অথবা একাধিক ধরনের টিস্যু থাকে এবং উক্ত অঙ্গ কোনো না কোনো নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। অঙ্গসমূহ নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (Anatomy) বলে।

অবস্থানভেদে মানবদেহে দু'ধরনের অঙ্গ আছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হাত, পা, মাথা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গসমূহ। বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয় তাকে বহিঃঅঙ্গসংস্থান (External morphology) বলে। আর জীবদেহের অভ্যন্তরের অঙ্গসমূহ সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয় তাকে অন্তঃঅঙ্গসংস্থান (Internal anatomy) বলে। পাকস্থলি, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, মলাশয়, হৃৎপিন্ড, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, প্লিহা, ফুসফুস, বৃক্ক, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় ইত্যাদি মানব দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের অংশ।

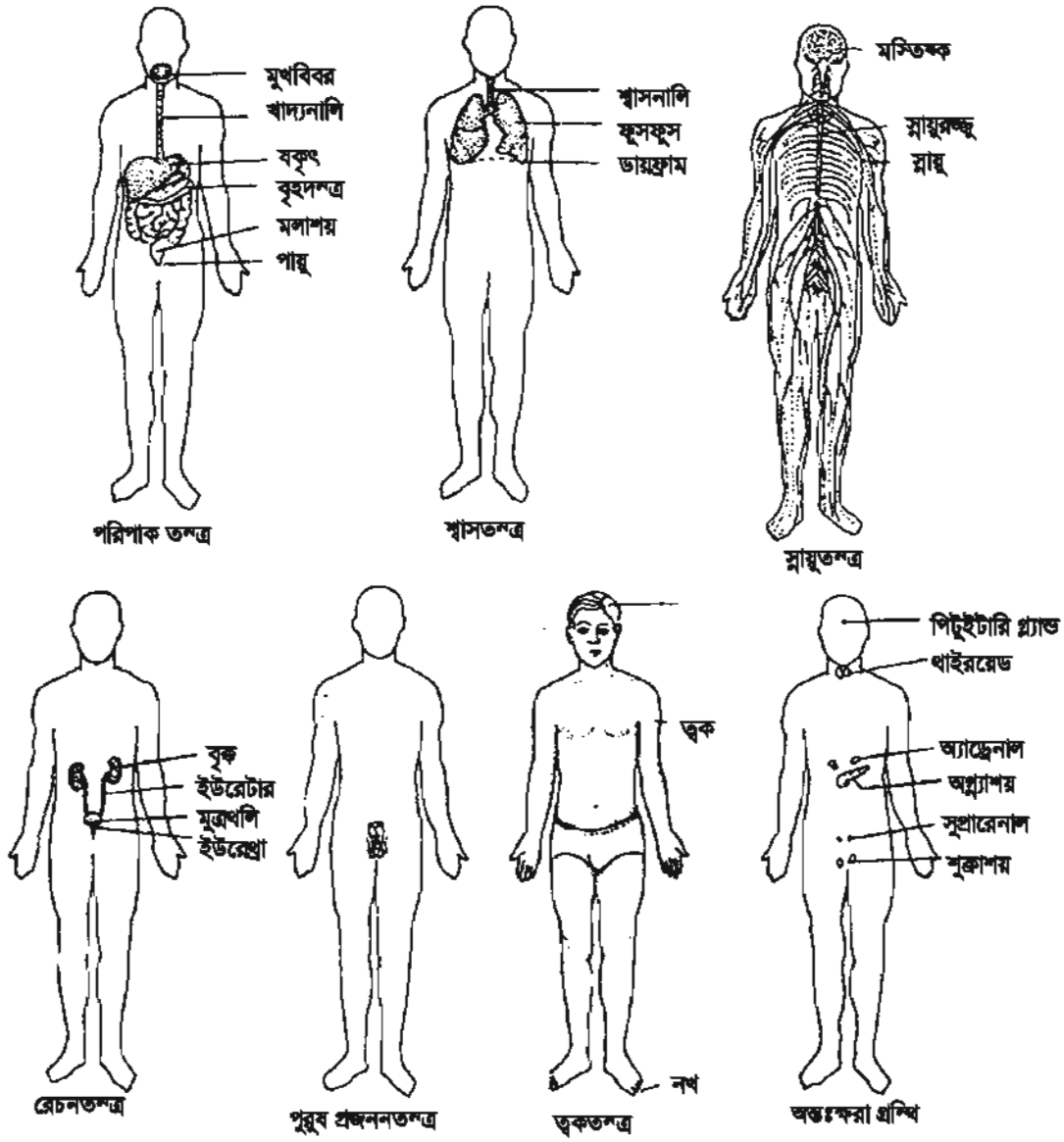

চিত্র ২.২৪ : মানব দেহের বিভিন্ন তন্ত্রের সরল চিত্র

পরিপাক, শ্বসন, রেচন, প্রজনন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রাণিদেহে কতগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে বিভিন্ন তন্ত্র গঠিত হয়। নিচে মানবদেহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তন্ত্রের ধারণা দেয়া হলো।

পরিপাকতন্ত্র (Digestive system) : এই তন্ত্র খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ এবং অপাচ্য খাদ্যাংশ নিষ্কাশনের সাথে জড়িত। পরিপাকতন্ত্রের দুটি প্রধান অংশ থাকে, যথা: পৌষ্টিক নালি (digestive canal) এবং পৌষ্টিক পরিপাকগ্রন্থি (digestive glands) পৌষ্টিক নালি মুখছিদ্র, মুখগহবর, গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, রেকটাম বা মলাশয় এবং পায়ুছিদ্র নিয়ে গঠিত। মানুষের লালাগ্রন্থি, যকৃত এবং অগ্ন্যাশয় পৌষ্টিক গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। এসব গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system) : মানুষের নাসারন্ধ্র, গলবিল, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলাই এবং একজোড়া ফুসফুস নিয়ে মানুষের শ্বসনতন্ত্র গঠিত। এই তন্ত্র মানুষের দেহের সঞ্চিত খাদ্যকে পরিবেশ থেকে গৃহীত

অক্সিজেনের সাহায্যে জারণ প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন করে। এ শক্তি দেহের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করে।

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system) : দেহের বাহিরের ও ভিতরের উদ্দীপনা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা এই তন্ত্রের কাজ। মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড এবং করোটিকা স্নায়ু নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নামে স্নায়ুতন্ত্রের আরও একটি অংশ আছে। স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশ দেহের অনৈচ্ছিক পেশির কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

রেচনতন্ত্র (Excretory system) : দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় বিপাক ক্রিয়ার ফলে দেহে উপজাত দ্রব্য হিসেবে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়। এসব বর্জ্য পদার্থ সাধারণত দেহের জন্য ক্ষতিকর যা দেহ থেকে নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়। দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করার এ পদ্ধতিকে রেচন প্রক্রিয়া বলে। রেচন প্রক্রিয়া যে তন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হয় তাকে রেচনতন্ত্র বলে। একজোড়া বৃক্ক, একজোড়া ইউরেটর, একটি মূত্রথলি এবং একটি মূত্রনালি নিয়ে মানুষের রেচনতন্ত্র গঠিত।

জননতন্ত্র (Reproductive system) : প্রজাতির ধারাকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য এই তন্ত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্যামেট (অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বক) তৈরি করা ছাড়াও ভ্রূণ ও শিশু ধারক অংগ নিয়ে গঠিত। সাধারণত পরিণত বয়সে জননতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণীর প্রজনন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এভাবে প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতির ধারা অব্যাহত থাকে। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ মানুষের দেহে পুরুষ প্রজননতন্ত্র এবং স্ত্রীলোকের দেহে স্ত্রী প্রজনতন্ত্র বিদ্যমান।

ত্বক তন্ত্র (Integumentory system) : দেহের বাইরের দিকে যে আচ্ছাদনকারী আবরণ থাকে তাকে ত্বক বা চামড়া (skin) বলে। কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিগত ত্বক এই দেহকে আচ্ছাদন করে, বাইরের আঘাত এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে । এছাড়া দেহের জলীয় অংশকে দেহের ভিতর সংরক্ষণ করে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine glands) : প্রাণী দেহে কতকগুলো নালিহীন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে হরমোন বলে। পরিবহন করার জন্য এর কোনো নির্দিষ্ট নালি থাকে না। শুধুমাত্র রক্তের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে হরমোন পরিবহন করে। পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস, সুপ্রারেনাল ইত্যাদি গ্রন্থির সমন্বয়ে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র গঠিত।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

যোদ্ধার কাছে যেমন অস্ত্র, জ্যোতিরবিজ্ঞানীর কাছে দূরবীক্ষণ যন্ত্র তেমনি জীববিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র একটি অপরিহার্য গবেষণা সহায়ক উপকরণ। এর সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকে বহুগুণ বড় করে দেখা যায়। তোমাদের বিদ্যালয়ে যে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে তাতে আলোর সাহায্যে এসব ক্ষুদ্র বস্তু দেখার ব্যবস্থা আছে। এসব অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। আলোর বদলে ইলেকট্রন ব্যবহার করে যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র তাকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দু'ধরনের। যথা– সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র : এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ফুটের উপরে একটি স্তম্ভ থাকে যার সাথে একটি কাচের স্টেজ সংযুক্ত থাকে। এই কাচের স্টেজে দুটো ক্লিপ লাগানো থাকে। স্তম্ভের নিচের দিকে সম্মুখভাগে একটি আয়না রয়েছে। স্তম্ভের উপরে একটি টানা নল এবং এর বাহুতে লেন্স ধরে রাখার জন্য আংটা থাকে। এই আংটায় লেন্স বসিয়ে স্থূল এডজাস্টমেন্ট

স্ক্রু ঘুরিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর ফোকাস করা যাবে। প্রয়োজনে আয়না দিয়ে আলো দ্রষ্টব্য বস্তুতে প্রতিফলিত করে পরীক্ষার কাজ শুরু করতে হবে। যে ভিত্তির উপর যন্ত্রটি দাঁড়িয়ে সেটিকে পাদদেশ বলে।

চিত্র–২.২৫: একটি সরল অণুবীক্ষণযন্ত্র।

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানার পূর্বে এর বিভিন্ন অংশগুলোর নাম জেনে নেওয়া ভালো। পাশের চিত্রটি লক্ষ কর। যে ভিত্তির উপর যন্ত্রটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে পাদদেশ বা ফুট বলে। এর দুটি শাখা সামনের দিকে প্রসারিত থাকায় যন্ত্রটি দৃঢ়ভাবে টেবিলের উপর স্থাপন করা যায়। এর সাথে প্রসারিত দুটির মধ্যখানে একটি আয়না লাগানো থাকে। ফুটের উপর স্ক্রু দিয়ে বাঁকানো অর্ধবৃত্তাকার ধাতব দেহ থাকে। এর নিচের অংশে একটি মঞ্চ বা স্টেজ লাগানো থাকে। চৌকোনাকার স্টেজের মধ্যখানে একটি বড় ছিদ্র ও উপরে দুপাশে দুটি ক্লিপ থাকে। এই ছিদ্রের নিচে কখনও কন্ডেনসার থাকতে পারে। দেহের উপরের বাঁকানো অংশের সাথে একটি লম্বা নল লাগানো থাকে। একে দেহনল এবং বাঁকা অংশকে বাহু বলে। ফুটের উঁচু যে অংশের সাথে বাহুটি স্ক্রু দ্বারা লাগানো থাকে তাকে স্তম্ভ বলে। দেহনলের উপরে টানা নল বা ড্র টিউব থাকে যার অভ্যন্তরে আইপিস লেন্সটি প্রবেশ করানো হয়। এখানে চোখ রাখতে হয়। দেহনল বাহুর সাথে লাগানো থাকে। দুটো এডজাস্টমেন্ট স্ক্রু দ্বারা দেহনলকে উপরে নিচে উঠানামা করা যায়। দেহনলের নিচে ঘূর্ণায়মান নোসপিস লাগানো থাকে। এতে কয়েকটি লেন্স সংযুক্ত থাকে। স্থান পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় লেন্সটি স্লাইডের উপর স্থাপন করা যায়।

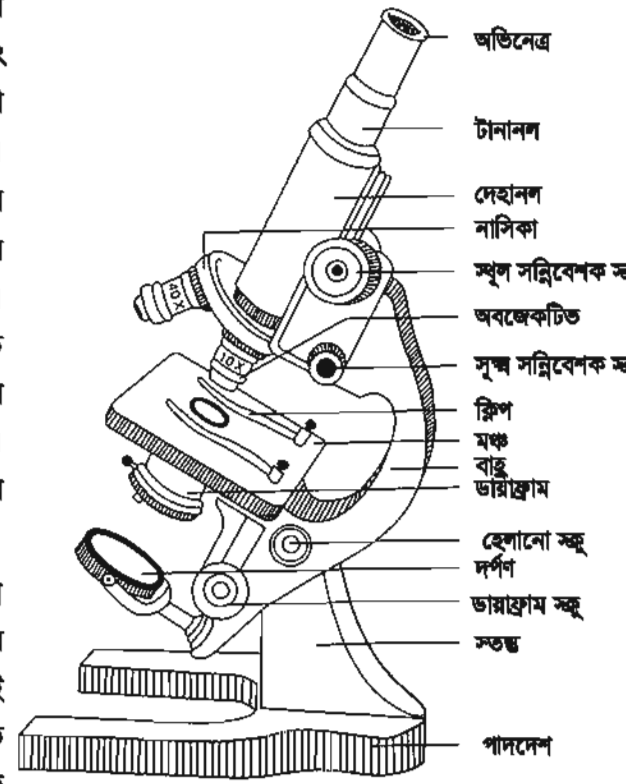

চিত্র–২.২৬: একটি যৌগিক অণুবীক্ষণযন্ত্র

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার : অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার করতে চাইলে গবেষণাগারের আলোকিত স্থানে এটি স্থাপন করতে হবে। প্রথমেই আয়নাটি নাড়িয়ে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি মঞ্চটির ছিদ্র বরাবর স্থাপিত কাচের স্লাইডের নিচে প্রতিফলিত হয়। যে স্লাইডটি পর্যবেক্ষণ করা হবে তা মঞ্চের ক্লিপের সাহায্যে এঁটে দিতে হবে। এরপর নোসপিস ঘুরিয়ে নিম্ন পাওয়ারের লেন্স স্লাইড বরাবর স্থাপন করতে হবে। এবার প্রথমে স্থূল এডজাস্টমেন্ট স্ক্রু এবং পরে সূক্ষ্ম এ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে দেখার বস্তুটি ফোকাসে আনতে হবে।

এবার টানা নলে স্থাপিত আইপিস লেন্সে চোখ রেখে দেখতে হবে। প্রয়োজনে সূক্ষ্ম এ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে নেওয়া যাবে। দেখার সময় দুটি চোখই খোলা রাখার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে কষ্ট হলেও ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে। এক চোখে অণুবীক্ষণযন্ত্র দেখলে চোখ সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যদি উচ্চ পাওয়ারের দরকার হয় তবে অবশ্যই শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে নোসপিস ঘুরিয়ে উচ্চ পাওয়ারের লেন্স স্থাপন করতে হবে।

কাজ–১ : অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ কোষ (পেঁয়াজ কোষ) পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপাদান : পেঁয়াজ, ব্লেড, স্লাইড, কভার স্লিপ, ওয়াচ গ্লাস, তুলি, গ্লিসারিন ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

পদ্ধতি : পেঁয়াজ থেকে শুকনো খোসাগুলো ছাড়িয়ে নাও। এবার যে কোনো একটি স্ফীত, রসালো শল্কপত্র নাও। ব্লেড দিয়ে শল্কপত্রের উপরিভাগ থেকে সামান্য ত্বকস্তর তুলে নিয়ে ওয়াচ গ্লাসে রক্ষিত পানিতে রাখ। তুলির সাহায্যে ওয়াচ গ্লাসের পানি থেকে ত্বকস্তর তুলে নিয়ে একটি পরিষ্কার স্লাইডের উপর রাখ। এবার ত্বক স্তরের উপর এক ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে তার উপর ধীরে ধীরে কভার স্লিপ রাখ ।

পর্যবেক্ষণ : যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ দিয়ে দেখ। আয়তাকার, পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত কোষ দেখতে পাবে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ দিয়ে দেখ। প্রতিটি কোষে পাতলা, দানাযুক্ত প্রোটোপ্লাজম, কোষ গহ্বর এবং একপাশে একটি নিউক্লিয়াস দেখতে পাবে।

কাজ–২ : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণিকোষ (অ্যামিবা) পর্যবেক্ষণ কর।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : অণুবীক্ষণ যন্ত্র, স্লাইড, কভার স্লিপ, ড্রপার, পেট্রিডিস, পিপেট, কাচের দন্ড, কাচের বাটি ও পানি।

পদ্ধতি : কাজের শুরুতে কোনো পচা ডোবা বা পুকুরের তলদেশ থেকে ডালপালাসহ পচাপাতা সংগ্রহ কর। এগুলো ছোট করে কেটে কাচের বাটিতে রেখে অল্প পানিসহ কাচের দন্ড দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাক। এভাবে কিছুক্ষণ নেড়ে বাটিটিকে একস্থানে স্থিরভাবে রেখে দাও। কাচপাত্রে তলানি জমলে একটি পিপেট দিয়ে ঐ তলানি তুলে পেট্রিডিসে জমা কর। এবার ড্রপার দিয়ে এক ফোঁটা তলানি কাচের স্লাইডে তুলে কভার স্লিপ দিয়ে চাপা দেওয়ার পর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে স্থাপন কর।

পর্যবেক্ষণ : স্লাইড একটু এদিক সেদিক করে খোঁজাখুঁজি করলেই স্বচ্ছ জেলির ন্যায় কতগুলো ক্ষুদ্র জীব দেখতে পাবে। এগুলোই অ্যামিবা। এতে বহু ক্ষণপদ ও গহবর দেখতে পাবে এবং কোষটিকে বেস্টন করে প্লাজমালেমা নামক একটি পর্দা দেখতে পাবে। এতে উদ্ভিদ কোষের মতো কোনো প্লাস্টিড থাকে না। উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা গেল কি? এবার যা যা দেখলে তার চিত্র খাতায় এঁকে চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোষ কাকে বলে?

২. প্লাস্টিডের কাজগুলো কী কী?

৩. টিস্যু ও অঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

৪. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির গুরুত্ব কী?

৫. কোষের শক্তিঘর কাকে বলে?

৬. রক্তের কাজ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর।

২. বিভিন্ন প্রকার সরল কলার গঠন ও কাজের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৩. বিভিন্ন প্রকার প্রাণীকলার গঠন ও কাজ আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লাইসোজোমের কাজ কোনটি?

ক. খাদ্য তৈরি খ. শক্তি উৎপাদন

গ. জীবাণুভক্ষণ ঘ. আমিষ সংশ্লেষণ

২. অ্যামিবা একটি প্রাণিকোষ কারণ এর–

i. কেন্দ্রিকার গঠন সুসম্পূর্ণ

ii. বর্ণ গঠনকারী অঙ্গা আছে

iii. কোষ ঝিল্লী দেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রোহিত গ্রামের বাড়িতে যাবার সময় দেখল একজন লোক পাট গাছ থেকে আঁশ ছাড়াচ্ছে।

৩. উদ্দীপকের সংগৃহীত অংশটিতে কোন ধরনের টিস্যু বিদ্যমান?

ক. প্যারেনকাইমা খ. কোলেনকাইমা

গ. ক্লোরেনকাইমা ঘ. স্ক্লেরেনকাইমা

৪. উদ্দীপকের সংগৃহীত অংশের টিস্যুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

i. কোষপ্রাচীর লিগনিনযুক্ত

ii. কোষপ্রাচীরের পুরুত্ব অসমান

iii. কোষে প্রোটোপ্লাজম অনুপস্থিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.

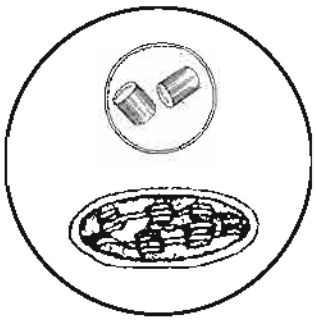

ক. প্লাজমালেমা কী?

খ. প্লাস্টিডকে বর্ণগঠনকারী অঙ্গ বলা হয় কেন?

গ. জীবজগতের জন্য N চিহ্নিত অংশটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. M চিহ্নিত অংশটির অনুপস্থিতিতে জীবদেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিবে তা বিশ্লেষণ কর।

২.

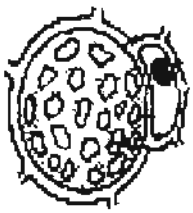

চিত্র– A

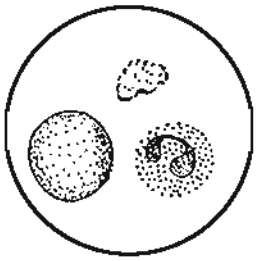

চিত্র– B

ক. পেশি টিস্যু কী?

খ. স্কেলিটাল টিস্যু কীভাবে মস্তিষ্ককে রক্ষা করে?

গ. চিত্রের Q চিহ্নিত অংশটির ঐরূপ অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্র A ও B -এর মধ্যে একটি পরিবহন কাজ ছাড়াও অন্যান্য জৈবিক কাজে কীভাবে ভূমিকা রাখে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

কোষ বিভাজন (Cell division)

এককোষী জীব থেকে শুরু করে বহুকোষী জীব পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই নানা ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়। এগুলোর কোনোটি দৈহিক আকৃতি বাড়ায়, কোনোটি জনন কোষ সৃষ্টি করে, আবার কোনোটি দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই বিভিন্ন ধরনের কোষবিভাজন কীভাবে হয়ে থাকে এ সম্পর্কে আমরা এ অধ্যায়ে জানার চেষ্টা করব।

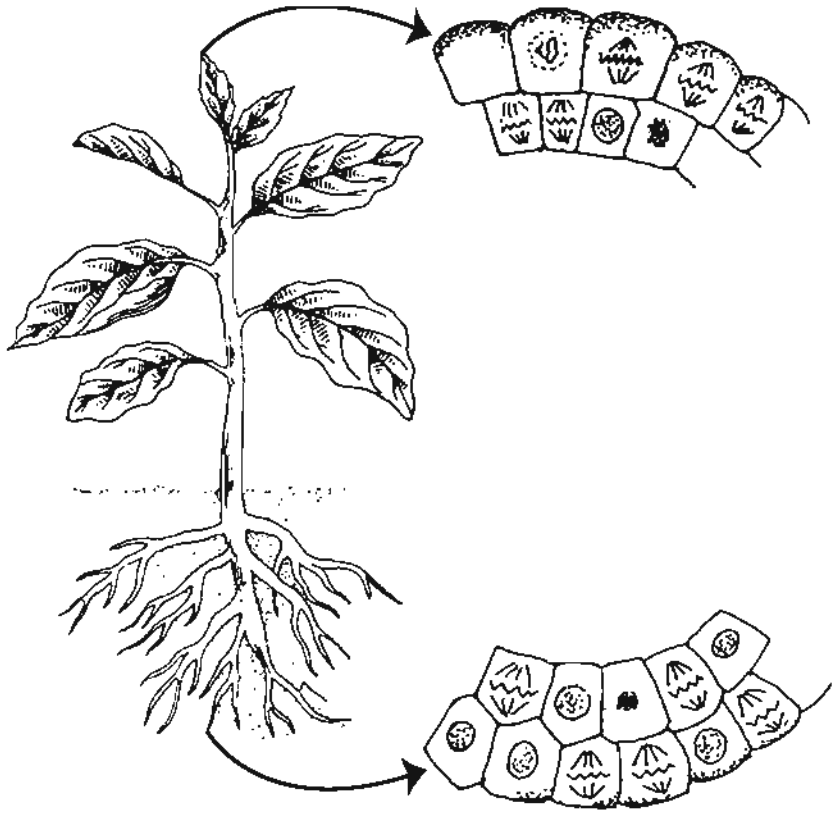

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- কোষ বিভাজনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- মাইটোসিস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাইটোসিসের পর্যায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- জীবদেহে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- মিয়োসিস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জননকোষ উৎপাদনে মিয়োসিসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় কোষ বিভাজনের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

প্রতিটি জীবদেহ কোষ দিয়ে গঠিত। একটি মাত্র কোষ দিয়ে প্রতিটি জীবের জীবন শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে এ কোষটিরও উৎপত্তি হয় আগের কোনো কোষ থেকেই। বিভাজনের মাধ্যমে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি একটি স্বাভাবিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো জীবের দেহ একটি মাত্র কোষ দিয়ে গঠিত। এদের বলা হয় এককোষী (unicellular) জীব, যেমন ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা, প্লাজমোডিয়াম প্রভৃতি। এসব জীব বিভাজনের মাধ্যমেই একটি কোষ থেকে অসংখ্য এককোষী জীবে পরিণত হয়। আবার অনেক জীব একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। এদের বলা হয় বহুকোষী (multicellular) জীব। মানুষ, আম গাছ, বট গাছ ইত্যাদি জীব কোটি কোটি কোষ দিয়ে গঠিত। বিশালদেহি একটি বটগাছের সূচনাও ঘটে একটি মাত্র কোষ (জাইগোট বা নিষিক্ত ডিম্বক) থেকে। এককোষী নিষিক্ত ডিম্বক থেকে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একসময় কোটি কোটি কোষের একটি পরিণত মানুষের সৃষ্টি হয়। আবার কোষ বিভাজনের মাধ্যমেই পুং ও স্ত্রী গ্যামেট সৃষ্টি হয়ে নতুন প্রজন্মের জন্ম হয়। জীবের বৃদ্ধি ও প্রজননের উদ্দেশ্যে কোষ বিভাজনের (cell division) মাধ্যমে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ (Types of cell division)

জীবদেহে তিন প্রকার কোষবিভাজন দেখা যায়, যথা– ১। অ্যামাইটোসিস (Amitosis) ২। মাইটোসিস (Mitosis) ৩। মিয়োসিস (Meiosis)

১। **অ্যামাইটোসিস :** এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় কোষের নিউক্লিয়াসটি প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি দুটি অংশে ভাগ হয়। বিভাজনের শুরুতে নিউক্লিয়াসটি ধীরে ধীরে লম্বা হতে থাকে এবং পরে দুইপ্রান্ত মোটা ও মাঝের অংশটি সরু হতে থাকে। মাঝের সরু অংশটি ক্রমশ আরও সরু হয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দুটি অপত্য (daughter) নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে কোষপ্রাচীরটির মধ্যভাগ ভিতরের দিকে প্রবেশ করে সাইটোপ্লাজমকেও দুইভাগে বিভক্ত করে ফেলে এবং দুটি অপত্য কোষের (daughter cell) সৃষ্টি করে। ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল, ঈস্ট প্রভৃতি জীবকোষে এ ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে।

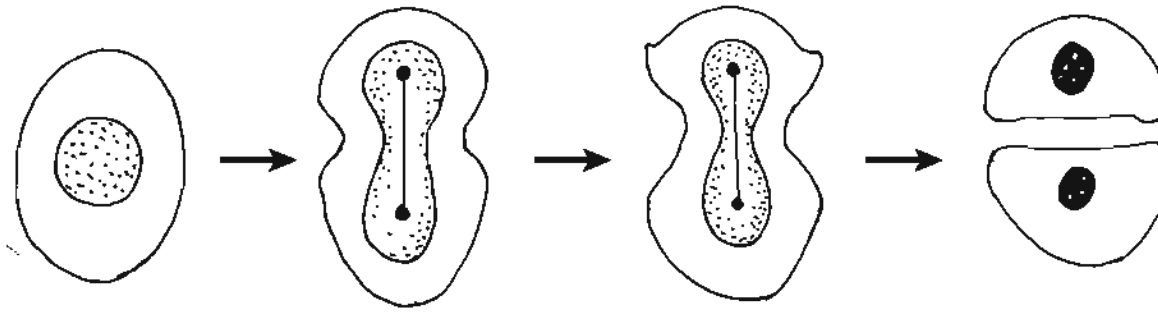

চিত্র ৩.১ : অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন

২। **মাইটোসিস (Mitosis) :** এই কোষবিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রকৃত কোষ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয়। এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম একবার বিভক্ত হয় এবং সৃষ্ট অপত্য কোষ বা নতুন কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা, গঠন ও গুণাগুণ মাতৃকোষের (mother cell) মতো হয়। এই বিভাজন দেহকোষে (somatic cell) হয়ে থাকে এবং বিভাজনের ফলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণী ও উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। প্রাণীর দেহকোষে এবং উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশের ভাজক টিস্যু যেমন– কাণ্ড, মূলের অগ্রভাগ, ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল, বর্ধনশীল পাতা, মুকুল ইত্যাদিতে মাইটোসিস বিভাজন হয়।

মাইটোসিসের পর্যায়সমূহ: মাইটোসিস কোষবিভাজন একটি অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই বিভাজনে প্রথমে ক্যারিওকাইনেসিস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে এবং পরবর্তীতে সাইটোকাইনেসিস অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে। বিভাজন শুরুর পূর্বে কোষের নিউক্লিয়াসে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ হয়। এ অবস্থাকে ইন্টারফেজ পর্যায় বলে। বর্ণনার সুবিধার জন্য মাইটোসিস প্রক্রিয়াকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে। পর্যায়গুলো নিম্নরূপ :

(ক) প্রোফেজ (Prophase)

(খ) প্রো–মেটাফেজ (Pro-metaphase)

(গ) মেটাফেজ (Metaphase)

(ঘ) অ্যানাফেজ (Anaphase)

(ঙ) টেলোফেজ (Telophase)

(ক) **প্রোফেজ (Prophase) :** এটি মাইটোসিসের প্রথম পর্যায়। এ পর্যায়ে কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয় এবং ক্রোমোজোম থেকে পানি হ্রাস পেতে থাকে। ফলে ক্রোমোজোমগুলো ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে মোটা ও খাটো হতে শুরু করে। তখন যৌগিক অণুবীক্ষণযন্ত্রে এদের দেখা সম্ভব হয়। এ পর্যায়ে প্রতিটি ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত লম্বালম্বি দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি ক্রোমাটিড উৎপন্ন করে। ক্রোমোজোমগুলো কুন্ডলিত অবস্থায় থাকাতে সংখ্যা গণনা করা যায় না।

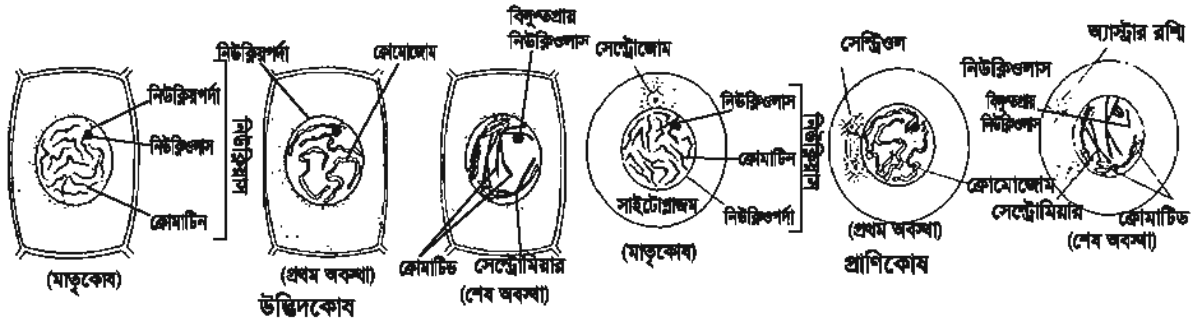

চিত্র ৩.২ : প্রোফেজ

(খ) **প্রো–মেটাফেজ (Pro-metaphase) :** এপর্যায়ের একেবারে প্রথমদিকে উদ্ভিদকোষে কতকগুলো তন্তুময় প্রোটিনের সমন্বয়ে দুইমেরু বিশিষ্ট স্পিন্ডল যন্ত্রের (spindle apparatus) সৃষ্টি হয়। স্পিন্ডল যন্ত্রের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানকে ইকুয়েটর বা বিষুবীয় অঞ্চল বলা হয়। স্পিন্ডলযন্ত্রের তন্তুগুলো এক মেরু থেকে অপর মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। এদেরকে স্পিন্ডল তন্তু (spindle fibre) বলা হয়। এ পর্যায়ে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার স্পিন্ডলযন্ত্রের কতিপয় নির্দিষ্ট তন্তুর সাথে সংযুক্ত হয়। এই তন্তুগুলোকে আকর্ষণ তন্তু (traction fibre) বলা হয়। ক্রোমোজোমের সাথে এই তন্তুগুলি সংযুক্ত বলে এদের ক্রোমোজোমাল তন্তুও বলা হয়। ক্রোমোজোমগুলো এ সময়ে বিষুবীয় অঞ্চলে বিন্যস্ত হতে থাকে। কোষের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাসের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। প্রাণিকোষে স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি ছাড়াও পূর্বে বিভক্ত সেন্ট্রিওল দুটি দুই মেরুতে অবস্থান করে এবং সেন্ট্রিওল দুটির চারিদিক থেকে রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। একে অ্যাস্টার–রে বলে।

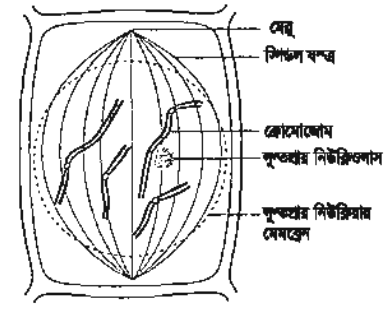

চিত্র ৩.৩ : প্রো–মেটাফেজ

(গ) **মেটাফেজ (Metaphase) :** এ পর্যায়ের প্রথমেই সব ক্রোমোজোম স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে (দুই মেরুর মধ্যখানে) অবস্থান করে। প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিষুবীয় অঞ্চলে এবং বাহু দুটি মেরুমুখী হয়ে অবস্থান করে। এ পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক মোটা ও খাটো হয়। প্রতিটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড দুটির আকর্ষণ কমে যায় এবং বিকর্ষণ শুরু হয়। এ পর্যায়ের শেষ দিকে সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন শুরু হয়। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাসের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

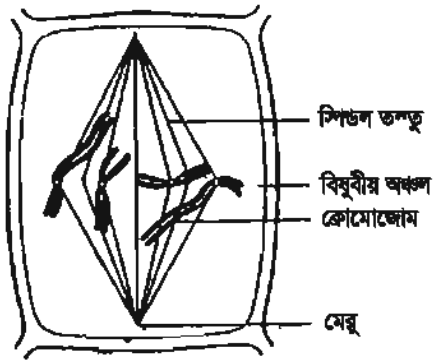

উদ্ভিদকোষ

প্রাণিকোষ

চিত্র ৩.৪ : মেটাফেজ

(ঘ) **অ্যানাফেজ (Anaphase) :** প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, ফলে ক্রোমোটিড দুটি আলাদা হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় প্রতিটি ক্রোমাটিডকে অপত্য ক্রোমোজোম বলে এবং এতে একটি করে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। অপত্য ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে বিকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়, ফলে এরা বিষুবীয় অঞ্চল থেকে পরস্পর বিপরীত মেরুর দিকে সরে যেতে থাকে। অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলোর অর্ধেক এক মেরুর দিকে এবং বাকি অর্ধেক অন্য মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অপত্য ক্রোমোজোমের মেরু অভিমুখী চলনে সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী থাকে এবং বাহুদ্বয় অনুগামী হয়। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমগুলি V, L, J বা I এর মতো আকার ধারণ করে। এদেরকে যথাক্রমে মেটাসেন্ট্রিক, সাবমেটাসেন্ট্রিক, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক বা টেলোসেন্ট্রিক বলে। অ্যানাফেজ পর্যায়ের শেষের দিকে অপত্য ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডলযন্ত্রের মেরুপ্রান্তে অবস্থান নেয় এবং ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

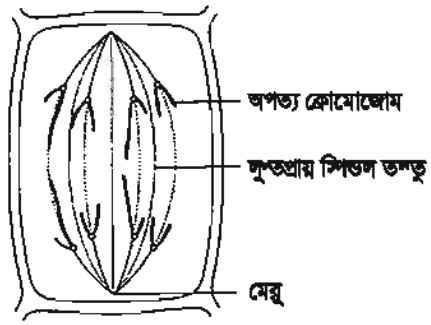

উদ্ভিদকোষ

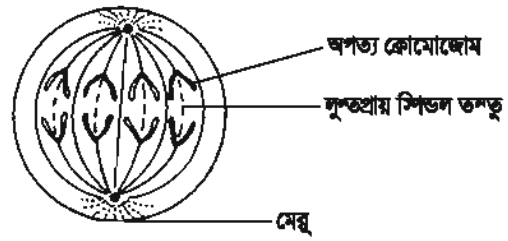

প্রাণিকোষ

চিত্র ৩.৫ : অ্যানাফেজ

(ঙ) **টেলোফেজ (Telophase) :** এটি মাইটোসিসের শেষ পর্যায়। এখানে প্রোফেজ এর ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমে বিপরীতভাবে ঘটে। ক্রোমোজোমগুলোতে পানি যোজন ঘটতে থাকে এবং সরু ও লম্বা আকার ধারণ করে। অবশেষে এরা জড়িয়ে গিয়ে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম গঠন করে। নিউক্লিওলাসের পুনঃআবির্ভাব ঘটে। নিউক্লিয়ার রেটিকুলামকে ঘিরে পুনরায় নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের সৃষ্টি হয়, ফলে দুই মেরুতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। স্পিন্ডলযন্ত্রের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে এবং তন্তুগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

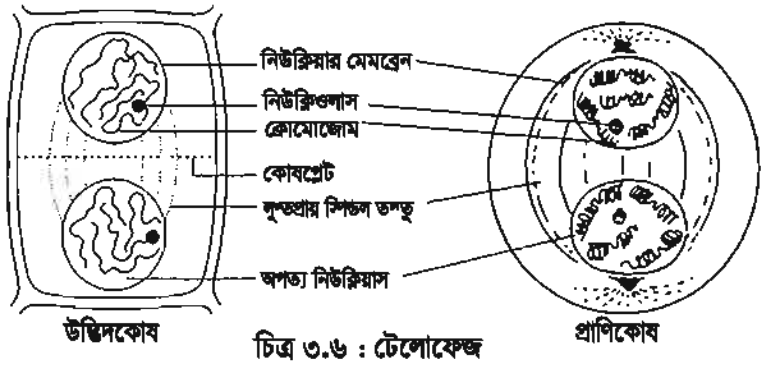

চিত্র ৩.৬ : টেলোফেজ

টেলোফেজ পর্যায়ের শেষে বিষুবীয় তলে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো জমা হয় এবং পরে এরা মিলিত হয়ে কোষ প্লেট গঠন করে। সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুসমূহের সমবন্টন ঘটে। ফলে দু'টি অপত্য কোষ (daughter cell) সৃষ্টি হয়। প্রাণীর ক্ষেত্রে স্পিন্ডলযন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর কোষ ঝিল্লীটি গর্তের ন্যায় ভিতরের দিকে ঢুকে যায় এবং এ গর্ত সবদিক থেকে ক্রমান্বয়ে গভীরতর হয়ে একত্রে মিলিত হয়, ফলে কোষটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে।

মাইটোসিসের গুরুত্ব : জীবদেহে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের কারণে প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যকার আয়তন ও পরিমাণগত ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এর ফলে বহুকোষী জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। সব বহুকোষী জীবই জাইগোট নামক একটি কোষ থেকে জীবন শুরু করে। এই একটি কোষই বার বার মাইটোসিস বিভাজনের ফলে অসংখ্য কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ণ জীবে পরিণত হয়। মাইটোসিসে সৃষ্ট অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও গুণাগুণ একই রকম থাকায় জীবের দেহের বৃদ্ধি সুশৃঙ্খলভাবে হতে পারে। কোষের স্বাভাবিক আকার, আকৃতি ও আয়তন বজায় রাখতে মাইটোসিস প্রয়োজন। এককোষী জীব মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে, মাইটোসিসের ফলে অঙ্গজ প্রজনন সাধিত হয় এবং জনন কোষের সংখ্যাবৃদ্ধিতে মাইটোসিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্ষতস্থানে নতুন কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবদেহের ক্ষতস্থান পূরণ করতে মাইটোসিস অপরিহার্য। কিছু কিছু জীবকোষ আছে যাদের আয়ুস্কাল নির্দিষ্ট। এসব কোষ বিনষ্ট হলে মাইটোসিসের মাধ্যমে এদের পূরণ ঘটে। মাইটোসিসের ফলে একই ধরনের কোষের উৎপত্তি হওয়ায় জীবজগতের গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তবে অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস টিউমার এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

কাজ : শিক্ষক কয়েকজন করে শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করে এক এক দলকে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের এক একটি পর্যায়ের চিত্র অংকন করে উপস্থাপন করতে বলবেন।

মিয়োসিস (Meiosis) : এ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি প্রকৃত কোষ বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভক্ত হয়ে চারটি অপত্য কোষে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস দুবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভক্ত হয়, ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। এ বিভাজনে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায় বলে এ প্রক্রিয়াকে হ্রাসমূলক বিভাজনও বলা হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে মিয়োসিস কেন হয়? মাইটোসিস কোষ বিভাজনে অপত্য কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের সমান থাকে। বৃদ্ধি ও অযৌন জননের জন্য মাইটোসিস কোষ বিভাজন অপরিহার্য। যৌন জননে পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের প্রয়োজন পড়ে। যদি জনন কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহ কোষের সমান থেকে যায় তা হলে জাইগোট

কোষে জীবটির দেহ কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মনে কর একটা জীবের দেহ কোষে এবং জনন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা চার (৪)। পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট জাইগোটে ক্রোমোজোম সংখ্যা দাঁড়াবে আট (৮) এবং নতুন জীবটির প্রতিটি কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা হবে আট যা মাতৃজীবের কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার দ্বিগুণ। যদি প্রতিটি জীবের জীবন চক্র এভাবে চলতে থাকে তাহলে প্রতি চক্রে যৌন জননের ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা বারবার দ্বিগুণ হতে থাকবে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে জেনেছি ক্রোমোজোম জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন বহন করে। তাহলে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হতে থাকলে বংশধরদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু জীবে যৌন জননে পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলন হওয়া সত্ত্বেও জীবের বংশপরম্পরায় ক্রোমোজোম সংখ্যা একই থাকে। কারণ মিয়োসিস কোষ বিভাজনে জনন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। জনন কোষ সৃষ্টির সময় এবং নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদের জীবন চক্রের কোনো এক সময় যখন এ রকম ঘটে তখন কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার সে অবস্থাকে হ্যাপ্লয়েড (n) বলে। যখন দুটি হ্যাপ্লয়েড কোষের মিলন ঘটে তখন সে অবস্থাকে ডিপ্লয়েড (2n) বলে।

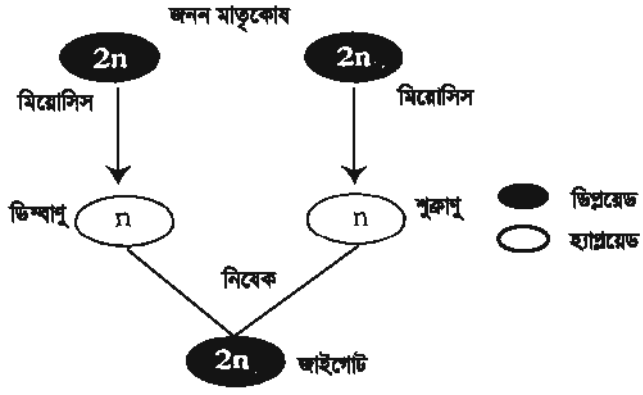

চিত্র ৩.৭ : মিয়োসিস

সুতরাং মিয়োসিস কোষ বিভাজন হয় বলেই প্রতিটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় টিকে থাকতে পারে।

মিয়োসিস প্রধানত জীবের জনন কোষ বা গ্যামেট সৃষ্টির সময় জনন মাতৃকোষে ঘটে। সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগধানী ও ডিম্বকের মধ্যে এবং উন্নত প্রাণিদেহে শুক্রাশয়ে ও ডিম্বাশয়ের মধ্যে মিয়োসিস ঘটে। মস ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড রেণু মাতৃকোষ থেকে যখন হ্যাপ্লয়েড রেণু উৎপন্ন হয় তখন জাইগোটে এ ধরনের বিভাজন ঘটে।

মিয়োসিস বিভাজনের সময় কোষে পর পর দুবার বিভাজিত হয়। প্রথম বিভাজনকে প্রথম মিয়োটিক বিভাজন বা মিয়োসিস–১ এবং দ্বিতীয় বিভাজনকে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন বা মিয়োসিস–২ বলা হয়। প্রথম বিভাজনের সময় অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেকে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিভাজনটি মাইটোসিসের অনুরূপ।

মিয়োসিস বিভাজন জীবে ক্রোমোজোমের সংখ্যার হ্রাস ঘটিয়ে প্রজাতির ক্রোমোজোমের সংখ্যা ধ্রুবক রাখে। ফলে বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততির দেহকোষে ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

তাছাড়া মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় জিনের আদান–প্রদান ঘটে ফলে প্রজাতির মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়।

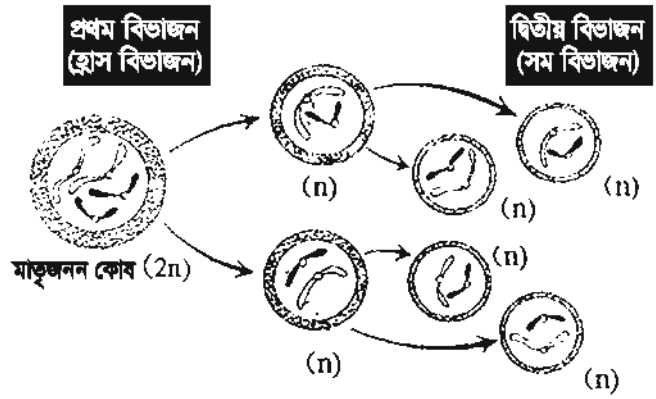

চিত্র ৩.৮ : মিয়োসিস বিভাজন সম্বন্ধে ধারণা

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। কোষ বিভাজন কী?

২। সমীকরণিক কোষ বিভাজন কাকে বলে?

৩। অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। চিহ্নিত চিত্রসহ মাইটোসিসের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ বর্ণনা কর।

২। মাইটোসিস প্রক্রিয়ার গুরুত্ব আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোন ধাপে নিউক্লিয়াসটি আকারে বড় হয়?

ক. প্রোফেজ খ. মেটাফেজ

গ. এনাফেজ ঘ. টেলোফেজ

২. মিয়োসিসের কারণে কোষে–

i. ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে

ii. হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক গ্যামেট তৈরি হয়

iii. গুণাগুণের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

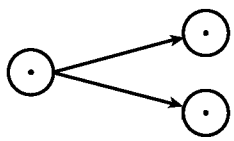

চিত্র–A

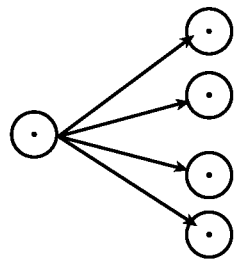

চিত্র– B

৩. A চিত্রের কোষ বিভাজনে–

i. মাতৃকোষ ও নতুন সৃষ্ট কোষ সমগুণ সম্পন্ন

ii. নতুন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক থাকে

iii. ক্রোমোজোম মাত্র একবার বিভাজিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪. B চিত্রের বিভাজনটি A থেকে ব্যতিক্রম কারণ, এর ফলে

ক. অপত্য জীবে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ঠিক থাকে　　খ. ক্রোমোজোমের সংখ্যা বেড়ে যায়

গ. অস্বাভাবিক কোষ সৃষ্টি হয়　　ঘ. দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

ধাপ–A

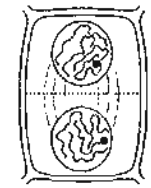

ধাপ– B

ক. অ্যামাইটোসিস কোথায় ঘটে?

খ. মিয়োসিসকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন বুঝিয়ে লেখ?

গ. উদ্দীপকের B ধাপটিতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে না ঘটলে জীবে কী সমস্যা হতে পারে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনীশক্তি (Bioenergetics)

জীবন পরিচালনার জন্য জীব কোষে প্রতিনিয়ত হাজারো রকমের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া চলে। এসব বিক্রিয়ার জন্য কমবেশি শক্তির প্রয়োজন হয়। শক্তির মূল উৎস সূর্য। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। প্রাণী ও অসবুজ জীব সৌরশক্তিকে সরাসরি আবদ্ধ করে দৈহিক কাজে ব্যবহার করতে পারে না। জীবন পরিচালনার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় সে শক্তির জন্য তাদের কোনো না কোনোভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হয়। এ সব বিষয় আলোচনা করাই জীবনীশক্তি বা বায়োএনার্জেটিক্স (Bioenergetics) এর মূল উদ্দেশ্য এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হলো।

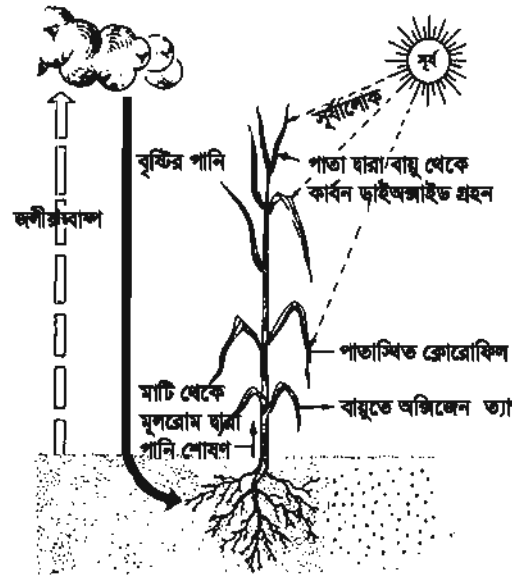

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- কোষে প্রধান শক্তির উৎস হিসেবে এটিপির (ATP) ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা প্রস্তুতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণে ক্লোরোফিল এবং আলোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণের প্রভাবকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণের উপর জীবের নির্ভরশীলতার কারণ মূল্যায়ন করতে পারব।
- শ্বসন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সবাত ও অবাত শ্বসনের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মধ্যে তুলনা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল ও আলোর অপরিহার্যতার পরীক্ষাটি করতে পারব।
- শ্বসন প্রক্রিয়ায় তাপ নির্গমনের পরীক্ষাটি করতে পারব।
- জীবের খাদ্য প্রস্তুতে উদ্ভিদের অবদান উপলব্ধি করতে পারব এবং উদ্ভিদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করতে শিখব।

ভূমিকা : জীব কর্তৃক তার দেহে শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহারের মৌলিক কৌশলই হচ্ছে জীবনীশক্তি। শক্তির মূল উৎস সূর্য। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে প্রথমে ATP ও NADPH নামক জৈব যৌগে আবদ্ধ করে। এগুলোই হলো জীবনীশক্তি বা বায়োএনার্জি। পরবর্তীতে সালোকসংশ্লেষণের কার্বন বিজারণ পর্যায়ে এ শক্তি শর্করা ও অন্যান্য জৈব যৌগের অণুর রাসায়নিক বন্ধনীতে সঞ্চিত বা আবদ্ধ হয়। জীবন পরিচালনার জন্য জীবকোষে তথা জীবদেহে প্রতিনিয়ত হাজারো রকমের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এসব বিক্রিয়া পরিচালিত হয় বায়োএনার্জি দ্বারা।

কিছু শক্তিসমৃদ্ধ যৌগ উচ্চশক্তি ধারণ করে এবং প্রয়োজনে অন্য বিক্রিয়ায় শক্তি যোগায় যেমন ATP, GTP, NAD, NADP, $FADH_2$ ইত্যাদি। ATP শক্তি জমা করে রাখে এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্য বিক্রিয়ায় শক্তি সরবরাহ করে। এজন্য ATP–কে 'জৈবমুদ্রা' বা 'শক্তি মুদ্রা' (Biological coin or energy coin) বলা হয়। সালোকসংশ্লেষণের সময় ADP সৌরশক্তি গ্রহণ করে ATP তে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে 'ফটোফসফোরাইলেশন' (Photophosphorylation) বলা হয়।

$$\text{ADP} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সৌরশক্তি}} \text{ATP}$$

এ প্রক্রিয়ায় ATP-এর তৃতীয় ফসফেট বন্ধনীতে প্রায় ৭৩০০ ক্যালরি সৌরশক্তি আবদ্ধ হয়। ATP হলো মুক্তশক্তির বাহক, এর ফসফেট বন্ধনীর মধ্যে শক্তি আবদ্ধ থাকে। জৈব সংশ্লেষণ, পরিবহন ও অন্যান্য বিপাকীয় কাজে শক্তির প্রয়োজন হলে ATP (Adenosine diphosphate) ভেঙ্গে ADP (Adenosine diphosphate) ও AMP (Adenosine monophosphate) তৈরি হয় এবং শক্তি উৎপন্ন হয়।

সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis)

সবুজ উদ্ভিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, এরা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ও পানি থেকে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। সবুজ উদ্ভিদে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হওয়ায় এ প্রক্রিয়াকে সালোকসংশ্লেষণ (photosynthesis) বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সবুজ উদ্ভিদে প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদ নিজে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বিপাকীয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে ব্যবহার করে এবং অবশিষ্ট খাদ্য ফল, মূল, কাণ্ড অথবা পাতায় সঞ্চিত হয়। উদ্ভিদ দ্বারা সঞ্চিত খাদ্যের উপরেই মানবজাতি ও অন্যান্য জীবজন্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে। সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হলো : (১) ক্লোরোফিল, (২) আলো, (৩) পানি এবং (৪) কার্বন ডাইঅক্সাইড। সালোকসংশ্লেষণ একটি জৈব রাসায়নিক (biochemical) বিক্রিয়া যা নিম্নরূপ–

$$6CO_2+12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} C_6H_{12}O_6+6H_2O+6O_2$$

পাতার মেসোফিল টিস্যু সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান স্থান। স্থলজ সবুজ উদ্ভিদ মাটি থেকে মূল দিয়ে পানি শোষণ করে পাতার মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছায় এবং পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু থেকে CO_2 গ্রহণ করে যা মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছে। জলজ উদ্ভিদ পানিতে দ্রবীভূত CO_2 গ্রহণ করে। বায়ুমণ্ডলে ০.০৩% এবং পানিতে ০.৩% CO_2 আছে। কাজেই জলজ উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণের হার স্থলজ উদ্ভিদ থেকে বেশি।

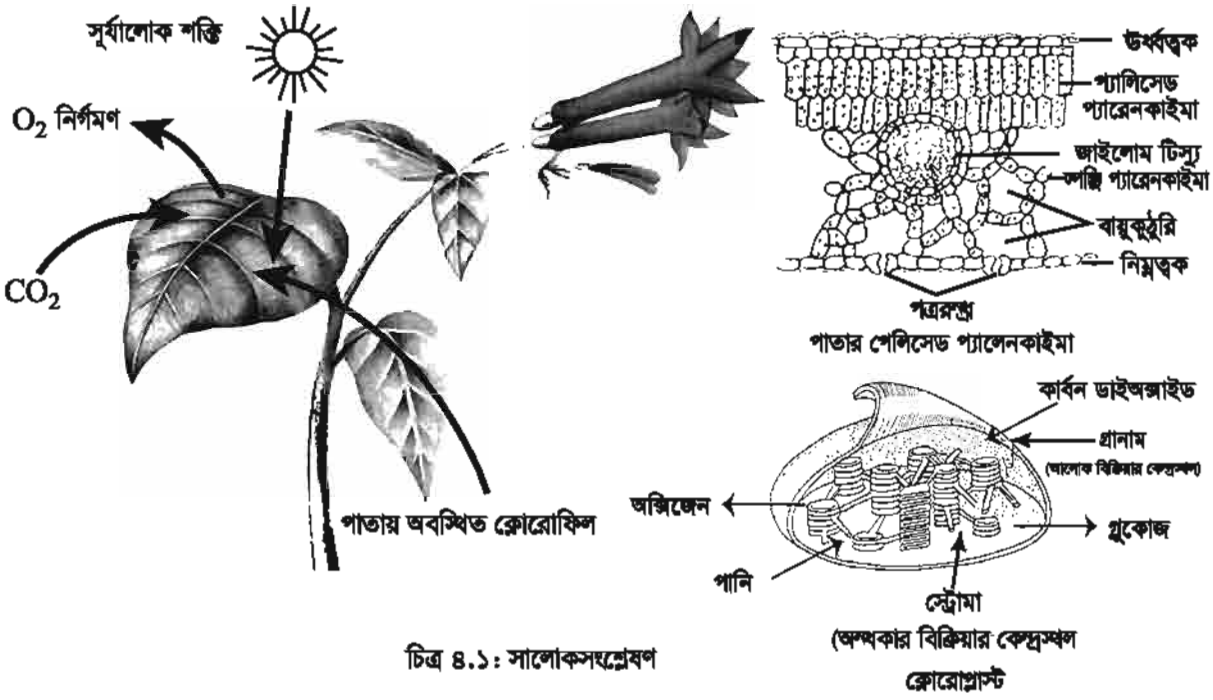

চিত্র ৪.১: সালোকসংশ্লেষণ

অক্সিজেন ও পানি সালোকসংশ্লেষণের উপজাত দ্রব্য (by-product)। কাজেই এটি একটি জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া (oxidation-reduction process)। এ প্রক্রিয়ায় H_2O জারিত হয় ও CO_2 বিজারিত হয়।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া : সালোকসংশ্লেষণ একটি জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ১৯০৫ সালে ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ ব্ল্যাকম্যান (Blakman) এ প্রক্রিয়াকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেন। পর্যায় দুটি হলো- (১) আলোকনির্ভর পর্যায় (Light dependent phase) এবং (২) আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় (Light independent phase)।

(১) আলোকনির্ভর পর্যায় (Light dependent phase) : আলোকনির্ভর পর্যায়ের জন্য আলো অপরিহার্য। এ পর্যায়ে সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় ATP (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট) এবং NADPH+H+ (বিজারিত নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট) উৎপন্ন হয়। এই রূপান্তরিত শক্তি ATP–এর মধ্যে সঞ্চিত হয়। ATP ও NADPH+H+ সৃষ্টিতে ক্লোরোফিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্লোরোফিল অণু আলোকরশ্মির ফোটন (photon) শোষণ করে এবং শোষণকৃত ফোটন হতে শক্তি সঞ্চয় করে ADP (অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট) এর সাথে অজৈব ফসফেট (Pi=inorganic phosphate) মিলিত হয়ে ATP তৈরি করে। ATP তৈরির এই প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন (photophosphorylation) বলে।

$$\text{ADP+Pi} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} \text{ATP}$$

সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের সহায়তায় পানি বিয়োজিত হয়ে (photolysis) অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়াকে পানির ফটোলাইসিস বলা হয়। ফটোফসফোরাইলেশন (photophosphorylation) প্রক্রিয়ায় ATP উৎপন্ন হয় এবং ইলেকট্রন NADP–কে বিজারিত করে $NADPH+H^+$ উৎপন্ন করে। ATP এবং $NADPH+H^+$ –কে আত্মীকরণ শক্তি (assimilatory power) বলা হয়।

আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় বা অন্ধকার পর্যায় (Light independent phase or dark phase) : আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে কোনো আলোর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পড়ে না, তবে আলোর উপস্থিতিতেও এই প্রক্রিয়া চলতে পারে। এ পর্যায়ে আলোক পর্যায়ে উৎপন্ন ATP ও $NADPH+H^+$–এর সহায়তায় CO_2 বিজারিত হয়ে কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন হয়। সবুজ উদ্ভিদে CO_2 বিজারণের তিনটি গতিপথ শনাক্ত করা হয়েছে যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো : যথা– (১) ক্যালভিন চক্র (২) হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র (৩) ক্রেসুলেসিয়ান এসিড বিপাক। এদের মধ্যে প্রথম দুটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে দেওয়া হলো।

(১) C_3 গতিপথ বা ক্যালভিন চক্র (C_3cycle বা Calvin cycle) : বায়ুমন্ডলের CO_2 পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে কোষে প্রবেশ করে। কোষে অবস্থিত ৫–কার্বনবিশিষ্ট রাইবুলোজ–১,৫–ডাইফসফেট এর সাথে CO_2 মিলিত হয়ে ৬–কার্বনবিশিষ্ট অস্থায়ী কিটো এসিড তৈরি হয়। এটি সাথে সাথে ভেঙ্গে তিন কার্বনবিশিষ্ট দুই অণু ৩–ফসফোগ্লিসারিক এসিড (3PGA) উৎপন্ন করে। কাজেই এই চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ তিন কার্বন বিশিষ্ট ৩–ফসফোগ্লিসারিক এসিড বলে একে C_3 গতিপথ বলা হয়। আলোক পর্যায়ে তৈরি ATP ও $NADPH+H^+$ ব্যবহার করে 3PGA, ৩–ফসফোগ্লিসারালডিহাইড ও ডাইহাইড্রোক্সি এসিটোন ফসফেট তৈরি হয়। ৩–ফসফোগ্লিসারালডিহাইড ও ডাইহাইড্রোক্সি এসিটোন ফসফেট থেকে ক্রমাগত বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে একদিকে শর্করা এবং অপরদিকে রাইবুলোজ–১,৫–ডাইফসফেট তৈরি হতে থাকে।

পুনঃসংশ্লেষিত রাইবুলোজ–১,৫–ডাইফসফেট পুনরায় এক অণু CO_2 গ্রহণ করে ক্যালভিন চক্রে প্রবেশ করে। অত্রএব, ৬–অণু CO_2 থেকে এক অণু গ্লুকোজ তৈরি হওয়ার সময় ক্যালভিন চক্র ছয়বার ঘুরবে।

CO_2 আত্মীকরণের এ গতিপথকে আবিষ্কারকদের নামানুসারে ক্যালভিন–বেনসন চক্র বা সংক্ষেপে ক্যালভিন চক্র বলা হয়। ক্যালভিন তাঁর এ আবিষ্কারের জন্য– ১৯৬১ সালে নোবেল পুরস্কার পান। অধিকাংশ উদ্ভিদে এই প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরি হয় এবং প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৩–কার্বনবিশিষ্ট বলে এই ধরনের উদ্ভিদকে বলে C_3 উদ্ভিদ।

(২) C_4 গতিপথ বা হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র (C_4 cycle or Hatch and Slack cycle) : অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী M.D. Hatch ও C.R Slack (১৯৬৬ সালে) CO_2 বিজারণের আর একটি গতিপথ আবিষ্কার করেন। এই গতিপথের প্রথম স্থায়ী পদার্থ হলো ৪–কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো এসিটিক এসিড।

C_4 উদ্ভিদে একই সাথে হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র এবং ক্যালভিন চক্র পরিচালিত তাতে দেখা যায়। C_3 উদ্ভিদের তুলনায় C_4 উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি এবং উৎপাদন ক্ষমতাও বেশি। সাধারণত ভুট্টা, আখ, অন্যান্য ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ, মুথা ঘাস, অ্যামারান্থাস (amaranthes) ইত্যাদি উদ্ভিদে C_4 পরিচালিত হয়।

সালোকসংশ্লেষণে ক্লোরোফিলের ভূমিকা : পাতার ক্লোরোফিলের পরিমাণের সাথে সালোকসংশ্লেষণের হারের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ একমাত্র ক্লোরোফিলই আলোকশক্তি গ্রহণ করতে সক্ষম। আমরা জানি, পুরাতন ক্লোরোপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে যায় এবং নতুন ক্লোরোপ্লাস্ট সংশ্লেষিত হয়। নতুন ক্লোরোপ্লাস্ট এবং ক্লোরোপ্লাস্টের উপাদান সৃষ্টির হারের উপর সালোকসংশ্লেষণের হার নির্ভরশীল। সালোকসংশ্লেষণ ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন উপাদান দ্রুত ও প্রচুর পরিমাণে পুনর্গঠিত হওয়া প্রয়োজন। তবে কোষে খুব বেশি পরিমাণ ক্লোরোফিল থাকলে এনজাইমের অভাব দেখা দেয় এবং সালোসংশ্লেষণ হ্রাস পায়।

সালোকসংশ্লেষণে আলোর ভূমিকা : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোর গুরুত্ব অপরিসীম। পানি ও CO_2 থেকে শর্করা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস আলো। সূর্যালোক ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। সূর্যালোকের প্রভাবেই

পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয়, CO_2 পাতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পাতায় যেটুকু আলো পড়ে তার অতি সামান্য অংশই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। আবার আলোকবর্ণালীর লাল, নীল, কমলা ও বেগুনি অংশটুকুতেই সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়। সবুজ ও হলুদ আলোতে সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয় না। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আলোর পরিমাণ বাড়লে সালোকসংশ্লেষণের হারও বেড়ে যায়। কিন্তু আলোর পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে গেলে পাতার অভ্যন্তরস্থ এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়, ক্লোরোফিল উৎপাদন কম হয়। ফলে সালোকসংশ্লেণের হারও কমে যায়। সাধারণত ৪০০ nm থেকে ৪৮০ nm এবং ৬৮০ nm (ন্যানোমিটার) তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোতে সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে ভালো হয়।

সালোকসংশ্লেষণের প্রভাবকসমূহ : আলো এবং ক্লোরোফিল ছাড়াও সালোকসংশ্লেষণ আরও কতকগুলো প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রভাবকগুলো কিছু বাহ্যিক ও কিছু অভ্যন্তরীণ। প্রভাবকের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, পরিমাণের কম–বেশি সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণও কম–বেশি করে থাকে। প্রভাবকগুলো নিম্নরূপ :

(ক) বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ

আলো : এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড : কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। কারণ এ প্রক্রিয়ায় যে খাদ্য প্রস্তুত হয় তা কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারণের ফলেই হয়ে থাকে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ০.০৩ ভাগ, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ শতকরা এক ভাগ পর্যন্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করতে পারে। তাই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ১% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণও বেড়ে যায়। অবশ্য কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ খুব বেশিমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে মেসোফিল টিস্যুর কোষের অম্লত্ব বৃদ্ধি পায় এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ যায়, ফলে সালোকসংশ্লেষণের হারও কমে যায়।

তাপমাত্রা: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা বিশেষ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সাধারণত অতি নিম্ন তাপমাত্রা (০° সে.–এর কাছাকাছি) এবং অতি উচ্চ তাপমাত্রায় (৪৫° সে.–এর উপরে) এ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য পরিমিত (optimum) তাপমাত্রা হলো ২২° সে. থেকে ৩৫° সে. পর্যন্ত। তাপমাত্রা ২২° সে.–এর কম বা ৩৫°এর বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

পানি : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরির উদ্দেশ্যে CO_2-কে বিজারণের জন্য প্রয়োজনীয় H^+ (হাইড্রোজেন আয়ন) পানি থেকেই আসে। পানির ঘাটতি হলে পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষেও স্ফীতি হারিয়ে রন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাতাস থেকে CO_2 অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয়। অতিরিক্ত পানি ঘাটতির ফলে এনজাইমের সক্রিয়তা বিনষ্ট হয়েও সালোকসংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

অক্সিজেন : বাতাসে অক্সিজেনের ঘনত্ব বেড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায় আর অক্সিজেনের ঘনত্ব কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার বেড়ে যায়। তবে অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে সালোকসংশ্লেষণ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

খনিজ পদার্থ : ক্লোরোফিলের প্রধান উপকরণ হচ্ছে নাইট্রোজেন ও ম্যাগনেসিয়াম। লোহার অনুপস্থিতিতে পাতা ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ করতে পারে না। ফলে পাতা হলুদ হয়ে যায়। মাটিতে এসব খনিজের অভাব হলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

রাসায়নিক পদার্থ : বাতাসে ক্লোরোফরম, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন বা কোনো বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ ব্যাঘাত ঘটে বা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ :

ক্লোরোফিল : এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

পাতার বয়স ও সংখ্যা : একেবারে কচি পাতা এবং একেবারে বয়স্ক পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ কম থাকে বলে সালোকসংশ্লেষণ কম হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যাও বেশি হয়। মধ্যবয়সী পাতায় সবচেয়ে বেশি সালোকসংশ্লেষণ ঘটে। পাতার সংখ্যা বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়।

শর্করার পরিমাণ : সালোকসংশ্লেষণ চলাকালীন সময়ে শর্করার পরিবহন কম হলে তা সেখানে জমে থাকে। বিকেলে পাতায় বেশি শর্করা জমা হয় বলে সালোকসংশ্লেষণের গতি মন্থর হয়।

পটাসিয়াম : পটাসিয়ামের অভাবে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণ বেশ কমে যেতে দেখা যায়। কারণ, সম্ভবত এ প্রক্রিয়ায় পটাসিয়াম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

এনজাইম : সালোক সংশ্লেষণের জন্য প্রচুর সংখ্যক এনজাইমের প্রয়োজন হয়।

জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব : সালোকসংশ্লেষণ বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া। এ বিক্রিয়ার মাধ্যমেই সূর্যালোক ও জীবনের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। নিচের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। বিশ্বজুড়ে এ বিক্রিয়ার ব্যাপকতা লক্ষ করে কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক এ প্রক্রিয়াকে জৈব রাসায়নিক কারখানা নামে অভিহিত করেছেন।

সমস্ত শক্তির উৎস হলো সূর্য। একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ করতে পারে। কোনো প্রাণীই তার নিজের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। আমরা খাদ্য হিসেবে ভাত, রুটি, ফলমূল, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি যাই গ্রহণ করি না কেন, তার সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি। কাজেই খাদ্যের জন্য সমগ্র প্রাণীকুল সবুজ উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, আর সবুজ উদ্ভিদ এ খাদ্য প্রস্তুত করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়। কাজেই বলা যায়, পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য প্রস্তুত হয় সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, বিশেষ করে O_2 ও CO_2-এর সঠিক অনুপাত রক্ষায় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ ২০.৯৫ ভাগ এবং CO_2গ্যাসের পরিমাণ ০.০৩৩ ভাগ।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও জীবনযাপনের জন্য বায়ুতে এ দুটি গ্যাসের পরিমাণ স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকতে হয়। এ পরিমাণের তারতম্য ঘটলে বায়ুমণ্ডল জীবজগতের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। আমরা জানি সব জীবেই (উদ্ভিদ ও প্রাণী) সব সময়ের জন্য শ্বসনক্রিয়া চলতে থাকে। শ্বসন প্রক্রিয়ায় জীব O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে। কেবল মাত্র শ্বসন প্রক্রিয়া চলতে থাকলে বায়ুমণ্ডলে O_2 গ্যাসের স্বল্পতা এবং CO_2 গ্যাসের আধিক্য দেখা দিত। কিন্তু সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় CO_2 গ্রহণ করে এবং O_2 বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে বলে এখনও বায়ুমণ্ডলে O_2 ও CO_2 গ্যাসের সঠিক অনুপাত রক্ষিত হচ্ছে। তবে বর্তমানে অধিক হারে বন–জঙ্গল ধ্বংস করার ফলে বায়ুমণ্ডলে এ দুটি গ্যাসের অনুপাত নষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই অধিক হারে গাছপালা লাগাতে হবে। মানব সভ্যতার অগ্রগতি অনেকাংশে সালোকসংশ্লেষণের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। অন্ন, বস্ত্র, শিল্পসামগ্রী (যেমন নাইলন, রেয়ন, কাগজ, সেলুলোজ, কাঠ, রাবার), ঔষধ (যেমন কুইনাইন, মরফিন), জ্বালানি কয়লা, পেট্রল, গ্যাস প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। তাই সালোকসংশ্লেষণ না ঘটলে ধ্বংস হবে মানব সভ্যতা, বিলুপ্ত হবে

জীবজগত। সুতরাং সালোকসংশ্লেষণ জীবজগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

কাজ : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল ও আলোর অপরিহার্যতার পরীক্ষা।

পরীক্ষার উপকরণ : একদিন অন্ধকার রাখা টবে লাগানো সবুজ পাতাবিশিষ্ট একটি গাছ, কালো কাগজ, ৯৫% ইথাইল অ্যালকোহল, ১% আয়োডিন দ্রবণ, ক্লিপ প্রভৃতি।

কার্যপদ্ধতি : অন্ধকারে রাখা গাছটির একটি পাতার একাংশের উভয় দিক কালো কাগজ দিয়ে আবৃত করে ক্লিপ দিয়ে আটকে দিতে হবে যেন ঐ অংশে সূর্যালোক প্রবেশ করতে না পারে। এরপর গাছসহ টবটিকে সূর্যালোক রেখে দিতে হবে। এক ঘণ্টা পর পাতাটিকে গাছ থেকে ছিঁড়ে এনে ক্লোরোফিলমুক্ত করার জন্য ৯৫% ইথাইল অ্যালকোহলে সিদ্ধ করতে হবে। এবার সিদ্ধ বর্ণহীন পাতাটিকে আয়োডিন দ্রবণে ডুবাতে হবে।

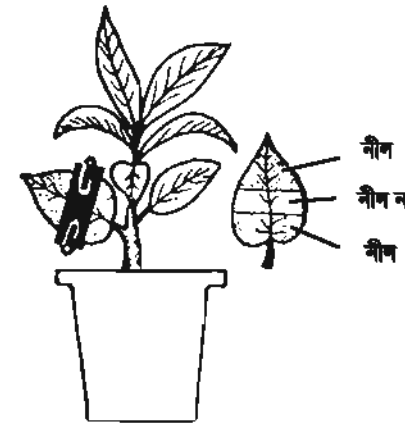

চিত্র ২.২: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল ও আলোর অপরিহার্যতার পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ : আয়োডিন দ্রবণ থেকে উঠিয়ে আনলে দেখা যাবে যে, পাতাটির কালো কাগজ দিয়ে আবৃত অংশ ছাড়া বাকি সবটুকু অংশই নীল (গাঢ় বেগুনি বা কালো) বর্ণ ধারণ করেছে।

সিদ্ধান্ত : শ্বেতসার ও আয়োডিন দ্রবণের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শ্বেতসার নীল (গাঢ় বেগুনি বা কালো) বর্ণ ধারণ করবে। কালো কাগজ দিয়ে আবৃত অংশে সূর্যালোক পৌঁছাতে পারে না, ফলে পাতার ঐ অংশে সালোকসংশ্লেষণ হয় না বলে শ্বেতসারও প্রস্তুত হয় না। শ্বেতসার প্রস্তুত হয় না বলে পাতার আবৃত অংশ আয়োডিন দ্রবণে বিক্রিয়া করে নীল বর্ণ ধারণ করে না। এতে প্রমাণিত হয় সালোকসংশ্লেষণ তথা শ্বেতসার প্রস্তুতের জন্য আলো অপরিহার্য।

সতর্কতা :

১) পরীক্ষার পূর্বে টবের গাছটি যেন বেশকিছু সময়ের জন্য অন্ধকারে রাখা হয়।
২) কালো কাগজ এমন হতে হবে যেন তার মধ্য দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ করতে না পারে।
৩) পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কমপক্ষে ১ ঘণ্টা পূর্বে টবটিকে সূর্যালোকে রাখতে হবে।

শ্বসন (Respiration)

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে তোমরা শ্বসন প্রক্রিয়া কাকে বলে এবং শ্বসনের ফলে যে দেহের বৃদ্ধি সাধন ও দেহ শক্তি পায় সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে জেনেছ। এ অধ্যায়ে শ্বসন সম্পর্কে আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

জীবের জীবন ধারণ অর্থাৎ চলন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি, জনন প্রভৃতি জীবজ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। এ শক্তির প্রধান উৎস হলো সূর্যালোক। সালোকসংশ্লেষণের সময় উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তুর মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে (Potential energy) সঞ্চয় করে রাখে। খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত ঐ প্রকার শক্তি জীব তার জীবন ধারণের জন্য সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। শ্বসনের সময় জীবদেহে বর্তমান এ স্থৈতিক শক্তি তাপরূপে উদ্ভূত হয়ে রাসায়নিক শক্তিরূপে (ATP) মুক্ত হয় এবং জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয়

শক্তি যোগায়। শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তু ব্যতীত প্রোটিন, ফ্যাট এবং বিভিন্ন জৈব এসিড শ্বসনিক বস্তুরূপে ব্যবহৃত হয়। জীব দেহস্থ এই জটিল যৌগগুলো শক্তি নির্গমনের পূর্বে ভেঙ্গে সরল যৌগে পরিণত হয় এবং পরে জারিত হয়ে রাসায়নিক শক্তিতে (ATP) রূপান্তরিত হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় জীবদেহের প্রতিটি কোষে দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টাই শ্বসন চলে। তবে উদ্ভিদের বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে (ফুল ও পাতার কুঁড়ি, অঙ্কুরিত বীজ, মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ) শ্বসন ক্রিয়ার হার অনেক বেশি। সজীব কোষের সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়াতে শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ জৈব–রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবদেহ যৌগিক খাদ্যদ্রব্য জারিত করে সরল দ্রব্যে পরিণত করে এবং শক্তি উৎপন্ন করে। শ্বসনের সামগ্রিক সমীকরণটি নিম্নরূপ:

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6}+6O_2 \xrightarrow{\text{বিভিন্ন এনজাইম}} 6CO_2+6H_2O+\text{শক্তি (688 K Cal/mol)}$$

শ্বসনের প্রকারভেদ : শ্বসনের সময় অক্সিজেনের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে শ্বসনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– (১) সবাত শ্বসন ও (২) অবাত শ্বসন

(১) সবাত শ্বসন (Aerobic respiration) : যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং শ্বসনিক বস্তু (শর্করা, প্রোটিন, লিপিড, বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড) সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2, H_2O ও বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তাকে সবাত শ্বসন বলে। সবাত শ্বসনই হলো উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক শ্বসন প্রক্রিয়া।
সবাত শ্বসনের রাসায়নিক সংকেত নিম্নরূপ

$$C_6H_{12}O_6+6O_2 \xrightleftharpoons{\text{বিভিন্ন এনজাইম}} 6CO_2+6H_2O \text{ শক্তি (688 K Cal/mol)}$$

সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে শক্তি সর্বমোট ছয় অণু CO_2 বার অণু পানি এবং ৩৮টি ATP উৎপন্ন করে।

(২) অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration) : যে শ্বসন প্রক্রিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে হয় তাকে অবাত শ্বসন বলে। অর্থাৎ যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় কোনো শ্বসনিক বস্তু অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়াই কোষ মধ্যস্থ এনজাইম দ্বারা আংশিকরূপে জারিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার জৈব যৌগ (ইথাইল অ্যালকোহল, ল্যাকটিক এসিড ইত্যাদি), CO_2 ও সামান্য পারিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তাকে অবাত শ্বসন বলে।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} \xrightarrow{\text{এনজাইম}} \underset{\text{ইথাইল অ্যালকোহল}}{2C_2H_5OH}+2CO_2+\text{শক্তি (56 K Cal/mol)}$$

কেবলমাত্র কতিপয় অণুজীবে যেমন ব্যাকটেরিয়া, ঈস্ট ইত্যাদিতে অবাত শ্বসন হয়ে থাকে।

সবাত শ্বসনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : সবাত শ্বসন প্রক্রিয়া সাধারণত চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। ধাপগুলো নিম্নরূপ

ধাপ– ১ : গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) : এই প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক এসিড ($C_3H_4O_3$) উৎপন্ন করে। এই ধাপে চার অণু ATP (দুই অণু খরচ হয়ে যায়) এবং দুই অণু $NADH+H^+$ উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ার জন্য কোনো অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে না, তাই গ্লাইকোলাইসিস সবাত ও অবাত উভয় প্রকার শ্বসনেরই প্রথম পর্যায়। গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে থাকে।

ধাপ–২ : অ্যাসিটাইল কো–এ সৃষ্টি : গ্লাইকোলাইসিস পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতি অণু পাইরুভিক এসিড পর্যায় ক্রমিক বিক্রিয়া শেষে ২ কার্বনবিশিষ্ট এক অণু অ্যাসিটাইল কোএনজাইম–এ (Acetyl Co-A), এক অণু CO_2 এবং এক অণু $NADH+H^+$ উৎপন্ন করে (দুই অণু পাইরুভিক এসিড থেকে দুই অণু অ্যাসিটাইল কোএনজাইম–এ, দুই অণু CO_2 এবং দুই অণু $NADH+H^+$ উৎপন্ন হয়)।

ধাপ– ৩ : ক্রেবস চক্র (Krebs cycle) : ক্রেবস চক্রে ২ কার্বনবিশিষ্ট অ্যাসিটাইল Co-A জারিত হয়ে দুই অণু CO_2 উৎপন্ন করে। ইংরেজ প্রাণরসায়নবিদ Sir Hans Krebs এ চক্রটি আবিষ্কার করেন বলে একে ক্রেবস চক্র বলা হয়। এ পর্যায়ে অ্যাসিটাইল Co-A মাইটোকন্ড্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং ক্রেবস চক্রে অংশগ্রহণ করে। এ চক্রের সকল বিক্রিয়াই মাইটোকন্ডিয়াতে সংঘটিত হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়াও এ চক্রে এক অণু অ্যাসিটাইল Co-A থেকে তিন $NADH+H^+$, এক অণু $FADH_2$ এবং এক অণু GTP (গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট) উৎপন্ন হয়। অতএব দুই অণু অ্যাসিটাইল Co-A থেকে চার অণু CO_2, ৬ অণু $NADH+H^+$, দুই অণু $FADH_2$ এবং দুই অণু GTP উৎপন্ন হয়।

ধাপ– ৪: ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র (Electron transport system) : এ প্রক্রিয়ায় উপরোক্ত তিনটি ধাপে উৎপন্ন $NADH+H^+$, $FADH_2$ জারিত হয়ে ATP, পানি, ইলেকট্রন ও প্রোটন উৎপন্ন হয়। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনসমূহ ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় শক্তি নির্গত হয়। সে শক্তি ATP তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র মাইটোকন্ডিয়ায় সংঘটিত হয়।

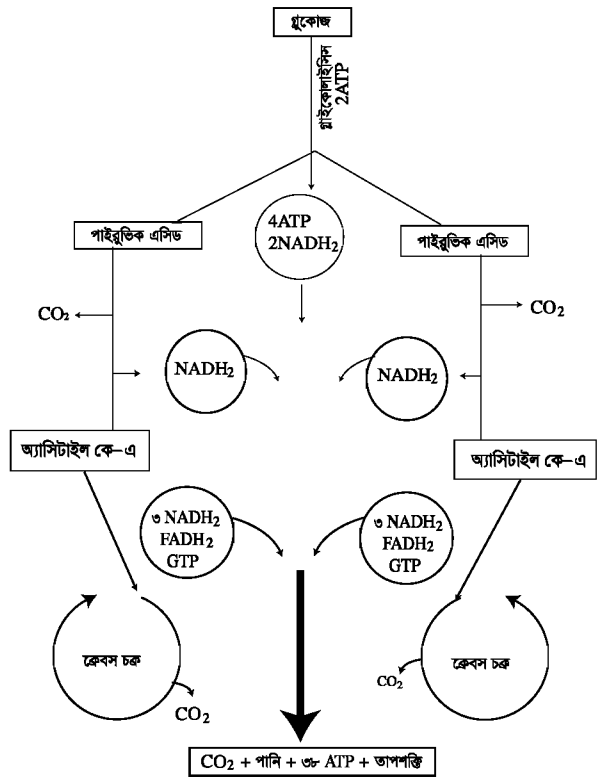

চিত্র ৪.৩: শ্বসন প্রক্রিয়া

সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে সর্বমোট ছয় অণু CO_2, ছয় অণু পানি এবং ৩৮টি ATP উৎপন্ন করে। নিচের চার্টে তা দেখানো হলো :

শ্বসনের পর্যায়	উৎপাদিত বস্তু	ব্যয়িত বস্তু	নীট উৎপাদন
গ্লাইকোলাইসিস	২ অণু পাইরুভিক এসিড ৪ অণু ATP	২ অণু $NADH+H^+$ ২ অণু ATP	৬ ATP 2 ATP
অ্যাসিটাইল কো-এ	২ অণু অ্যাসিটাইল কো-এ ২ অণু CO_2 ২ অণু $NADH+H^+$	২ অণু পাইরুভিক এসিড	২ অণু CO_2 ৬ ATP
ক্রেবস চক্র	৪ অণু ৬ অণু $NADH+H^+$ ২ অণু $FADH_2$ ২ অণু GTP	২ অণু অ্যাসিটাইল কো-এ	৪ অণু CO_2 ১৮ ATP ৪ ATP ২ ATP
			৩৮ATP (নীট মোট ATP)

১ অণু $NADH+H^+$ = ৩ অণু ATP

১ অণু $FADH_2$= ২ অণু ATP

১ অণু GTP = ১ অণু ATP

অবাত শ্বসনের ধাপসমূহ : দুইটি ধাপে অবাত শ্বসন হয়ে থাকে। ধাপ দুটি হলো :

ধাপ–১ : গ্লাইকোলাইসিস : এই ধাপে এক অণু গ্লুকোজ থেকে দুই অণু পাইরুভিক এসিড, চার অণু ATP (এর মধ্যে দুই অণু ব্যবহার হয়ে যায়) দুই অণু $NADH+H^+$ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ এটি সবাত শ্বসনের গ্লাইকোলাইসিসের অনুরূপ।

ধাপ–২ : পাইরুভিক এসিডের অসম্পূর্ণ জারণ : সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত এনজাইমের কার্যকারিতায় পাইরুভিক এসিড অসম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে CO_2 এবং ইথাইল অ্যালকোহল অথবা শুধু ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন করে।

শ্বসনের গুরুত্ব :

শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি দিয়ে জীবের সব ধরনের ক্রিয়া–বিক্রিয়া ও কাজকর্ম পরিচালিত হয়। শ্বসনে নির্গত CO_2 জীবের প্রধান খাদ্য শর্করা উৎপন্নের জন্য সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। এ প্রক্রিয়া উদ্ভিদে খনিজ লবণ পরিশোষণে সাহায্য করে, যা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়া চালু রাখে। কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয় শক্তি ও কিছু আনুষঙ্গিক পদার্থ শ্বসন প্রক্রিয়া থেকে আসে। তাই এ প্রক্রিয়া জীবের দৈহিক বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রক্রিয়া বিভিন্ন উপক্ষার ও জৈব এসিড সৃষ্টিতে সহায়তা করার মাধ্যমে জীবনের অন্যান্য জৈবিক কাজেও সহায়তা করে। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বাঁচতে পারে না। এদের শক্তি উৎপাদনের একমাত্র উপায় হলো অবাত শ্বসন। এ প্রক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি হয়, যা বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ল্যাকটিক এসিড ফার্মেন্টেসনের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ায় দই, পনির ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। রুটি তৈরিতে এ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। ঈস্টের অবাত শ্বসনের ফলে অ্যালকোহল ও CO_2 গ্যাস তৈরি হয়। CO_2 গ্যাস এর চাপে রুটি ফাঁপা হয়।

শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাবকসমূহ : শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাবকগুলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুঁরকম হতে পারে।

(ক) বাহ্যিক প্রভাবক : বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ হলো–

তাপমাত্রা : ২০° সে. এর নিচে এবং ৪৫° সে. এর উপরের তাপমাত্রায় শ্বসন হার কমে যায়। শ্বসনের জন্য উত্তম তাপমাত্রা ২০° সে. থেকে ৪৫° সে.।

অক্সিজেন : সবাত শ্বসনে পাইরুভিক এসিড জারিত হয়ে CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে। কাজেই অক্সিজেনের অভাবে সবাত শ্বসন কোনোক্রমেই চলতে পারে না।

পানি : পরিমিত পানি সরবরাহ শ্বসন ক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখে। কিন্তু অত্যন্ত কম কিংবা অতিরিক্ত পানির উপস্থিতিতে শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

আলো : শ্বসন কার্যে আলোর প্রয়োজন পড়ে না সত্যি কিন্তু দিনের বেলা আলোর উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকায় O_2 গ্রহণ ও CO_2 ত্যাগ করা সহজ হয় বলে শ্বসন হার একটু বেড়ে যায়।

কার্বন ডাইঅক্সাইড : বায়ুতে CO_2–এর ঘনত্ব বেড়ে গেলে শ্বসন হার কিঞ্চিত কমে যায়।

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবক : অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ হলো–

খাদ্যদ্রব্য: শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য (শ্বসনিক বস্তু) ভেঙ্গে শক্তি, পানি ও CO_2 নির্গত করে, তাই কোষে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও ধরন শ্বসন হার নিয়ন্ত্রণ করে।

উৎসেচক : শ্বসন প্রক্রিয়ায় বহুবিধ এনজাইম বা উৎসেচক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। কাজেই এনজাইমের ঘাটতি শ্বসন হার কমিয়ে দেয়।

কোষের বয়স : অল্পবয়স্ক কোষে বিশেষ করে ভাজক কোষে প্রোটোপ্লাজম বেশি থাকে বলে বয়স্ক কোষ অপেক্ষা শ্বসন হার বেশি হয়।

অজৈব লবণ : কোনো কোনো লবণ শ্বসন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করলেও কোষের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক কাজের জন্য এবং স্বাভাবিক শ্বসন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কোষের অভ্যন্তরে অজৈব লবণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

কোষমধ্যস্থ পানি : বিভিন্ন শ্বসনিক বস্তু দ্রবীভূত করতে এবং এনজাইমের কার্যকারিতা প্রকাশের জন্য পানির প্রয়োজন।

কাজ : শ্বসন প্রক্রিয়ায় তাপ নির্গমনের পরীক্ষা

উপকরণ : দুটি থার্মোফ্লাস্ক, দুটি থার্মোমিটার, ছিদ্রযুক্ত দুটি রাবার কর্ক। অঙ্কুরিত ছোলা এবং ১০% মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণ।

চিত্র : থার্মফ্লাস্কের চিত্র

পদ্ধতি : দুটি থার্মোফ্লাস্কের একটিতে 'ক' ও অন্যটিতে 'খ' লেবেল লাগাতে হবে। 'ক' চিহ্নিত থার্মোফ্লাস্কে সামান্য পানি সহ কিছু অঙ্কুরিত ছোলাবীজ নিতে হবে। ছিদ্রমুক্ত রাবার কর্কের মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার প্রবেশ করানোর পর ফ্লাস্কের মুখটি ভালো করে বন্ধ করে দিতে হবে। অবশিষ্ট অঙ্কুরিত ছোলাগুলোকে ১০% ফুটন্ত মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে 'খ' চিহ্নিত ফ্লাস্কে ছিদ্রযুক্ত কর্কের মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার ঢুকিয়ে ফ্লাস্কের মুখ ভালোভাবে আটকে দিতে হবে। এবার 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত থার্মোমিটার দুটির প্রাথমিক তাপমাত্রা লিখে রেখে ফ্লাস্ক দুটিকে রেখে দিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ : কয়েক ঘণ্টা পর দেখা যাবে 'ক' থার্মোমিটারের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে কিন্তু 'খ' থার্মোমিটারের তাপমাত্রা অপরিবাহিত থাকবে।

সিদ্ধান্ত: 'ক' থার্মোফ্লাস্কের অঙ্কুরিত ছোলাগুলো সজীব থাকায় শ্বসন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং তাপ নির্গমনের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে 'খ' ফ্লাস্কের ছোলাগুলো মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণে ডুবিয়ে নেওয়াতে বীজগুলো মরে যায় ও নির্বীজ (Sterilized) হয়। ফলে শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে।

সতর্কতা :

১। লক্ষ রাখতে হবে যেন বীজগুলো সতেজ ও অঙ্কুরিত হয়।

২। থার্মোমিটারের পারদপূর্ণ অংশটি যেন বীজের মাঝখানে থাকে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। সালোকসংশ্লেষণ কাকে বলে? বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও।

২। সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল কী কী ?

৩। শ্বসন কাকে বলে ? বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও ?

৪। সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মধ্যে সম্পর্ক কী ?

৫। অবাত ও সবাত শ্বসনের পার্থক্য লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জীবের সালোকসংশ্লেষণের উপর নির্ভরশীলতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

২। শ্বসনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসাবে নির্গত হয় কোনটি?

ক. পানি　　খ. শর্করা

গ. অক্সিজেন　　ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড

২. শ্বসনের গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় কত অণু ATP তৈরি হয়?

ক. ৪ খ. ৬

গ. ৮ ঘ. ১৮

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

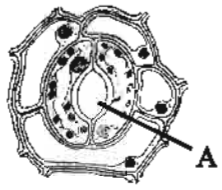

চিত্র–X

চিত্র– Y

৩. A ও B উভয়েরই কাজ হচ্ছে–

i. O_2 গ্রহন

ii. H_2O নির্গমণ

iii. CO_2 ত্যাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. চিত্রে X এ সংঘটিত প্রক্রিয়াটি–

i. পরিবেশকে শীতল রাখে

ii. সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে

iii. শ্বসনে ব্যাঘাত ঘটায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

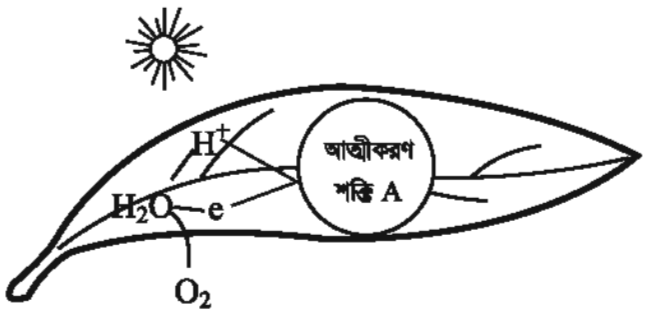

ক. পাইরুভিক এসিডের সংকেত কী?

খ. অবাত শ্বসন বলতে কী বুঝায়?

গ. A উপাদানটি কীভাবে তৈরি হচ্ছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. A উপাদানটি উৎপন্নে ব্যাঘাত ঘটলে উদ্ভিদের উপর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

২. দশম শ্রেণির ছাত্রী বিপাশা গাজর খেতে পছন্দ করে। গাজরে গ্লুকোজ থাকায় এটা তার কাজ করার শক্তি যোগায়। তার ছোট বোন তাকে প্রশ্ন করে গাছ বড় হবার জন্য শক্তি কীভাবে পায়? সে তার বোনকে জানায়, গাছ ও শ্বসন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ থেকে শক্তি পায়।

ক. ফটোলাইসিস কী?

খ. C_4 উদ্ভিদ বলতে কী বুঝায়?

গ. বিপাশার গৃহীত খাদ্য উপাদানের ২ অণু থেকে ক্রেবস চক্রে কী পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় ছকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত হলে উদ্ভিদের মধ্যে কী প্রভাব ফেলবে তা বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

খাদ্য, পুষ্টি এবং পরিপাক

জীব মাত্রই খাদ্যগ্রহণ করে অর্থাৎ জীবের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া ভিন্ন। উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন হয়। মানবদেহের জন্য খাদ্য, পুষ্টি ও পরিপাক প্রক্রিয়া এবং উদ্ভিদের পুষ্টি এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

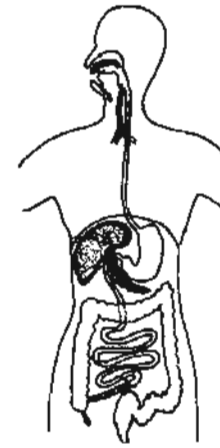

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- উদ্ভিদের পুষ্টির অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বর্ণনা করতে পারব।
- উদ্ভিদে পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রাণীর খাদ্যের প্রধান উপাদান ও উৎস বর্ণনা করতে পারব।
- আদর্শ খাদ্য পিরামিড ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য গ্রহণের নিয়মনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুষ্টির অভাবজনিত রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- কিলো ক্যালরি ও কিলো জুল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুষ্টি উপাদানে শক্তির পরিমাণ এবং ক্যালরি ও জুলে এদের রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) ও বডি মাস রেশিউ (বিএমআর) এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিএমআই ও বিএম আর এর হিসাব করতে পারব।
- বিএমআর এবং ব্যয়িত শক্তির সাথে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।
- বয়স ও লিঙ্গভেদে বিএমআই হিসাব করতে পারব।
- সুস্থ জীবনযাপনে শরীরচর্চা ও বিশ্রামের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্যে অতিমাত্রায় রাসায়নিক পদার্থ এবং রঞ্জকের ব্যবহারের শারীরিক বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রধান অংশ ও সহায়তাকারী অঙ্গের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- যকৃতের (Liver) কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- অগ্ন্যাশয়ের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- খাদ্য পরিপাকে উৎসেচকের (Enzyme) ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব।
- অন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যাজনিত রোগ এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।
- সাত দিনের গৃহীত খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করে এটিকে সুষম খাদ্যের সাথে তুলনা করতে পারব।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার অংকন করতে পারব।
- পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রধান অংশের চিহ্নিত চিত্র অংকন করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের রোগের বিষয়ে নিজে সচেতন হব এবং পরিবারের সদস্যদের সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করব।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি

উদ্ভিদ খনিজ পুষ্টি (Plant mineral nutrition) : উদ্ভিদ মাটি ও পরিবেশ থেকে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি, শারীরবৃত্তীয় কাজ এবং প্রজননের জন্য যেসব পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে তাই উদ্ভিদ পুষ্টি। এসকল পুষ্টি উপাদানের অধিকাংশই উদ্ভিদ মাটি থেকে সংগ্রহ করে বলে এদেরকে খনিজ পুষ্টি বলা হয়। উদ্ভিদে প্রায় ৬০টি অজৈব উপাদান শনাক্ত করা হয়েছে। অবশ্য এ ৬০টি উপাদানের মধ্যে মাত্র ১৬টি উপাদান উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এ ১৬টি পুষ্টি উপাদানকে সমষ্টিগতভাবে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান (essential elements) বলা হয়। কারণ এই উপাদানগুলো সব ধরনের উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, শারীরবৃত্তীয় কাজ ও প্রজননের জন্য প্রয়োজন। এদের যে কোনো একটির অভাব হলে উদ্ভিদে এর অভাবজনিত লক্ষণ (deficiency symptoms) প্রকাশ পায় এবং পুষ্টি অভাবজনিত রোগের সৃষ্টি হয়। একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের কাজ অপরটি দিয়ে সম্পন্ন হয় না।

অত্যাবশ্যকীয় ১৬টি উপাদানের মধ্যে উদ্ভিদ কোনো কোনো উপাদান বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে, আবার কোনো কোনো উপাদান সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এদেরকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা : ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রোউপাদান (macro-nutrient বা macro-element) এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রোউপাদান (micro-nutrient বা micro-element)।

(ক) **ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রোউপাদান** : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান বেশি পরিমাণে দরকার হয় সেগুলোকে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রোউপাদান বলা হয়। ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রোউপাদান ০৯টি, যথা : নাইট্রোজেন (N), পটাসিয়াম (K), ফসফরাস (P), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O) এবং সালফার (S)।

(খ) **মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রোউপাদান** : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদেরকে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টয়ার বলে। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ০৭টি, যথা– দস্তা বা জিংক (Zn), ম্যাংগানিজ (Mn), লৌহ বা আয়রন (Fe), মোলিবডেনাম (Mo), বোরন (B), তামা বা কপার (Cu) এবং ক্লোরিন (Cl)।

পুষ্টি উপাদানের উৎস : উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বন ও অক্সিজেন বায়ুমন্ডল থেকে গ্রহণ করে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পানি থেকে গ্রহণ করে। অন্যসব উপাদান মাটি থেকে মূলের সাহায্যে শোষণ করে। এ উপাদানগুলো মাটিতে বিভিন্ন লবণ হিসেবে থাকে। কিন্তু উদ্ভিদ এগুলোকে লবণ হিসেবে সরাসরি শোষণ করতে পারে না। এরা বিভিন্ন আয়ন হিসেবে শোষিত হয়। যেমন : Ca^{++}, Mg^{++}, NH_4^+, NO_3^-, K^+ ইত্যাদি।

উদ্ভিদের পুষ্টিতে বিভিন্ন খনিজ উপাদানের ভূমিকা : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন খনিজ পুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাইট্রোজেনের অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টি ব্যাহত হয়। আর ক্লোরোফিল সৃষ্টি ব্যাহত হলে খাদ্য প্রস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হয়। খাদ্যপ্রস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হলে শ্বসন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে এবং শক্তি নির্গমন হ্রাস পায়। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল অণুর একটি উপাদান। কাজেই এর অভাব হলে ক্লোরোফিল অণু সৃষ্টি এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত ব্যাহত হবে। উদ্ভিদের বহু জৈবিক ক্রিয়া–বিক্রিয়ায় পটাসিয়াম সহায়ক হিসেবে কাজ করে। পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পটাসিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। কোষবিভাজনের মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে পটাসিয়াম। ইহা মূল, ফুল ও ফল উৎপাদন ও বর্ধনেও সাহায্য করে। মূল বর্ধনের জন্য ফসফরাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ফসফরাস জীবকোষের DNA, RNA, ATP প্রভৃতির গাঠনিক উপাদান। কাজেই এটি ছাড়া উদ্ভিদের পুষ্টি একেবারেই

সম্ভব নয়। পুষ্টিতে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যই আমরা ভালো ফলন পেতে জমিতে নাইট্রোজেন (ইউরিয়া), পটাসিয়াম (মিউরেট অফ পটাস), ফসফরাস (ট্রিপল সুপার ফসফেট) প্রভৃতি সার ব্যবহার করে থাকি।

পুষ্টি উপাদানের গুরুত্ব : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বিভিন্ন খনিজ পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নাইট্রোজেন নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন ও ক্লোরোফিলের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। উদ্ভিদের সাধারণ দৈহিক বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কোষ কলায় পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ফসফরাস নিউক্লিক এসিড, বিভিন্ন ফসফোলিপিড, NADP, ATP প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্যের সাংগঠনিক উপাদান। উদ্ভিদের মূল বর্ধনের জন্য ফসফরাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। পটাসিয়াম উদ্ভিদে পানি পরিশোষণে সাহায্য করে। পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পটাসিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। ইহা মূল, ফুল ও ফল উৎপাদন ও বর্ধনেও সাহায্য করে থাকে। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল অণুর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং শ্বসন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।

আয়রন সাইটোক্রোমের সাংগঠনিক উপাদান, কাজেই বায়বীয় শ্বসন এর উপর নির্ভরশীল। ক্লোরোফিল সৃষ্টিতেও আয়রনের ভূমিকা অপরিসীম। ক্লোরোপ্লাস্ট গঠন ও সংরক্ষণের জন্য ম্যাংগানিজ প্রয়োজন। টমেটো, সূর্যমুখী উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য তামা প্রয়োজন, শ্বসন প্রক্রিয়ার উপর তামার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদের সক্রিয়ভাবে বর্ধনশীল অঞ্চলের জন্য বোরন প্রয়োজন, চিনি পরিবহনে বোরন পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। অ্যামাইনো এসিড সংশ্লেষণের জন্য দস্তা প্রয়োজন। উদ্ভিদের স্বাভাবিক বিপাকীয় কার্যে এর কিছু প্রয়োজন হয়। অণুজীব দ্বারা বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য মোলিবডেনাম আবশ্যক। সুগারবীট এর মূল ও কান্ডের বৃদ্ধির জন্য ক্লোরিন প্রয়োজন।

পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ : উদ্ভিদের কোনো পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ তা প্রকাশ করে। এ লক্ষণগুলোকে বলা হয় অভাবজনিত লক্ষণ (deficiency symptoms)। এ লক্ষণ দেখে আমরা বুঝতে পারি কোন উদ্ভিদ বা ফসলে কোন পুষ্টি উপাদানের অভাব রয়েছে। নিচে কিছু উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ করা হলো :

উপাদান	অভাবজনিত লক্ষণ
নাইট্রোজেন (N)	নাইট্রোজেনের অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে। ফলে পাতাগুলো হলুদ হয়ে যায়। পাতা হলুদ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে 'ক্লোরোসিস' (chlorosis)। কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন হ্রাস পায়, তাই উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়।
ফসফরাস (P)	ফসফরাসের অভাব হলে পাতা বেগুনি রং ধারণ করে। পাতায় মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয়। পাতা, ফুল ও ফল ঝরে যেতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় ও উদ্ভিদ খর্বাকার হয়।
পটাসিয়াম (K)	পটাসিয়ামের অভাবে পাতার শীর্ষ ও কিনারা হলুদ হয় এবং মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি কম হয় এবং শীর্ষ ও পার্শ্ব মুকুল মরে যায়।
ক্যালসিয়াম (Ca)	ক্যালসিয়ামের অভাবে কঁচি পাতায় ক্লোরোসিস হয়, উদ্ভিদের বর্ধনশীল শীর্ষ অঞ্চল মরে যায়। ফুল ফোটার সময় উদ্ভিদের কান্ড শুকিয়ে যায় এবং উদ্ভিদ হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে।
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে ক্লোরোফিল সংশ্লেষিত হয় না বলে সবুজ রং হালকা হয়ে যায় এবং সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়। পাতার সরু শিরাসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে অধিক হারে ক্লোরোসিস হয়।

উপাদান	অভাবজনিত লক্ষণ
লৌহ (Fe)	লৌহের অভাবে প্রথমে কচি পাতার রং হালকা হয়ে যায়, তবে পাতার সরু শিরার মধ্যবর্তী স্থানেই প্রথম হালকা হয় এবং ক্লোরোসিস হয়। কখনও কখনও সম্পূর্ণ পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। কান্ড দুর্বল ও ছোট হয়।
সালফার (S)	সালফারের অভাবে পাতা হালকা সবুজ হয় এবং পাতায় লাল ও বেগুণি দাগ দেখা যায়। কচি পাতায় বেশি এবং বয়োবৃদ্ধ পাতায় কম ক্লোরোসিস হয়। কান্ডের শীর্ষ মরে যায় এবং ডাইব্যাক (dieback) রোগের সৃষ্টি হয়। কান্ডের মধ্যপর্ব ছোট হয়, ফলে উদ্ভিদ খর্বাকৃতির হয়।
বোরন (B)	বোরনের অভাবে উদ্ভিদের বর্ধনশীল অগ্রভাগ মরে যায়। কঁচি পাতার বৃদ্ধি কমে যায় এবং পাতা বিকৃত হয়, কান্ড খসখসে হয়ে ফেটে যায়। ফুলের কুঁড়ির জন্ম ব্যাহত হয়।

কাজ : শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের কোন কোন খনিজ মৌলের অভাবে গাছে কী কী অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন।

প্রাণীর খাদ্য ও পুষ্টি : তোমরা ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণিতে জেনেছ, জীবন ধারণের জন্য খাদ্য যেমন অপরিহার্য, তেমনি সু-স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য প্রয়োজন। এই খাদ্যই জীবকোষে দগ্ধীভূত হয়ে দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। দহন বলতে জীবদেহের ভিতরে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে বুঝায়। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাসায়নিক প্রভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। চলাফেরা, খেলাধুলা ইত্যাদি যাবতীয় কাজে শক্তির প্রয়োজন। আমরা এই শক্তি পাই খাদ্য থেকে। যেসব বস্তু খাওয়ার পর দেহে শোষিত হয়ে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে তাকে খাদ্য বলে। যেমন, দেহের পুষ্টি সাধন, দেহের ক্ষয়পূরণ, দেহে রোগ প্রতিরোধক শক্তি উৎপাদন এবং কর্মশক্তি ও তাপ উৎপাদন।

খাদ্যের প্রধান উপাদান ও উৎস : সম্মিলিতভাবে উল্লেখিত কার্যসমূহ আমাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন। এ কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদান প্রয়োজন। খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এই রাসায়নিক বস্তুগুলোকে খাদ্য উপাদান বলে। এই উপাদানগুলোর মধ্যে পুষ্টি নিহিত, তাই খাদ্য উপাদানকে পুষ্টি উপাদানও বলা হয়। অধিকাংশ খাদ্যে একাধিক খাদ্য উপাদান থাকে। কোনো খাদ্যে যে উপাদানটি বেশি পরিমাণে থাকে তাকে সেই উপাদানের খাদ্য হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১. **আমিষ :** দেহের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করে।
২. **শর্করা :** দেহে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।
৩. **স্নেহ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য :** দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে।

এছাড়া আরও তিন প্রকার উপাদানও দেহের জন্য প্রয়োজন। যেমন–

১. **খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন :** রোগ প্রতিরোধক শক্তি বাড়ায় ও বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্দীপনা যোগায়।
২. **খনিজ লবণ :** বিভিন্ন জৈবিক কাজে অংশ নেয়।
৩. **পানি :** দেহে পানি ও তাপের সমতা রক্ষা করে, এছাড়া কোষের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ, কোষ অঙ্গাণুসমূহকে ধারণ করে।

আমিষ বা প্রোটিন

আমিষ জাতীয় খাদ্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। আমিষে শতকরা ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। সালফার, ফসফরাস এবং আয়রন আমিষে সামান্য পরিমাণে থাকে। নাইট্রোজেন এবং শেষোক্ত উপাদানগুলোর উপস্থিতির কারণে আমিষের গুরুত্ব শর্করা ও স্নেহ পদার্থ থেকে আলাদা। একমাত্র আমিষ উপাদানেই নাইট্রোজেন বর্তমান। শুধু আমিষ জাতীয় খাদ্যই দেহে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে বলে পুষ্টিবিজ্ঞানে আমিষ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

আমিষ খাদ্যের উৎস :

আমরা আগেই জেনেছি মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, শিমের বীচি, শুঁটকি মাছ, চিনাবাদাম ইত্যাদি থেকে আমরা আমিষ পাই।

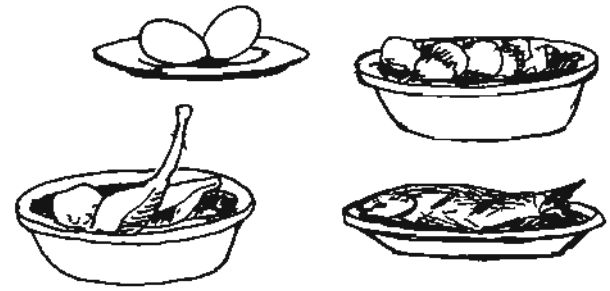

চিত্র ৫.১: আমিষ জাতীয় খাদ্য

উৎস অনুযায়ী আমিষ দুই প্রকার :

১. প্রাণিজ আমিষ ও

২. উদ্ভিজ্জ আমিষ

প্রাণিজ আমিষ : মাছ, মাংস, ডিম, পনির, ছানা, কলিজা বা যকৃত ইত্যাদি প্রাণিজ আমিষ। এসব খাদ্যে দেহের প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায় বলে এগুলো উচ্চমানের আমিষ। এসব খাদ্যের জৈবমূল্য বেশি। আমাদের খাদ্য তালিকায় কমপক্ষে শতকরা ২০ ভাগ প্রাণিজ আমিষ থাকা দরকার।

উদ্ভিজ্জ আমিষ : ডাল, চিনাবাদাম, চাল, আটা, শিমের বীচি ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আমিষ। এগুলো প্রাণিজ আমিষের তুলনায় কম পুষ্টিকর, কারণ উদ্ভিজ্জ আমিষে প্রয়োজনীয় সব কয়টা অ্যামাইনো এসিড থাকে না। বীজে আমিষের পরিমাণ উদ্ভিদের অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশি থাকে। উদ্ভিজ্জ আমিষের জৈবমূল্য কম বিধায় তা নিম্নমানের আমিষ।

গবেষণায় দেখা গেছে, দুই বা ততোধিক উদ্ভিজ্জ আমিষ একত্রে রান্না করে খাদ্যমান বাড়ানোর ফলে আট রকম আবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়। বিভিন্ন আমিষের সংমিশ্রণে তৈরি এরূপ উপাদান মিশ্র আমিষ নামে পরিচিত। মিশ্র আমিষকে সম্পূরক আমিষও বলা হয়। কীভাবে বিভিন্ন খাদ্যের সংমিশ্রণে সম্পূরক আমিষ তৈরি করা যায় তা নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. চালের সাথে দুধ দিয়ে পায়েশ, ক্ষীর ও ফিরনি রান্না করা যায়।

২. ডাল ও চাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করা যায়।

৩. ডাল, গম, মাংস মিশিয়ে হালিম রান্না করা যায়।

৪. ভাতের সাথে মাছ ও ডাল পরিবেশন করা যায়।

৫. দুধ রুটি খাওয়া যায়।

৬. রুটি ডাল খাওয়া এবং

৭. নানারকম ডাল সমপরিমাণ মিশিয়ে রান্না করে সম্পূরক আমিষ তৈরি করা যায়।

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate)

শর্করা জাতীয় খাদ্য দেহের কাজ করার শক্তি জোগায়। শর্করার মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। উদ্ভিদের মূল, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজে শর্করা বিভিন্নরূপে জমা থাকে। ফলের রসে গ্লুকোজ, দুধে ল্যাকটোজ, গম, আলু, চাল ইত্যাদিতে স্টার্চ বা শ্বেতসার ইত্যাদি শর্করা খাদ্যের বিভিন্ন রূপ। গঠন পদ্ধতি অনুসারে শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। নিচের সারণিতে এই তিন ধরনের শর্করার গঠন ও উৎস দেখানো হলো।

সারণি ১০.২ : শর্করার শ্রেণিবিভাগ

শর্করা শ্রেণি	গঠন	উদাহরণ	উৎস
এক শর্করা	এক অণুবিশিষ্ট শর্করা	গ্লুকোজ	মধু, ফলের রস
দ্বি-শর্করা	দুই অণুবিশিষ্ট শর্করা	সুক্রোজ, ল্যাকটোজ	চিনি ও দুধ
বহু শর্করা	বহু অণুবিশিষ্ট শর্করা	শ্বেতসার গ্লাইকোজেন	চাল, আটা, সবুজ পাতা, আলু, শাক-সবজি

প্রধানত : চাল, গম, আলু থেকে আমরা শ্বেতসার পাই। কাঁচা খাদ্যের শ্বেতসার সহজে হজম হয় না। এজন্য আমরা চাল, আটা, আলু ইত্যাদি রান্না করে খাই। খাওয়ার পর শর্করা পরিপাক হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। দ্বি–শর্করা ও বহু শর্করা পরিপাকের মাধ্যমে সরল শর্করায় পরিণত হয়ে দেহে শোষণযোগ্য হয়। মানব পরিপুষ্টির জন্য সরল শর্করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানবদেহ শুধু সরল শর্করা শোষণ করতে পারে।

চিত্র ৫.২: শর্করা জাতীয় খাদ্য

স্নেহ জাতীয় খাদ্য (Fats)

চর্বি একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন দ্বারা গঠিত উপাদানটির মুখ্য কাজ হলো তাপ উৎপাদন করা। এই উপাদানটি পাকস্থলিতে অনেকক্ষণ থাকে, তাই ক্ষুধা পায় না। দেহের ত্বকের নিচে চর্বি জমা থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন অঙ্গ যেমন– যকৃত, মস্তিষ্ক, মাংস পেশিতেও চর্বি জমা থাকে। দেহের এ সঞ্চিত চর্বি উপবাসের সময় কাজে লাগে। শর্করা ও আমিষের তুলনায় চর্বিতে প্রায় দ্বিগুণ ক্যালরি থাকে। ক্যালরি হলো প্রাণীদেহে শক্তি মাপার একটি একক। খাবার তেল বা ঘি দিয়ে রান্না করা খাবার বেশ সুস্বাদু হয়, সঙ্গে এর পুষ্টিমানও বেড়ে যায়। যেমন– সেদ্ধ আলুর চেয়ে ভাজা আলু, রুটির চেয়ে লুচি বা পরোটা শুধু মুখরোচকই নয়, এতে ক্যালরিও বেশি পাওয়া যায়। কোনো কোনো চর্বিতে ভিটামিন 'এ' আছে, আবার কোনোটিতে আছে ভিটামিন 'ই'।

উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থ দুই ধরনের : ১. উদ্ভিজ স্নেহ পদার্থ এবং ২. প্রাণীজ স্নেহ পদার্থ।

চিত্র ৫.৩: স্নেহ জাতীয় খাদ্য

১. **উদ্ভিজ স্নেহ পদার্থ** : সয়াবিন, সরিষা, তিল, বাদাম, সূর্যমুখী এবং ভুট্টার তেল ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ভোজ্যতেলের মধ্যে সয়াবিন তেল উৎকৃষ্টতম।

২. **প্রাণিজ স্নেহ পদার্থ** : চর্বি, ঘি, ডালডা ইত্যাদি প্রাণিজ স্নেহ পদার্থ। ডিমের কুসুমে স্নেহ পদার্থ আছে, কিন্তু সাদা অংশে স্নেহ পদার্থ থাকে না। স্নেহ পদার্থ পানিতে অদ্রবণীয়। পানির চেয়ে হালকা বলে পানির উপর ভাসে। একজন সুস্থ সবল পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দিনে ৫০–৬০ গ্রাম চর্বির প্রয়োজন হয়।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন (Vitamins)

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভিটামিনের পরিমাণ খুব সামান্য হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। দেহের বৃদ্ধির জন্য ও সুস্থ থাকার জন্য ভিটামিন অত্যাবশ্যক। সুষম খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উপাদান থাকে বলে সুষম খাদ্য থেকে প্রচুর ভিটামিন পাওয়া যায়। তবে নিয়মিত ভিটামিনবিহীন খাবার খেলে কিছুদিনের মধ্যে দেহে ভিটামিনের অভাবজনিত সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তী কালে তা মারাত্মক আকারে স্থায়ীভাবে দেহের ক্ষতি সাধন করে, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

ভিটামিনকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা– ১. চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং ২. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। ভিটামিন 'এ', 'ডি', 'ই' এবং 'কে' চর্বিতে এবং ভটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন 'সি' পানিতে দ্রবণীয়।

দুধ, মাখন, চর্বি, ডিম, গাজর, আম, কাঁঠাল, রঙিন শাকসবজি, মলা মাছ ইত্যদিতে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। ঈস্ট, ঢেঁকিছাঁটা চাল, যাঁতায় ভাঙ্গা আটা বা লাল আটা, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগডাল, মটর, ফুলকপি, চিনাবাদাম, শিমের বীচি, কলিজা বা যকৃত, হৃৎপিন্ড, দুধ, ডিম, মাংস, সবুজ শাকসবজি ইত্যাদিতে ভিটামিন 'বি' থাকে। পেয়ারা, বাতাবী লেবু, কামরাঙা, কমলা, আমড়া, বাঁধাকপি, টমেটো, আনারস, কাঁচামরিচ, তাজা শাকসবজি ইত্যাদি থেকে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। দুধ, ডিম, কলিজা বা যকৃত, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছের তেল, ভোজ্যতেল ইত্যাদিতে ভিটামিন 'ডি' থাকে। উপরে উল্লিখিত সব খাবার থেকে ভিটামিন 'ই' ও 'কে' পাওয়া যায়।

খনিজ লবণ (Mineral salts)

দেহ কোষ ও দেহের তরল অংশের দেহতরলের জন্য খনিজ লবণ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। মানবদেহে ক্যালসিয়াম, লৌহ, সালফার, দস্তা, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি খনিজ লবণ থাকে। এ উপাদানগুলো কখনও মৌলিক উপাদানরূপে মানবদেহে অবস্থান করে না। এগুলো খাদ্য ও মানবদেহে বিভিন্ন পরিমাণে অন্য পদার্থের সাথে মিলিত হয়ে নানা জৈব ও অজৈব যৌগের লবণ তৈরি করে। খনিজ লবণ দেহ গঠন ও দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। হাড়, দাঁত, পেশি, এনজাইম ও হরমোন গঠনের জন্য খনিজ লবণ একটি অপরিহার্য উপাদান। স্নায়ুর উদ্দীপনা, পেশি সংকোচন, দেহকোষে পানির সাম্যতা বজায় রাখা, অম্ল ও ক্ষারের সমতাবিধান ইত্যাদি কাজে খনিজ লবণের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

দুধ, দই, ছানা, পনির, ছোট মাছ (মলা–ঢেলা), নানা রকম ডাল, সবুজ শাকসবজি, ঢেঁড়স, লাল শাক, কঁচু শাক ইত্যাদি ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস। কলিজা, সবুজ শাকসবজি, মাংস, ডিমের কুসুম, কচু শাক ইত্যাদিতে লৌহ থাকে। দুধ, মাছ, মাংস, বাদাম, ডাল থেকে ফসফরাস পাওয়া যায়। খাবার লবণ, চিপস, নোনতা খাবার, পনির, বাদাম, আচার ইত্যাদিতে সোডিয়াম থাকে। মাছ, মাংস, বাদাম, ডাল, কলা, আলু, গাজর, আপেল ইত্যাদিতে পটাসিয়াম থাকে। ক্লোরিনের উৎস হলো মাছ, মাংস ও খাবার লবণ। আয়োডিনের উৎস হলো সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও মাছ, মাংস এবং শেওলা।

পানি (Water)

পানির অপর নাম জীবন। জীবন রক্ষার কাজে অক্সিজেনের পরেই পানির স্থান। দেহের পুষ্টির কাজে পানি অপরিহার্য। দেহের গঠন ও অভ্যন্তরীণ কাজ পানি ছাড়া চলতে পারে না। মানবদেহে পানির কাজগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. দেহ গঠন, ২. দেহের অভ্যন্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ ও ৩. দেহ থেকে দূষিত পদার্থ নির্গমন।

১. **দেহ গঠন** : দেহকোষেও গঠন ও প্রতিপালন পানি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈহিক ওজনের ৪৫%–৬০% পানি।

২. **দেহের অভ্যন্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ** : পানি ব্যতীত দেহাভ্যন্তরে কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া চলতে পারে না। দেহে পানি দ্রাবকরূপে কাজ করে। পানির জন্যই দেহে রক্ত সঞ্চালন সম্ভব। রক্তে পরিবাহিত খাদ্য উপাদান এবং অক্সিজেন পানির মাধ্যমে দেহকোষে পৌঁছতে পারে। দেহের সকল প্রকার রসে খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য দিয়ে রক্তে বিশোষিত হয়।

৩. **দূষিত পদার্থ নির্গমণ** : পানি দেহের দূষিত পদার্থ অপসারণে সহায়তা করে। মলমূত্র, ঘাম ইত্যাদি দূষিত পদার্থের সাথে দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হয়ে যায়।

এইভাবে প্রতিদিন দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি নির্গত হয়। তাছাড়া বয়স, আবহাওয়া, পরিশ্রম, খাওয়ার অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলো পানির চাহিদা প্রভাবিত করে। তাই একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ১ লি. পানি পান করা প্রয়োজন। যেমন– কোনো ব্যক্তির দৈনিক ক্যালরি চাহিদা ২০০০ কিলোক্যালরি হলে, তার দৈনিক ২ লি. পানির প্রয়োজন হয়।

খাদ্য আঁশ (Fibre) বা রাফেজ

শস্য দানার বহিরাবরণ, সবজি, ফলের খোসা, শাঁস বীজ এবং উদ্ভিদের ডাটা, ফল, মূল, পাতায় আঁশ থাকে। এগুলো মূলত কোষ প্রাচীরের সেলুলোজ এবং লিগনিন। হাড় যেমন মানবদেহের কাঠামো তৈরি করে, সেলুলোজ ও রাফেজ তেমনি উদ্ভিদের কাঠামো তৈরি করে। এগুলো জটিল শর্করা। গবাদিপশু যেমন– গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি সেলুলোজ হজম করতে পারে। কিন্তু মানুষ এগুলো হজম করতে পারে না। রাফেজ পানি শোষণ করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং বৃহদন্ত্র থেকে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে। রাফেজযুক্ত খাবার বিষাক্ত বর্জনীয় বস্তুকে খাদ্যনালি থেকে পরিশোষণ করে। ধারণা করা হয় এরূপ খাবার খাদ্যনালির ক্যান্সারের আশঙ্কা অনেকাংশে হ্রাস করে। আঁশযুক্ত খাবার স্থূলতা হ্রাস, ক্ষুধা প্রবণতা হ্রাস ও চর্বি জমার প্রবণতা হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আদর্শ খাদ্য পিরামিড

যেকোনো একটি সুষম খাদ্য তালিকায় শর্করা, শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ ও স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য অন্তর্ভুক্ত। একজন কিশোর বা কিশোরী, প্রাপ্ত বয়স্ক একজন পুরুষ বা মহিলার সুষম খাদ্য তালিকা লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তালিকায় শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, শর্করাকে নিচু স্তরে রেখে পর্যায়ক্রমে পরিমাণগত দিক বিবেচনা করে শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ, স্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে সাজালে যে কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয় তাকে আদর্শ খাদ্য পিরামিড বলে। চিত্রে এই পিরামিডের শীর্ষে রয়েছে স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য আর সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে শর্করা।

আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাবার তালিকায় যেসব খাবার থাকে তা পিরামিডের আকারে দেখানো হলো। খেয়াল করে দেখ, পিরামিডের অংশগুলো তার আকার অনুযায়ী নিচের দিকে বড়, উপরের দিকে ছোট। সবচেয়ে চওড়া অংশে

চিত্র ৫.৪: আদর্শ খাদ্য পিরামিড

ভাত, আলু, রুটি এসব। এগুলো বেশি করে খেতে হবে। তার পরের অংশে আছে শাকসবজি ও ফলমূল। এসব ভাত, রুটির চেয়ে কম খেতে হবে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, পনির, ছানা, দই আরও কম পরিমাণে খেতে হবে। তেল, চর্বি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার সবচেয়ে কম খাওয়া উচিত। আমাদের প্রতিদিনের খাবার খাদ্য পিরামিড অনুযায়ী বেছে নিতে হবে, তবেই আমরা সহজে সুষম খাদ্য নির্বাচন করতে পারব। খেতে ভালো লাগলে অনেক সময় আমরা অনেক বেশি খাদ্য খেয়ে নেই। সুস্বাস্থ্যের জন্য এ অভ্যাস কল্যাণকর নয়। তাই আমাদের পরিমিত পরিমাণ আহার করার অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে। সে সঙ্গে খাদ্য গ্রহণের নিয়মনীতি ও সময় মেনে চলতে হবে।

খাদ্য গ্রহণের নীতিমালা (Healthy Eating)

খাদ্য উপাদান বাছাই বা আহার সুষম করা উন্নত জীবনযাপনের একটি পূর্বশর্ত। খাদ্যগ্রহণ নীতিমালা বা নিয়মনীতি প্রত্যেকের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলে খাদ্য নির্বাচন, খাদ্যের পুষ্টিমান, ক্যালরি, পারিবারিক আয় ইত্যাদি সম্পর্কে নজর রেখে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের খাদ্য চাহিদা মেটানো সহজতর হয়। এসব কার্যক্রম খাদ্যগ্রহণ নীতিমালার অন্তর্গত।

সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্য

১. একজন মানুষের বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনের সামর্থ্য থাকতে হবে।

২. খাদ্যে আমিষ, চর্বি ও শর্করার অনুপাত হবে ৪ : ১ : ১।

৩. খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও রাফেজ বা সেলুলোজ সরবরাহের জন্য সুষম খাদ্য তালিকায় ফল ও টাটকা শাকসবজি থাকতে হবে।

৪. খাদ্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ও খনিজ লবণ থাকতে হবে।

৫. সুষম খাদ্য অবশ্যই সহজপাচ্য হতে হবে।

সুস্থ সবল ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য সুষম খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। দেহের পরিপুষ্টির জন্য ছয় উপাদানবিশিষ্ট খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করে সুষম খাদ্যের তালিকা বা মেনু পরিকল্পনা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেহের চাহিদা, খাদ্যের সহজলভ্যতা ও পারিবারিক আয় এ তিনটি বিষয় বিবেচনা করে খাদ্য উপাদান বাছাই বা মেনু পরিকল্পনা করলে তা বাস্তবমুখী হয়। সমান পুষ্টিমানের কম দামী খাবার দিয়েও মেনু পরিকল্পনা করা যায়। তবে সমমানের উপাদান সম্বলিত বেশি দামের খাদ্যের পরিবর্তে কম দামী খাদ্য নির্বাচন করে সুষম খাদ্য গ্রহণের মানসিকতা থাকা ভালো।

সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি

সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরির জন্য কতগুলো বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ রাখা প্রয়োজন। যেমন–

- ব্যক্তি বিশেষের লিঙ্গ, বয়স, পেশা ও শারীরিক অবস্থা;
- খাদ্যের মূল্যমান সম্পর্কে জ্ঞান;
- দেহের ক্ষয়পূরণ ও গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- খাদ্যে পরিমাণমতো ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির উপস্থিতি;
- ঋতু, আবহাওয়া ও খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে জ্ঞান;
- পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি ও সদস্য সংখ্যা।

নিচের সারণিগুলো পর্যবেক্ষণ কর। এ থেকে তোমরা বিভিন্ন বয়সী নর–নারীর খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ও ক্যালরি চাহিদা সম্পর্কে ধারণা পাবে।

তালিকা (ক) : পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার জন্য সুষম খাদ্য তালিকা

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার দেহে প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার ক্যালরি পেতে হলে তালিকায় উল্লিখিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হবে। কিশোর ও যুবা বয়সী ছেলেমেয়েদের বয়স অনুযায়ী পরিমাণে একটু কম খেলেও চলবে।

	পূর্ণবয়স্ক পুরুষ			পূর্ণবয়স্ক মহিলা		
খাদ্যশস্যের নাম	পরিশ্রমহীন (গ্রাম)	মোটামুটি পরিশ্রমী (গ্রাম)	পরিশ্রমী (গ্রাম)	পরিশ্রমহীন (গ্রাম)	মোটামুটি পরিশ্রমী (গ্রাম)	পরিশ্রমী (গ্রাম)
সিম/বরবটি	২০	২৫	৩০	২০	২২.৫	২৫
ডিম/মাছ/মাংস	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম
পাতাযুক্ত শাক	৪০	৪০	৪০	১০০	১০০	১৫০
অন্যান্য সবজি	৬০	৭০	৮০	৪০	৪০	১০০
মূল ও আলু	৫০	৬০	৮০	৫০	৫০	৬০
দুধ	১৫০	২০০	২৫০	১০০	১৫০	২০০
তেল/চর্বি	৪৫	৫০	৭০	২৫	৩০	৪৫
চিনি/গুড়	৩০	৩৫	৫৫	২০	২০	৪০

তালিকা (খ) : বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যসমূহের পুষ্টিমান

বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যশস্যসমূহের খাদ্যমান বা পুষ্টিমানের উপর ভিত্তি করে এ ছকটি তৈরি করা হয়েছে। এটি The Institute of Nutrition and Food Science (INFS, 1975) কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রকাশিত একটি ছক। প্রতি ১০০ গ্রাম গ্রহণযোগ্য খাদ্যাংশের ভিত্তিতে পুষ্টিমান নির্ধারণ করা হয়েছে।

খাদ্যদ্রব্যের নাম	আমিষ (গ্রাম)	তেল/চর্বি (গ্রাম)	মিনারেল (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	শক্তি (কিলোক্যালরি)
চাল	৬.৪	০.৪	০.৭	৭৯.০	৩৪৬
গম (আটা)	১২.১	১.৭	২.৭	৬৯.৪	৩৪১
ছোলা	১৭.১	৫.৩	৩.০	৬০.৯	৩৬০
মসুর	২৫.১	০.৭	২.১	৫৬.০	৩৪৩
গাজর	০.৯	০.২	১.১	১০.৬	৪৮
গোল আলু	১.৬	০.১	০.৬	২২.৬	৯৭
কলমিশাক	২.৯	০.৪	২.১	৩.১	২৮
পুঁইশাক	২.০	০.৭	১.৭	২.৯	২৬
কুমড়া (ছোট)	২.১	১.০	১.৪	১০.৬	৬০
বেগুন	১.৪	০.৩	০.৩	৪.০	২৪
ফুলকপি	২.৬	০.৪	১.০	৪.০	৩০
বাঁধাকপি	১.৮	০.১	০.৬	৪.৬	২৭
বরবটি	২.৫	০.১	২.০	৩.৭	২৬
শিম	৭.২	০.১	০.৪	১৫.৯	৯৬
ইলিশ মাছ	২১.৮	১৯.৪	২.২	২.৯	২৭৩
কাতলা মাছ	১৯.৫	২.৪	১.৫	২.৯	১১১
চিংড়ি	১৯.১	১.০	১.৭	০.৮	৮৯
গো-মাংস	২২.৬	২.৬	১.০	-	১১৪
ডিম	১৩.৩	১৩.৩	১.০	-	১৭৩
মুরগির মাংস	২৫.৯	০.৬	১.৩	-	১০৯
খাসির মাংস	১৮.৫	১৩.৩	১.৩	-	১৯৪
গরুর দুধ	৩.২	৪.১	০.৮	৪.৪	৬৭
মায়ের দুধ (মানুষ)	১.১	৩.৪	০.১	৭.৪	৬৫
গরুর দুধের ঘি	-	১০০.০০	-	-	৯০০
রান্নার তেল	-	১০০.০০	-	-	৯০০

এছাড়া অন্যান্য যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে তা হলো–

- খাদ্য তৈরি, পরিবেশন ও গ্রহণের সময় পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- দৈনিক ৭–৮ গ্লাস পানি পান করা। পানি অবশ্যই ফুটিয়ে পান করতে হবে।
- টাটকা সবুজ শাকসবজি, মৌসুমি ফলমূল গ্রহণ। প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় এগুলো থাকা আবশ্যক। টিনজাত ও হিমায়িত শাকসবজি না খাওয়াই উত্তম।

কাজ : শিক্ষার্থী তার ৭ দিনের গৃহীত খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করে এটিকে সুষম খাদ্যের সাথে তুলনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পুষ্টির অভাবজনিত রোগ

গলগন্ড (Goitre) : গলগন্ড থাইরয়েড গ্রন্থির একটি রোগ। খাবারে আয়োডিনের অভাব থাকলে থাইরয়েড গ্রন্থিটির আয়তন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়ে গলগন্ডের সৃষ্টি করে। সমুদ্র থেকে দূরে পার্বত্য এলাকার মাটিতে আয়োডিন কম থাকায় ঐসব অঞ্চলের শিশুদের এই রোগ বেশি দেখা যায়। গলগন্ড দুই রকম, যথা– ১. সরল গলগন্ড ও ২. টক্সিক গলগন্ড।

১. সরল গলগন্ড : আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায় অথবা গ্রন্থি দুটির যেকোনো একটি ফুলে যায়। ফলে গলার কিছু অংশ ফুলে নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। একে সরল গলগন্ড বলে।

চিত্র ৫.৫: গলগন্ড রোগী

আলসেমি বা কুঁড়েমি, নিদ্রাহীনতা, শুকনো চামড়া, ঠান্ডা সহ্য করতে না পারা, ছোট শিশুদের মানসিক প্রতিবন্ধকতা, পড়াশুনায় অমনোযোগী হওয়া এ রোগের লক্ষণ। থাইরয়েড গ্রন্থি বেশি ফুলে গেলে রোগীর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

যে অঞ্চলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব আছে সে অঞ্চলের খাওয়ার পানির সাথে অতি সামান্য মাত্রায় আয়োডিন মেশানো যেতে পারে।

২. টক্সিক গলগন্ড : অতিমাত্রায় থাইরক্সিন নামক হরমোন নিঃসরণের ফলে এ রোগ হয়। এ রোগের লক্ষণগুলো হলো– হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, বুক ধড়ফড় করা, ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া ও অধিক ঘাম হওয়া।

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিন দ্বারা এ গ্রন্থির বৃদ্ধি রোধ করা হয়। আয়োডিনযুক্ত খাবার খাওয়া, যেমন– সামুদ্রিক শৈবাল, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি।

রাতকানা (Night Blindness) : ভিটামিন 'এ' এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। সাধারণত দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা দেয়। চোখের সংবেদী 'রড' কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, স্বল্প আলোতে ভালো দেখা যায় না। চোখে সবকিছু ঝাপসা দেখা যায়। রোগটা বেড়ে গেলে কর্ণিয়া ঘোলাটে হয়ে যায়। এগুলো রাতকানা রোগের লক্ষণ।

ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন– মাছের যকৃতের তেল, কলিজা, সবুজ শাকসবজি, রঙিন ফল (পাকা আম, কলা, মিষ্টি কুমড়া, গাজর ইত্যাদি) ও মলা–ঢেলা মাছ খাওয়া, প্রয়োজনে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খেতে দেয়া। উক্ত নিয়মগুলো মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

রিকেটস (Rikets) : এটি কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ নয়। ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে এ রোগ হয়। অন্ত্রে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ, দাঁত ও হাড় গঠন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজে এ ভিটামিন প্রয়োজন। দুধ, মাখন, ডিম, কডলিভার তেল ও হাঙ্গারের তেলে প্রচুর ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। সূর্যের বেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানুষের ত্বকেও এটি তৈরি হয়।

দেহের হাড়গুলো দুর্বল হওয়া, গাঁট ফুলে যাওয়া, হাড়গুলো বিশেষ করে পায়ের হাড় বেঁকে যাওয়া, অনেক সময় সরু হাড়গুলো ভাঁজ খেয়ে যাওয়া এ রোগের লক্ষণ। এছাড়া অনেক সময় দেহের কাঠামো ঠিক রাখা যায় না, হাড়গুলো ভঙ্গুর হয়ে যায় ও বক্ষদেশ সরু হয়ে যায়।

শিশুদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে। নবজাতককে কিছুক্ষণ রোদে রাখা ভালো। এতে সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে ভিটামিন 'ডি' তৈরি হয়।

রক্তশূন্যতা (Anemia) : আমাদের দেশে শিশু ও মহিলাদের রক্তাল্পতা বা রক্তশূন্যতা একটি সাধারণ রোগ। রক্তশূন্যতা হচ্ছে দেহের এমন একটা অবস্থা যখন বয়স এবং লিঙ্গভেদে রক্তে হিমোগ্লোবিনের ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায়, খাদ্যের মুখ্যউপাদান ভিটামিন বি$_{১২}$ এর অভাব ঘটলে এ রোগ দেখা যায়। বাংলাদেশে সাধারণত লৌহঘটিত আমিষের অভাবে এই রোগ হয়। শিশুদের ও গর্ভধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মহিলাদের এই রোগ বেশি হয়। লৌহের ঘাটতি জনিত– রক্তাল্পতা বা রক্তশূন্যতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন– অত্যধিক রক্তপাত ঘটলে, ক্রিমির আক্রমণে, লৌহ গঠিত খাদ্য উপাদান যথাযথ শোষণ না হলে, বাড়ন্ত শিশু বা গর্ভবতী মহিলাদের খাদ্যে লৌহের পরিমাণ কম থাকলে, অন্ত্রে সংক্রমণ ঘটলে, কম বয়সী শিশুদের খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহের অভাব হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা দেয়। যেমন– দুর্বলতা অনুভব করা, মাথাব্যথা, মনমরা ভাব, অনিদ্রা, চোখে অন্ধকার দেখা, খাওয়ায় অরুচি, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি।

এ রোগ প্রতিরোধের জন্য লৌহ সমৃদ্ধ খাবার, যেমন– যকৃত, মাংস, ডিম, চিনাবাদাম, শাকসবজি, বরবটি, মশুরডাল, খেজুরের গুড় খাওয়া। পরীক্ষা দ্বারা অন্ত্রে ক্রিমির বা হুকওয়ার্ম–এর সংক্রমণ নিশ্চিত হয়ে ক্রিমিনাশক ঔষধ সেবন করা। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী লৌহ উপাদানযুক্ত ঔষধ সেবন করে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়।

কাজ : স্বাস্থ্য সম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার অংকন কর।

পুষ্টি উপাদানে শক্তি

আমরা জানি যে, খাদ্য আমাদেরকে পুষ্টি ও শক্তি দেয়। কিন্তু আমরা কি একথা জানি, কী পরিমাণ খাদ্য উপাদান থেকে কী পরিমাণ শক্তি পাই? আবার বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণও কি এক? খাদ্যের ছয়টি পুষ্টি উপাদানের মধ্যে শুধুমাত্র শর্করা, প্রোটিন এবং চর্বি জাতীয় উপাদান শক্তি দিতে পারে। বাকি উপাদান তিনটি শক্তি দিতে পারে না।

তোমরা জান শক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে। পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তি হচ্ছে তাপশক্তি। তাপশক্তির একক হচ্ছে ক্যালরি। এক কিলোগ্রাম (১০০০ গ্রাম) পানির উষ্ণতা ১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করতে এক ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়। আসলে এটা হলো কিলোক্যালরি। কিন্তু পুষ্টিবিদগণ একে সাধারণভাবে ক্যালরি বলে থাকেন।

দেহের মাংসপেশির সংকোচন ও প্রসারণের উপর শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। যে কাজে মাংসপেশি যত বেশি সংকোচিত ও প্রসারিত হয় সে কাজে তত বেশি শক্তি ব্যয় হয়।

আমাদের দেহের মাংসপেশি আমাদের চলনে সাহায্য করে। মাংসপেশির কারণে আমরা চলতে, ফিরতে, হাঁটতে, দৌড়াতে, বসতে ইত্যাদি কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। মাংসপেশির এ ধরনের কাজে সহায়তার জন্য কী পরিমাণ শক্তি খরচ হয়?

পেশির সংকোচন প্রসারণে শক্তি দরকার হয়। সুতরাং, মাংসপেশি যতবেশি সংকোচিত ও প্রসারিত হবে শক্তিও তত বেশি খরচ হবে। তাই কাজের উপর নির্ভর করে শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ। তবে কি হাঁটা, চলা ও নড়াচড়া না করলে শক্তি খরচ হয় না?

আমরা যদি কোনো কাজ না করি, শুধু শুয়ে বসে থাকি, তবুও আমাদের খাদ্যের দরকার হয়, ক্ষুধা লাগে, বিশ্রামরত অবস্থায়ও শক্তি খরচ হয় বলে মনে হয়। কিন্তু কীভাবে?

বিশ্রামাবস্থায় আমাদের বাহ্যিক অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ যেমন–হাত, পা কাজ করে না, কিন্তু আমাদের শ্বাস–প্রশ্বাস, হৃৎপিন্ড ঠিকই চলে। এদের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশিগুলোর সংকোচন প্রসারণে সার্বিক কাজ সাধিত হয়। কাজেই তখনই শক্তি ব্যয় হতে থাকে। এই শক্তিকে মৌলবিপাক শক্তি বলে। একজন লোকের দৈনিক কী পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তা প্রধানত

নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর। ১. মৌলবিপাক ২. দৈহিক পরিশ্রমের ধরন ও ৩. খাদ্যের প্রভাব। এছাড়া দেহের বৃদ্ধির শারীরিক অবস্থা ও আবহাওয়ার উপরও ক্যালরির চাহিদা নির্ভর করে।

খাদ্য শক্তির মূল্য নির্ণয়ের আন্তর্জাতিক একক

জুল (Joule)

১০০০ জুল = ১ কিলোজুল

১০০০ কিলোজুল = ১ মেগাজুল

১ কিলোক্যালরি = ৪১৮০ জুল

= ৪.১৮ কিলোজুল

১ মেগাজুল = .০০৪১৮ মেগাজুল

উদাহরণ

২৮০০ কিলোক্যালরি = কত জুল?

২৮০০ কিলোক্যালরি = ২৮০০ × ৪১৮০ জুল

= ২৮ ×৪.১৮ কিলোজুল

= ১১.৭ কিলোজুল

আন্তর্জাতিক সংস্থার মতে, খাদ্যের শক্তিমূল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কিলোক্যালরির পরিবর্তে কিলোজুল ব্যবহার করা উচিত। এক্ষেত্রে ১০০০ কিলোক্যালরি = ৪.২ কিলোজুল (প্রায়)।

পুষ্টি উপাদানে তাপশক্তি নির্ণয় : প্রতিদিন আমরা নানা রকম পুষ্টি উপাদান খেয়ে থাকি। ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, মাংস থেকে শুরু করে ফলমূল, শাকসবজি, পানীয় ইত্যাদির কোনোটিই বাদ যায় না। তাই পুষ্টি উপাদানে শক্তি পরিমাপ করতে হলে এর প্রকৃতি জেনে নিতে হবে।

পুষ্টির প্রকৃতি মিশ্র খাদ্য ও বিশুদ্ধ খাদ্য : খাদ্যের প্রকৃতি বলতে এটা কি মিশ্র খাদ্য, নাকি বিশুদ্ধ খাদ্য তাকে বুঝায়। মিশ্র খাদ্যে একের অধিক পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। যেমন– দুধ, ডিম, খিচুড়ি, পেয়ারা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিশুদ্ধ খাদ্যে শুধুমাত্র একটি উপাদান থাকে। যেমন– চিনি, গ্লুকোজ। এতে শর্করা ছাড়া অন্য কিছু থাকে না।

পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ নির্ণয় : পুষ্টি উপাদানের প্রকৃতি জানার পর ঐ খাদ্যে কী কী উপাদান কী পরিমাণে আছে তা জেনে নিতে হবে। তবে বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ খাদ্য মূল্য তালিকা দেখে জেনে নিতে হয়।

ক্যালরি নির্ণয় : খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ জানার পর শর্করা, প্রোটিন ও চর্বির ক্যালরি বের করতে হয়। এক্ষেত্রে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির ক্যালরি মূল্য শূন্য ধরে হিসাব করতে হবে। ধরা যাক, ২০ গ্রাম চিড়ার ক্যালরি নির্ণয় করতে হবে। তালিকায় প্রদত্ত উপাদান ও পরিমাণ অনুযায়ী ২০ গ্রাম চিড়ায়–

১৫.৪ গ্রাম শর্করা (৭৭%)

১.৩২ গ্রাম প্রোটিন (৬৬%)

০.২৪ গ্রাম স্নেহ (১.২%) আছে।

তাহলে, সূত্রানুসারে–

১৫.৪ গ্রাম শর্করা থেকে ১৫.৪ × ৪ = ৬১.৬০ ক্যালরি

১.৩২ গ্রাম প্রোটিন থেকে ১.৩২ × ৪ = ৫.২৮ ক্যালরি

০.২৪ গ্রাম স্নেহ থেকে ০.২৪ × ৯ = ২.১৬ ক্যালরি

অতএব, মোট ক্যালরি = ৬৯.০৪

এ হিসাবে, ১ কেজি চিড়ার ক্যালরি = $\frac{৬৯.০৪ \times ১০০০}{২০}$

= ৩৪৫২.০০

= ৩৪৫২ ক্যালরি

১০০০ কিলোক্যালরি = ৪.২ কিলোজুল

অতএব, ৩৪৫২ ক্যালরি = ১৪.৪৯ কিলোজুল (প্রায়)।

বিএমআর (BMR) এবং বিএমআই (BMI)

বেসাল মেটাবলিক রেট (BMR) পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় মানব শরীরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে। বডি মাস ইনডেক্স (BMI) মানব দেহের গড়ন ও চর্বির একটি সূচক নির্দেশ করে। অর্থাৎ সুস্থ জীবনযাপনে মানব শরীরের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় কোনো নির্দিষ্ট বয়সে শরীরের দৈর্ঘ্যের সাথে চর্বির পরিমাণগত সম্পর্ক মান নির্দেশ করে। শরীরের সুস্থতা ও স্থূলতার মান নির্ণয়ে এই মানদন্ড দু'টি খুবই উপযোগী।

বিএমআর মান নির্ণয়

বিএমআর মান বের করা একটু কঠিন, এর সমীকরণ লিঙ্গ ও বয়সভেদে পার্থক্য আছে। বিএমআর সম্পর্কে ধারণা পেতে বহুল ব্যবহৃত হ্যারিস বেনেডিক্ট সূত্রটি ব্যবহার করা যায়।

মেয়েদের বিএমআর = ৬৫৫+ (৯.৬ ×ওজন কেজি) + (১.৮ ×উচ্চতা সেমি) − (৪.৭× বয়স বছর)

ছেলেদের বিএমআর = ৬৬+ (১৩.৭× ওজন কেজি) + (৫ × উচ্চতা সেমি) − (৬.৮× বয়স বছর)

ধরা যাক একজন মহিলার বয়স ৩৩ বছর, উচ্চতা ১৬৫ সেমি এবং ওজন ৯৪ কেজি।

সুতরাং তার বিএমআর = ৬৫৫+ (৯.৬ ×৯৪) + (১.৮ ×১৬৫) − (৪.৭× ৩৩)

= ৬৫৫+ ৯০২.৪+ ২৯৭+ ১৫৫.১

= ১৬৯৯.৩ ক্যালরি

নিচের ছকটি ব্যবহার করে বিএমআর এর মান থেকে আমাদের দৈনিক ক্যালরির চাহিদা বের করা যায়।

শারীরিক অবস্থা	**ক্যালরি মান**
পরিশ্রমী না হলে	বিএমআর মান × ১.২
হালকা পরিশ্রমী, সপ্তাহে ২-৩ দিন খেলাধুলা করলে	বিএমআর মান × ১.৩৭৫
পরিশ্রমী, সপ্তাহে ২-৩ দিন প্রচুর খেলাধুলা করলে	বিএমআর মান × ১.৫৫
পরিশ্রমী, সপ্তাহে প্রতিদিন প্রচুর খেলাধুলা করলে	বিএমআর মান × ১.৭২৫
অত্যন্ত পরিশ্রমী, প্রচুর দৌড়ঝাঁপ খেলাধুলা করলে	বিএমআর মান × ১.৯

উদাহরণ হিসেবে উপরের মহিলাটি পরিশ্রমী নয় বলে ধরা হলে তার বিএমআর মান ১৬৯৯.৩ হলে তার ক্যালরি চাহিদার মান (১৬৯৯.৩ × ১.২) বা ২০৩৯.১৬। অর্থাৎ প্রতিদিন ২০৩৯ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণে সেই মহিলাটি তার ওজন একই রাখতে পারবে।

বিএমআর ও ব্যয়িত শক্তির সম্পর্ক

বিএমআর মান বয়স, লিঙ্গ, খাদ্যাভ্যাস ও শরীরের গঠনের উপর নির্ভরশীল। আমাদের দৈনিক খাদ্য চাহিদার সাথে বিএমআর–এর মান নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায়। বিএমআর আমাদের শরীরের ৬০ থেকে ৭৫ ভাগ শক্তির উৎপাদন নিয়ন্ত্রন করে। আমাদের শরীর খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে মাত্র ১০–২০ শতাংশ এবং শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ শক্তি পেয়ে থাকে। মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে বিএমআর মান কমতে থাকে, আবার অনেকেই শুকনা থাকার জন্যে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে। এতে বিএমআর মান আরও কমে যায়, ফলে আর না খেয়ে শুকানো যায় না। যদি প্রতিদিন পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম করা হয় তাতে বিএমআর মান বেড়ে যায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শরীরকে সুস্থ সবল রাখা যায়।

বিএমআই মান নির্ণয়

বিএমআই = দেহের ওজন (কেজি) / দেহের উচ্চতা (মিটার)^{২}

উদাহরণ হিসেবে ১২৫ সেমি (১.২৫ মিটার) উচ্চতা এবং ৫০ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির বিএমআই হচ্ছে ৩২।

বিএমআই মানদন্ড

মান নির্দেশিকা

১৮.৫ এর নিচে শরীরের ওজন কম, পরিমিত খাদ্য গ্রহণে ওজন বাড়াতে হবে।

১৮.৫–২৪.৯ সুস্বাস্থ্যের আদর্শ মান।

২৫–২৯.৯ শরীরের অতিরিক্ত ওজন, ব্যায়াম করে অতিরিক্ত ওজন কমানো প্রয়োজন।

৩০–৩৪.৯ মোটা হওয়ার প্রথম স্তর, বেছে খাদ্যগ্রহণ ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

৩৫–৩৯.৯ মোটা হওয়ার দ্বিতীয় স্তর, পরিমিত খাদ্যগ্রহণ ও এক্সারসাইজ করা প্রয়োজন।

৪০ এর উপরে অতিরিক্ত মোটাত্ব, মৃত্যুঝুঁকির সমূহ সম্ভাবনা, ডাক্তারের পরামর্শের প্রয়োজন।

বিএমআই মানদন্ডে ব্যক্তিটির সুস্বাস্থ্যের জন্যে ৩৮ কেজি ওজন হওয়া প্রয়োজন। অতএব সঠিক পুষ্টি গ্রহণ ও ব্যায়ামের মাধ্যমে ওজন স্বাস্থ্যসম্মত মানে নিয়ে যেতে হবে।

শরীরচর্চা ও বিশ্রাম

সুস্থ জীবনের জন্য প্রতিদিন সকলেরই পরিমিত পরিশ্রম করা উচিত। ইত্যাদি কারণে শরীরকে সবল রাখতে চেষ্টা করি। বর্তমানে কাজের ধারা, পড়াশুনার চাপ, খেলার মাঠের অপ্রতুলতা আমরা খুব কমই হাঁটাচলা কিংবা দৌড়া–দৌড়ি করি ফলে আমাদের স্থূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শরীর সুস্থ, সবল থাকছে না এবং আমরা কর্মবিমুখ হয়ে পড়ছি। পরিমিত শরীর চর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরের কার্যক্ষমতা অটুট রেখে সুস্থ থাকতে পারি। দেখা গেছে যারা প্রতিদিন এক ঘণ্টা মাঝারি মানের শরীরচর্চা করে, পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে, তারাই হাসিখুশি জীবনযাপন করে এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করে। শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহের অতিরিক্ত ওজন কমানো সম্ভব। শরীরচর্চার ফলে ডায়াবেটিস রোগ, হৃদরোগ ও কয়েক প্রকার ক্যান্সার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন রকমের শরীরচর্চা আছে। যেমন, কসরত, পেশি ও অস্থি গঠন ইত্যাদি। নানাভাবে শরীরচর্চা করা যায়। জোরে হাঁটা, জগিং, দৌড়, সাঁতারকাটা, খেলাধুলা করা, সাইকেল চালানো ইত্যাদি শরীরচর্চার অংশ।

আমাদের শরীরের জন্য বিশ্রাম অত্যন্ত জরুরি বিষয়। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পরই বিশ্রাম প্রয়োজন। শুয়ে থাকা,

ঘুমানো ইত্যাদি বিশ্রামের অংশ। বিশ্রামের ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ পুনঃশক্তি সঞ্চয় করে। জানলে আশ্চর্য হতে হয় যে জীবজগতের প্রায় প্রতিটি প্রাণীই বিশ্রাম নেয়। এই বিশ্রাম দিন ও রাত্রির চক্রের সাথে সম্পৃক্ত। অনেক প্রাণী আছে যারা সূর্যালোকে কর্মক্ষম থাকে। আবার অনেক প্রাণী আছে যারা দিনে বিশ্রাম নেয় কিন্তু রাতে কর্মক্ষম হয়ে খাদ্যের খোঁজে বের হয়। এদের নিশাচর বলে।

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার

খাদ্য সংরক্ষণ এমন এক প্রক্রিয়া যাতে খাদ্যের পচন রোধ করা হয়। ফলে খাদ্যের গুণাগুণ, গ্রহণযোগ্যতা ও খাদ্যমান অটুট থাকে। খাদ্য সংরক্ষণে সাধারণত পচনসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক সংক্রমণ এবং খাদ্যের চর্বিজাতীয় অংশের জারণ রোধ করা হয়।

মাছের শুঁটকিকরণ, লোনা ইলিশ, আঁচার, বরফ সংরক্ষণ, চিংড়ির নাপতে, মাছের শীদল ইত্যাদি সবই খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রচলিত উপায়। অধুনা খাদ্যদ্রব্যের ক্যানিং বা কৌটাজাত, ধোঁয়ার মাধ্যমে স্মোকিং প্রভৃতি প্রক্রিয়া খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয়। খাদ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসম্মত অনুমোদিত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় যাতে খাদ্যদ্রব্যে পচনসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক সংক্রমণ করতে না পারে। সাধারণত সোডিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণ, ক্যালসিয়াম এপারনেট, সালফার ডাই–অক্সাইড, সোডিয়াম বাইসালফেট, এন্টি–অক্সিডেন্ট যেমন BHA ও BHT খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে অনুমোদিতভাবে ব্যবহার করা হয়। তবে স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে ক্ষতিকারক ফরমালিন, বিভিন্ন রকমের রঞ্জক পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা উচিত নয়।

খাদ্যে ভেজাল ও রঞ্জক ব্যবহার

এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের নির্মল পরিবেশের যেমন প্রয়োজন তেমনি নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। বর্তমানে বাজারে অনৈতিকভাবে খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর ও অস্বাস্থ্যকর রাসায়নিক দ্রব্য ভেজাল ও রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করে তা বিক্রি করা হয়। এর ফলে জনস্বাস্থ্য এখন হুমকির সম্মুখীন। স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের এই ঝুঁকির ধারা চলতে থাকলে রোম জাতির ন্যায় হয়তো বাঙ্গালি জাতি কালের আবর্তনে একসময় বিলীন হয়ে যেতে পারে। একসময় রোমবাসী যে পানীয় আধার ব্যবহার করত তা সিসার তৈরি ছিল। যার ফলে পানকারী কোনো না কোনোভাবে সিসার বিষাক্ততার শিকার হয়েছে এবং বিকলাঙ্গ প্রজন্মের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভেজাল মেশান হয়। এর মধ্যে মূলত বাণিজ্যিক রঙ, এন্টিবায়োটিক, রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন, সরবেট, কার্বাইড, কীট ও বালাইনাশক, ফরমালিন, হেভি মেটাল) উল্লেখযোগ্য। যেসব মাছ, গৃহপালিত পশু ও হাঁস–মুরগি ইত্যাদি অননুমোদিত দ্রব্য দিয়ে তৈরি খাদ্য খাওয়ানো হয় তা মানব শরীরের জন্য হুমকিস্বরূপ। এই ভেজালযুক্ত নিষিদ্ধ খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। স্বাস্থ্যঝুঁকির কয়েকটি ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরা হলো। বাণিজ্যিক রঙ যা কাপড় কিংবা রঙের কাজে ব্যবহার করা হয়, তা বিভিন্ন প্রকার খাদ্য যেমন আইসক্রিম, গোলা আইসক্রিম, লজেন্স, বেগুণি, বড়া ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই জাতীয় খাবার ধীরে ধীরে যকৃতের কার্যকারিতা নষ্ট করে নানাবিধ রোগের কারণ হয়। ফরমালিনে ডুবানো মাছ, ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া জন্ম নিতে পারে না বলে কয়েকদিন বেশ টাটকা দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ফরমালিন মাছের কোষের সাথে যৌগ তৈরি করে ফেলে। মাছ ধোয়া হলেও ঐ যৌগটি মাছের দেহে থেকে যায়। যা পরে রান্না করা মাছের সাথে মানব দেহে প্রবেশ করে। এই বিষাক্ত যৌগ নানা রকম জটিল রোগের উপসর্গের কারণসহ অনেক ক্ষেত্রে ক্যানসার জাতীয় রোগের সৃষ্টি করে।

মজুদ খাদ্যে ও সবজিতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কীটনাশকের বিষাক্ততার সময় নষ্ট হবার আগেই দ্রব্যাদি

বাজারজাত করলে বিষাক্ত খাদ্যের প্রভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা থাকে। এতে শিশুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। তাদের শরীরের বাড়ন্ত কোষে এই বিষাক্ত কীটনাশক বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে একদিকে যেমন শিশুর মনের বিকাশ ব্যাহত হয় অন্যদিকে তারা নানা রকমের অসুস্থতায় ভুগে থাকে।

খাদ্যে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেজাল থাকে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

ভেজাল/বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য	সম্ভাব্য উৎস	প্রতিকার
১. এন্টিবায়োটিক	মৎস ও পশুখাদ্যে ব্যবহারের ফলে প্রাণীর শরীরে জমা হয়।	শুধুমাত্র অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।
২. হেভি মেটাল	মৎস্য ও পশুখাদ্যে ব্যবহৃত অখাদ্য উপাদান (যেমন ট্যানারির বর্জ্য) প্রাণীর শরীরে জমা হয়।	অখাদ্য উপাদান যেমন ট্যানারির বর্জ্য, কয়লা, মাটি, প্রাণীর বিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যবহার পরিহার করা।
৩. বাণিজ্যিক রঙ	রঙের কারখানা প্রধান ব্যবহারকারী। আইসক্রিম, গোলা-আইসক্রিম, সরবত, রঙ্গিন পানীয়, ভাজা বড়া ইত্যাদিতে অননুমোদিত ব্যবহার।	শুধুমাত্র অনুমোদিত খাদ্যরঙ ব্যবহার করা।
৪. ফরমালিন	রঙিন ছবি ডেভেলপের স্টুডিও, লাশ সংরক্ষণের মর্গ ইত্যাদি প্রধান ব্যবহারকারী। মাছ, দুধ, ফল ইত্যাদি সংরক্ষণে অননুমোদিত ব্যবহার ।	ফরমালিন ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা ।
৫. কীটনাশক	শাক-সবজি উৎপাদনে বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে বিষাক্ততা অনেক ক্ষেত্রে রয়ে যায়। শুঁটকিতে ডিডিটির অননুমোদিত ব্যবহার ।	কীটনাশকের বিষাক্ততা নষ্ট হবার পর শাক-সবজি বাজারজাত করা। শুঁটকিতে ডিডিটি ব্যবহার না করা।
৬. রাসায়নিক পদার্থ	কারবাইডসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ কাঁচা ফল ও টমেটো পাকাতে অননুমোদিতভাবে ব্যবহার। সফট ও এনার্জি পানীয়জলে অতিরিক্ত সরবেটের অননুমোদিত ভাবে ব্যবহার।	ফলকে পরিপক্ব হতে সময় দেয়া, যাতে প্রকৃতিগতভাবে ফল পাকে। কারবাইড ব্যবহার না করা। পরিমিত মাত্রায় সরবেট ব্যবহার করা।
৭. জীবাণু	খাদ্য উৎপাদন কিংবা প্রস্তুতিকালে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জীবাণু খাদ্যে মিশে যেতে পারে।	বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ।

পরিপাক : মানবদেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত। এই কোষগুলোকে সজীব ও কার্যকর রাখতে হলে সময়মতো খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ খাদ্য জটিল ও জৈব যৌগ অবস্থায় গ্রহণ করা হয়। দেহের কোষগুলো তা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। খাদ্যকে শোষণযোগ্য ও কোষ উপযোগী করতে হলে তাকে ভেঙ্গে সহজ, সরল ও তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা আবশ্যক।

পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System) : খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের কাজের জন্য মানবদেহে পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র নামে একটি স্বতন্ত্র তন্ত্র থাকে। যে তন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ভেঙ্গে দেহের গ্রহণ উপযোগী উপাদানে পরিণত ও শোষিত হয় তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র বলে। এ তন্ত্রটি পৌষ্টিকনালি ও কয়েকটি গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। পৌষ্টিকনালি মুখ থেকে শুরু হয়ে পায়ুতে শেষ হয়।

দেহে দুভাবে খাদ্য শোষিত হবার উপযোগী হয় যথা:– ১. যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও ২. রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়।

১. যান্ত্রিক প্রক্রিয়া : খাদ্যদ্রব্য মুখগহবরে দাঁতের সাহায্যে চিবানো হয়। প্রথমত চিবানোর ফলে খাদ্যবস্তু ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়। পাকস্থলি ও অন্ত্রের মধ্যে এই টুকরো খাদ্যবস্তুগুলো মন্ডে পরিণত হয়।

২. রাসায়নিক প্রক্রিয়া : রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরিপাকের দ্বিতীয় ধাপ। পরিপাক রসের এনজাইম খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। এতে খাদ্যের জটিল উপাদানগুলো ভেঙ্গে দেহে গ্রহণযোগ্য সরল উপাদানে পরিণত হয়। তাছাড়া কোষ মধ্যস্থক্রিয়া এই এনজাইমের উপর নির্ভরশীল।

পৌষ্টিকতন্ত্র বা পৌষ্টিকনালি : মুখগহবর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত এই নালিপথ কোথাও সরু আবার কোথাও প্রশস্ত। এর প্রধান অংশগুলো নিম্নরূপ :

মুখ (Mouth) : মুখ দিয়ে পৌষ্টিকনালির শুরু হয়। এটি নাসারন্ধ্রের নিচে আড়াআড়ি একটি বড় ছিদ্র যা উপরে ও নিচে ঠোঁট দ্বারা বেষ্টিত থাকে।

মুখগহবর (Buccal cavity) : মুখের অভ্যন্তরে দাঁত, জিহবা ও লালাগ্রন্থি থাকে। এগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। দাঁত খাদ্যকে চিবাতে সাহায্য করে এবং খাদ্যবস্তুকে ছোট ছোট অংশে পরিণত করে। জিহবা খাদ্যবস্তুকে নেড়েচেড়ে চিবাতে সাহায্য করে এবং স্বাদ গ্রহণ করে। মুখগহবরে অবস্থিত লালাগ্রন্থি থেকে এনজাইম ক্ষরণ হয়। এই গ্রন্থিগুলো কানের নিচে চোয়ালের পাশে ও জিহবার নিচে অবস্থিত। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসের মিউসিন খাদ্যকে পিচ্ছিল করে গলধঃকরণে সাহায্য করে। লালারসের টায়ালিন ও মলটেজ নামক এনজাইম শর্করা পরিপাকে অংশ নেয়।

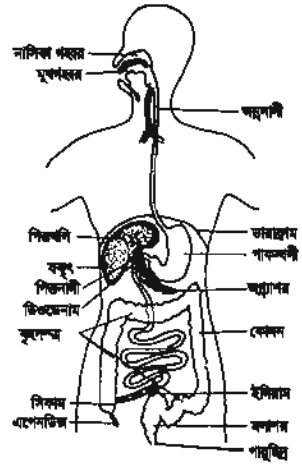

চিত্র ৫.৬: পরিপাকতন্ত্র

দাঁত (Tooth) : মানবদেহে সবচেয়ে শক্ত অংশ দাঁত। প্রাপ্ত বয়সে মুখগহবরের উপরে ও নিচের চোয়ালে সাধারণত ১৬টি করে মোট ৩২টি দাঁত থাকে। মানবদেহে দাঁত দুবার ওঠে। প্রথমবার শিশুকালে দুধদাঁত, দ্বিতীয়বার দুধদাঁত পড়ে গিয়ে ১৮ বছরের মধ্যে স্থায়ী দাঁত ওঠে।

মানুষের স্থায়ী দাঁত চার ধরনের। যথা–

ক. **কর্তন দাঁত (Incissor) :** এই দাঁত দিয়ে খাবার কেটে টুকরা করা হয়।

খ. **ছেদন দাঁত (Canine) :** এই দাঁত দিয়ে খাবার ছেঁড়া হয়।

গ. **অগ্রপেষণ (Premolar) :** এই দাঁত দিয়ে চর্বণ, পেষণ উভয় কাজ করা হয়।

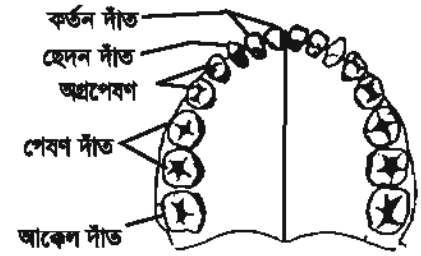

চিত্র ৫.৭: বিভিন্ন প্রকার দাঁত

ঘ. **পেষণ দাঁত (Molar) :** এই দাঁত খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণে ব্যবহৃত হয়। মাড়ির সবচেয়ে পেছনের বা শেষের দাঁত দুটোকে অনেক সময় আক্কেল দাঁত বলা হয়। প্রতিটি চোয়ালের মাঝখানে দুটি কর্তন, একটি ছেদন, দুটি অগ্রপেষণ ও তিনটি করে পেষণ দাঁত থাকে।

দাঁতের গঠন : প্রতিটি দাঁতের তিনটি অংশ থাকে। যথা–

১. **মুকুট :** মাড়ির উপরের অংশ;

২. **মূল :** মাড়ির ভিতরের অংশ ও

৩. **গ্রিবা :** দাঁতের মধ্যবর্তী অংশ।

প্রতিটি দাঁত যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তা হলো–

ক. **ডেন্টিন (Dentine) :** দাঁত প্রধানত ডেন্টিন নামক শক্ত উপাদান দ্বারা গঠিত।

খ. **এনামেল (Enamal) :** দাঁতের মুকুট অংশে ডেন্টিনের উপরিভাগে এনামেল নামক কঠিন উপাদান থাকে। এনামেল ও ডেন্টিন ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ফ্লোরাইড দিয়ে তৈরি।

গ. **দন্তমজ্জা (Pulp) :** ডেন্টিনের ভিতরের ফাঁপা নরম অংশকে দন্তমজ্জা বলে। এর ভিতরে ধমনি, শিরা, স্নায়ু ও নরম কোষ থাকে। দন্তমজ্জার মাধ্যমে ডেন্টিন অংশে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ হয়।

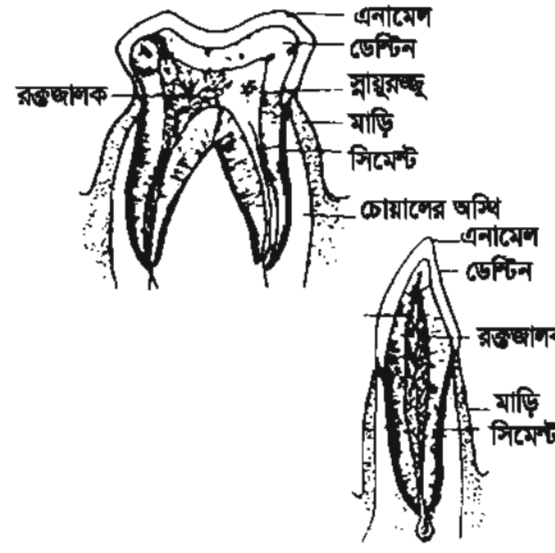

চিত্র ৫.৮: দাঁতের লম্বচ্ছেদ

ঘ. **সিমেন্ট (Cement) :** সিমেন্ট নামক পাতলা আবরণ দাঁতের মূল অংশ ডেন্টিনকে আবৃত করে রাখে। এই সিমেন্টের সাহায্যে দাঁত মাড়ির সাথে আটকানো থাকে।

গলবিল (Pharynx) : মুখগহবরের পরের অংশ গলবিল। মুখগহবর থেকে খাদ্যবস্তু গলবিলের মধ্য দিয়ে অন্ননালিতে পৌঁছে।

অন্ননালি (Oesophagus) : গলবিল থেকে পাকস্থলি পর্যন্ত বিস্তৃত নালিটির নাম অন্ননালি। খাদ্যবস্তু এই নালির মধ্য দিয়ে পাকস্থলিতে পৌঁছে।

পাকস্থলি (Stomach) : অন্ননালি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মাঝখানে একটি থলির মতো অঙ্গ। এর প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। পাকস্থলির প্রাচীরে অসংখ্য গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি থাকে। পাকস্থলির পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুকে পিষে মণ্ডে পরিণত করে। গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

অন্ত্র (Intestine): পাকস্থলির পরের অংশ অন্ত্র। এটি একটি লম্বা প্যাঁচানো নালি। অন্ত্র দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত। যথা:–

ক. **ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine) :** পাকস্থলি থেকে বৃহদন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা, প্যাচানো নলটিকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। ক্ষুদ্রান্ত্র আবার তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা– ডুওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডুওডেনামে পিত্তথলি থেকে

পিত্তনালি এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় নালি এসে মিলিত হয়। পিত্তনালির মাধ্যমে যকৃতের পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয়ের অগ্ন্যাশয় রস ডুওডেনামে এসে পৌছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে আঙুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে। এদের ভিলাস বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে আন্ত্রিক গ্রন্থিও থাকে। ভিলাস পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান শোষণ করে।

খ. বৃহদন্ত্র (Large Intestine) : ইলিয়ামের পর থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা নলাকৃতির অংশ হলো বৃহদন্ত্র। বৃহদন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা– সিকাম, কোলন ও মলাশয়। সিকামের সাথে অ্যাপেনডিক্স নামক ক্ষুদ্র নলের মতো প্রবৃদ্ধি সংযুক্ত থাকে। বৃহদন্ত্রে মূলত পানি শোষিত হয়, মল তৈরি হয় ও মল জমা থাকে।

পায়ু : পৌষ্টিকনালির শেষ প্রান্তে অবস্থিত এই ছিদ্রপথই হলো পায়ু।

পৌষ্টিকগ্রন্থি (Degestive glands) : যেসব গ্রন্থির রস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয় তাদেরকে পরিপাক বা পৌষ্টিকগ্রন্থি বলে। মানবদেহে পৌষ্টিকগ্রন্থিগুলো হলো–

ক. **লালাগ্রন্থি (Salivary glands) :** মানুষের আছে তিন জোড়া লালাগ্রন্থি; দুই কানের সামনে ও নিচে একজোড়া প্যারোটিডগ্রন্থি, চোয়ালের নিচে সাব–ম্যাক্সিলারি ও চিবুকের নিচে একজোড়া সাব–লিঙ্গুয়ালগ্রন্থি পৃথক পৃথক নালির মাধ্যমে মুখগহ্বরে উন্মুক্ত হয়। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস, লালা (Saliva) নামে পরিচিত। লালা রসে টায়ালিন নামক এনজাইম ও পানি থাকে।

খ. **যকৃত (Liver) :** মধ্যচ্ছদার নিচে উদর গহ্বরের উপরে পাকস্থলির ডান পাশে যকৃত অবস্থিত। এটি মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি। এর রং লালচে খয়েরি। যকৃতের ডান খন্ডটি বাম খন্ড থেকে আকারে কিছুটা বড়। প্রকৃতপক্ষে চারটি অসম্পূর্ণ খন্ড নিয়ে যকৃত গঠিত। প্রতিটি খন্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোবিউল দ্বারা তৈরি। প্রত্যেকটি লোবিউলে অসংখ্য কোষ থাকে। এ কোষ পিত্তরস (Bile) তৈরি করে। পিত্তরস ক্ষারীয় গুণ সম্পন্ন। যকৃতে বিভিন্ন রকম জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তাই একে রসায়ন গবেষণাগার বলা হয়।

যকৃতের নিচের অংশ পিত্তথলি বা পিত্তাশয় সংলগ্ন থাকে। এখানে পিত্তরস জমা হয়। পিত্তরস গাঢ় সবুজ বর্ণের এবং তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট। পিত্তথলি পিত্তনালির সাহায্যে অগ্ন্যাশয় নালির সাথে মিলিত হয়। এটি যকৃত–অগ্ন্যাশয় নালির মাধ্যমে ডুওডেনামে প্রবেশ করে।

কাজ : পৌষ্টিকতন্ত্রের চিত্র অংকন করে চিহ্নিত কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

যকৃতের কাজ

যকৃত পিত্তরস তৈরি করে। পিত্তরসের মধ্যে পানি, পিত্তলবণ, কোলেস্টেরল, পিত্তরস ও খনিজ লবণ প্রধান। এই রস পিত্তথলিতে জমা থাকে। প্রয়োজনে ডুওডেনামে এসে পরোক্ষভাবে পরিপাকে অংশ নেয়। পিত্তরসে কোনো উৎসেচক বা কোনো এনজাইম থাকে না। যকৃত উদ্বৃত্ত গ্লুকোজ নিজ দেহে গ্লাইকোজেন রূপে সঞ্চয় করে রাখে। পিত্তরস খাদ্যের অম্লভাব প্রসমিত করে এবং ক্ষারীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশ খাদ্য পরিপাকের অনুকূল। কেননা আম্লিক পরিবেশে খাদ্য পরিপাক হয় না। পিত্তরস চর্বিজাতীয় খাদ্যকে ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে যা লাইপেজ সহযোগে পরিপাকে সহায়তা করে। অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিড যকৃতে আসার পর বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও অ্যামোনিয়ারূপে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে এবং স্নেহ জাতীয় পদার্থ শোষণে সাহায্য করে। রক্তে কখনও গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে যকৃতের সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের কিছুটা অংশ গ্লুকোজে পরিণত হয় ও রক্ত স্রোতে মিশে যায়। এভাবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

অগ্ন্যাশয় (Pancreas) : অগ্ন্যাশয় পাকস্থলির পিছনে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশ্রগ্রন্থি। এটি একাধারে পরিপাকে অংশগ্রহণকারী এনজাইম ও রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন নিঃসৃত করে। অর্থাৎ অগ্ন্যাশয় বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে। অগ্ন্যাশয় রস অগ্ন্যাশয় নালির মাধ্যমে যকৃত–অগ্ন্যাশয় নালিরূপে ডুওডেনামে প্রবেশ করে।

অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয় রসে ট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ নামক উৎসেচক থাকে। এসব এনজাইম শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাকে সহায়তা করে। তাছাড়াও অম্ল–ক্ষারের সাম্যতা, পানির সাম্যতা, দেহতাপ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের একটি অংশ অতি প্রয়োজনীয় কিছু হরমোন নিঃসরণ করে, যেমন– ইনস্যুলিন গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কাজে এ হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি (Gastric glands) : গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি পাকস্থলির প্রাচীরে থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস নামে পরিচিত।

আন্ত্রিকগ্রন্থি (Intestine glands) : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরে ভিলাই–এ আন্ত্রিকগ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসের নাম আন্ত্রিক রস।

খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া (Digestion of Food) : যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানুষের পৌষ্টিক নালির ফভতরে জটিল, অদ্রনীয়, অশোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানসমূহ নির্দিষ্ট উৎসেচক বা এনজাইম এবং প্রাণরস বা হরমোনের উপস্থিতিতে বিশ্লেষিত হয়ে শোষণযোগ্য এবং দ্রবণীয় সরল উপাদানে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমত সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং পরবর্তীতে কোষ আবরণীর ভেতর দিয়ে অতি সহজে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অবশেষে রক্ত এ পরিপাককৃত সরল উপাদানগুলোকে দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে।

মুখে পরিপাক : মুখগহবরে খাদ্য, দাঁত ও জিহবার সাহায্যে চিবানোর ফলে খাদ্যবস্তু ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হয়। এ সময় লালাগ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয়ে খাদ্যের সাথে মিশে যায়। লালা খাদ্যবস্তুকে গলাধঃকরণে সাহায্য করে। লালায় টায়ালিন বা স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ নামক উৎসেচক বা এনজাইম থাকে। এটি শ্বেতসারকে মলটোজে পরিণত করে। মুখগহবরে আমিষ বা স্নেহ জাতীয় খাদ্যের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না।

মুখগহবর থেকে খাদ্যদ্রব্য পেরিস্ট্রালসিস (Peristalsis) প্রক্রিয়ায় অন্ননালির মধ্য দিয়ে পাকস্থলিতে প্রবেশ করে। পৌষ্টিক নালিগাত্রের পেশির পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যদ্রব্য সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অন্ননালিতে খাদ্যের কোনো পরিপাক ক্রিয়া ঘটে না।

পাকস্থলিতে পরিপাক : পাকস্থলিতে খাদ্য আসার পর অন্তঃপ্রাচীরের গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরিত হয়। এই রসে প্রধান যে উপাদানগুলো থাকে তা হলো–

হাইড্রোক্লোরিক এসিড : হাইড্রোক্লোরিক এসিড খাদ্যের মধ্যে কোনো অনিষ্টকারী ব্যাকটেরিয়া থাকলে তা মেরে ফেলে। নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে এবং পাকস্থলিতে পেপসিনের সুষ্ঠু কাজের জন্য অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

পেপসিন (Pepsin) : এক ধরনের এনজাইম যা আমিষকে ভেঙ্গে দুই বা ততোধিক অ্যামাইনো এসিড দ্বারা তৈরি যৌগ গঠন করে যা পেপটাইড নামে পরিচিত।

শর্করা এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্য সাধারণত পাকস্থলিতে পরিপাক হয় না। কারণ এদের পরিপাকের জন্য গ্যাস্ট্রিক রসে নির্দিষ্ট কোনো এনজাইম থাকে না।

পাকস্থলিতে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছানো মাত্র উপরোক্ত রসগুলো নিঃসৃত হয়। পাকস্থলির অনবরত সংকোচন ও প্রসারণ এবং এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে খাদ্য মিশ্র মন্ডে পরিণত হয়। একে পাকমন্ড বা কাইম (Chyme) বলে। এই মন্ড অনেকটা স্যুপের মতো এবং কপাটিকা ভেদ করে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক : পাকস্থলি থেকে পাকমন্ড ক্ষুদ্রান্ত্রের ডুওডেনামে প্রবেশ করে। এ সময় অগ্ন্যাশয় থেকে একটি ক্ষারীয় পাচকরস ডুওডেনামে আসে। এই পাচক রস খাদ্যমন্ডের অম্লভাব প্রশমিত করে। পাচক রসের এনজাইম দ্বারা শর্করা ও আমিষ পরিপাকের কাজ চলতে থাকে এবং স্নেহ পদার্থের পরিপাক শুরু হয়।

পিত্তরস যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়। এটি অম্লীয় অবস্থায় খাদ্যকে ক্ষারীয় করে পরিপাকের উপযোগী করে তোলে। পিত্তলবণ স্নেহ পদার্থের ক্ষুদ্র কণাগুলোকে পানির সাথে মিশতে সাহায্য করে। পিত্তলবণ পিত্তরসের অন্যতম উপাদান। লাইপেজের কাজ যথাযথ সম্পাদনের জন্য পিত্তলবণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ লবণের সংস্পর্শে স্নেহ পদার্থ সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত হয়। স্নেহ বিশ্লেষক লাইপেজ এই দানাগুলোকে ভেঙ্গে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

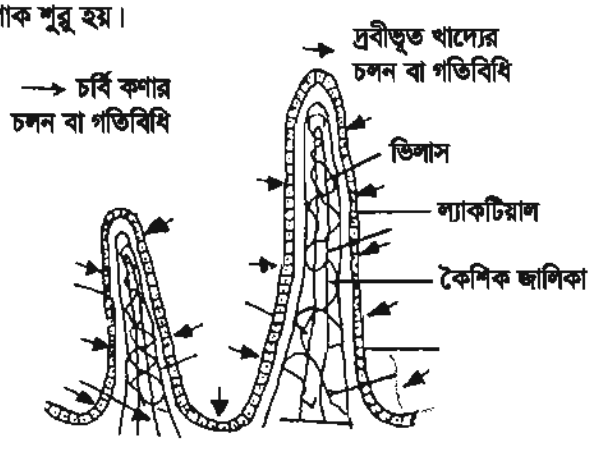

চিত্র ৫.৯: ইলিয়ামে দ্রবীভূত খাদ্য ও স্নেহ পদার্থের শোষণ

অগ্ন্যাশয় রসে অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ, ট্রিপসিন নামক এনজাইম থাকে। আন্ত্রিক রসে আন্ত্রিক অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, মলটেজ, ল্যাকটেজ ও শুক্রোজ ইত্যাদি এনজাইম থাকে। আংশিক পরিপাককৃত আমিষ ক্ষুদ্রান্ত্রে ট্রিপসিনের সাহায্যে ভেঙ্গে অ্যামাইনো এসিড ও সরল পেপটাইডে পরিণত হয়।

পরিপাককৃত খাদ্য শোষণ : ক্ষুদ্রান্ত্রে সব ধরনের খাদ্যই সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট এনজাইমের ক্রিয়ায় পরিপাক হয়ে সরল, শোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানে পরিবর্তিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত রক্তজালকসমৃদ্ধ আঙ্গুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে। একে ভিলাই বলে। প্রতিটি ভিলাসের মধ্যস্থলে ল্যাকটিয়াল নামক লসিকা জালক রক্তের কৈশিক নালি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। ভিলাই ভাঁজে ভাঁজে থাকায় ইলিয়ামের প্রাচীরগাত্রের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং পরিপাককার্য ব্যাপক ভাবে চলে।

এসব রক্তনালি যুক্ত হয়ে হেপাটিক শিরা গঠন করে। এই শিরা দিয়ে শোষিত রক্ত যকৃতে আসে। স্নেহ পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভিলাসের ল্যাকটিয়ালে শোষিত হয়ে প্রথমে লসিকা দ্বারা বাহিত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে। কোষে অণু প্রবেশের পর পিত্তলবণ ফ্যাটিএসিড থেকে পুনরায় পৃথক হয়ে যায়। কৈশিক নালির মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় নালির প্রাচীর ছুঁয়ে জলীয় পদার্থ বের হয়। এই জলীয় পদার্থকে লসিকা বলে। লসিকা খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে কোষে পৌঁছে দেয় এবং দূষিত পদার্থ সংগ্রহ করে রক্তস্রোতে ফিরে আসে। শোষণের পর পাকমন্ডের অবশিষ্টাংশ কোলনে পৌঁছে।

বৃহদন্ত্রে পরিপাক : কোলনে পাকমন্ডের কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া বা পরিপাক ঘটে না। তবে খাদ্যের অসার অংশের সাথে যে পানি থাকে তা এখানে শোষিত হয়। তাছাড়া থাকে কিছু আমিষ, লিপিড, লবণ এবং উদ্বৃত্ত এনজাইম। এসব

বস্তু থেকে বৃহদন্ত্র লবণ ও পানি শোষণ করে রক্তে স্থানান্তরিত করে। ফলে উচ্ছিষ্ট খাদ্য ঘনীভূত হয়ে মলে পরিণত হয়। এই মল মলাশয়ে জমা থাকে। অবশেষে প্রয়োজনমতো পায়ুপথ দিয়ে বাইরে নির্গত হয়।

আত্তীকরণ : শোষিত খাদ্যবস্তুর প্রোটোপ্লাজমে পরিণত বা রূপান্তরিত করার পদ্ধতি হলো আত্তীকরণ। এটা একটি গঠন মূলক বা উপচিতি প্রক্রিয়া। কোষের প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত এনজাইমের সহযোগিতায় সরল খাদ্য জটিল উপাদানে পরিণত হয়। যেমন– অ্যামাইনো এসিড, গ্লুকোজ, ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারল রক্তের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এসব স্থানের প্লোটোপ্লাজম নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে আমিষ, স্নেহ ও শর্করা তৈরি হয়। ফলে প্রটোপ্লাজম কোষের ক্ষয়পূরণ ও গঠনে সহায়তা করে। ফলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

আন্ত্রিক সমস্যার কারণে কখনও কখনও নিম্নলিখিত রোগ বা শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয় যেমন–

অজীর্ণতা : একে আমরা বদহজমও বলে থাকি। নানা কারণে বদহজম হয় বা হজমে ব্যাঘাত ঘটে। যেমন– পাকস্থলিতে সংক্রমণ, বিষণ্নতা, অগ্ন্যাশয় রোগ, থাইরয়েডের সমস্যা, এনজাইমের ঘাটতি, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

পেটের উপরের দিকে ব্যথা, পেট ফাঁপা, পেট ভরা মনে হয়, বুক জ্বালা করা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, বুক ব্যথা, টক ঢেঁকুর উঠা ইত্যাদি অজীর্ণতার লক্ষণ। পাকস্থলি বা অন্ত্রের আলসারের কারণেও হজমে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

অজীর্ণতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা করতে হবে তা হলো– অতি ভোজন না করা, আস্তে আস্তে উত্তমরূপে খাবার চিবিয়ে খাওয়া, ধূমপান পরিহার করা। প্রয়োজনে অজীর্ণতার কারণ নির্ণয় করে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা।

আমাশয় (Dysentery) : *Entamoeba histolytica* নামক এক প্রকার প্রটোজোয়া অথবা সিগেলা নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে আমাশয় হয়।

ঘন ঘন মল ত্যাগ, মলের সাথে শ্লেষা বের হওয়া, পেটে ব্যথা, অনেক সময় শ্লেষাযুক্ত মলের সাথে রক্ত যাওয়া ও দুগ্ধজাত দ্রব্য হজম না হওয়া আমাশয় রোগের লক্ষণ।

এ রোগ প্রতিকারে যা করতে হবে তা হলো– বিশুদ্ধ পানি পান করা, শাকসবজি ও ফলমূল উত্তমরূপে পানি দিয়ে ধৌত করা, মল ত্যাগের পর হাত সাবান বা ছাই দিয়ে উত্তমরূপে ধৌত করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, খাওয়ার আগে হাত ও থালাবাসন উত্তমরূপে ধুয়ে নেওয়া। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। সময়মতো চিকিৎসা না করা হলে মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে।

কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) : এটি কোনো বিশেষ ধরনের রোগ নয়। যখন কারো শক্ত পায়খানা হয় অথবা আর দু বা তারও বেশি দিন পায়খানা হয়না এ অবস্থাকে বলা হয় কোষ্ঠকাঠিন্য। বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে, যথা– পায়খানার বেগ চেপে রাখলে, কোলন অপাচ্য খাদ্যাংশ থেকে অতিমাত্রায় পানি শোষণ করলে, পৌষ্টি নালির মধ্য দিয়ে খাদ্যের অপাচ্য অংশ ধীরে ধীরে গমনে মল থেকে বেশি পানি শোষিত হলে, পরিশ্রম না করলে, আন্ত্রিক গোলযোগে, কোলনের মাংসপেশি আস্তে আস্তে সংকুচিত হলে, রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাবার না খেলে কোষ্ঠ্যকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে মল ত্যাগ কষ্টদায়ক হয়। ফলে পেটে অস্বস্তিকর অবস্থা, পেট ব্যথা ও নানা রকম আনুষাঙ্গিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

এ রোগ প্রতিকারে যা করতে হবে তা হলো– আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া, প্রচুর পানি পান করা, নিয়মিত শাকসবজি, আপেল,

নারকেল, খেঁজুর, আম, কমলা, পেঁপে, আনারস, চা, কলা ইত্যাদি খাওয়া। নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস করা, হাঁটা চলার অভ্যাস গড়ে তোলা।

গ্যাস্ট্রিক আলসার (Gastric ulcer) : আলসার হলো পাকস্থলির বা অন্ত্রের প্রদাহ বা ক্ষত। দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যগ্রহণে অনিয়ম হলে পাকস্থলিতে অম্লের আধিক্য ঘটে। অনেক দিন ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে পাকস্থলি বা অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তখন একে গ্যাস্ট্রিক আলসার বলে।

এ রোগে পেটের ঠিক মাঝখানে একঘেয়ে ব্যথা অনুভব হয়। খালি পেটে বা অতিরিক্ত তেলজাতীয় খাদ্য খেলে ব্যথা বাড়ে। আলসার মারাত্মক হলে বমি হতে পারে। কখনও কখনও বমি ও মলের সাথে রক্ত নির্গত হয়। এন্ডোসকপি (Endoscopy) বা বেরিয়াম এক্স–রে এর মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

এ রোগ প্রতিকার করতে হলে যা করতে হবে তা হলো– নিয়মিত সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা, অধিক তেল ও মশলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য পরিহার করা। ফুটানো দুধ, পনির এবং কলা খেলে ভালো উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করে, কফি, সিগারেট ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ থেকে বিরত থেকে, প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

অ্যাপেনডিসাইটিস (Appendicitis) : পেটের ডান দিকের নিচে বৃহদন্ত্রের সিকামের সাথে অ্যাপেনডিক্স যুক্ত থাকে। এটি আঙ্গুলের আকারের একটি থলে। অ্যাপেনডিক্সের সংক্রমণের কারণে অ্যাপেনডিসাইটিস হয়। এ রোগে নাভির চারদিকে ব্যথা অনুভব হয় এবং ব্যথা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তা নিচে ডান দিকে সরে যায়। ক্ষুধামন্দা, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

এ রোগের প্রতিকারে রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি ও প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে অ্যাপেনডিক্সের অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। অ্যাপেনডিক্সের সংক্রমণ মারাত্মক হলে এটি ফেটে যেতে পারে এবং রোগীর জন্য মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

কৃমিজনিত রোগ

কৃমি পরজীবী হিসেবে পোষক দেহে বাস করে। মানবদেহ অনেক প্রজাতির কৃমির পোষক। বিশেষ করে মানুষের অন্ত্রে গোলকৃমি, সুতাকৃমি ও ফিতাকৃমি পরজীবী হিসেবে বাস করে। কৃমির কারণে পেটে ব্যথা, দুর্বলবোধ করা, বদহজম, পেটে অস্বস্তিবোধ, বমি বমি ভাব, অনিদ্রা, খাওয়ায় অরুচি, রোগীর চেহারা ফ্যাকাশে হওয়া, রক্তাল্পতা দেখা দেওয়া, হাত পা ফুলে যাওয়া, পেট বড় হয়ে ফুলে উঠা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। শিশুর জ্বর হলে অনেক সময় কৃমি মলের সাথে বা নাক–মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

রোগীর মল পরীক্ষা করে পেটে কৃমি আছে কিনা তা জনা যায়। মল পরীক্ষায় কৃমির ডিম পাওয়া গেলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করতে হয়।

কৃমি আক্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা অথবা মাছি দ্বারা খাদ্যবস্তু দূষিত হয়। দূষিত খাদ্য কৃমি বিস্তারে সহায়তা করে। কাঁচা ফলমূল ধুয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, খাবার আগে হাত উত্তমরূপে ধৌত করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, খালি পায়ে না হাঁটা এবং অল্প সেদ্ধ শাকসবজি বা মাংস না খাওয়া ইত্যাদি সাবধানতা অবলম্বন করে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ডায়রিয়া (Diarrhoea) : যদি দিনে অন্তত তিনবার পাতলা পায়খানা হয় তবে তার ডায়রিয়া হয়েছে বলে মনে করতে হবে। সাধারণত শিশুরা ডায়রিয়ায় বেশি ভোগে। ডায়রিয়া হলে রোগীর দেহ থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়, দেহের পানি কমে যায়, রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে দেহে পানি ও লবণের স্বল্পতা দেখা দেয়। এসময় যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে রোগী মারাও যেতে পারে।

ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়া, বারবার বমি হওয়া, খুব পিপাসা লাগা, মুখ ও জিহবা শুকিয়ে যাওয়া, দেহের চামড়া কুচকে যাওয়া, চোখ বসে যাওয়া ইত্যাদি ডায়রিয়ার উপসর্গ। এসময় রোগী খাবার বা পানীয় ঠিকমতো খেতে চায় না, কাঁদলে শিশুর মাথার চাঁদি বা তালু বসে যায়। আস্তে আস্তে রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

দূষিত পানি পান করলে, বাসি–পচা, নোংরা খাবার খেলে, অপরিচ্ছন্ন থালা–বাসন ব্যবহার করলে, অপরিষ্কার হাতে খাবার খেলে এ রোগ বিস্তার লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ডায়রিয়া রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে। আজকাল বাজারে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক তৈরি খাবার স্যালাইনের প্যাকেট বাজারে পাওয়া যায়। প্যাকেটের গায়ে স্যালাইন বানানোর নিয়ম লেখা থাকে। ঐ নিয়ম অনুযায়ী স্যালাইন বানাতে হবে। তাছাড়া বাড়িতেও স্যালাইন বানানো যায়। তোমরা ইতোপূর্বে বাড়িতে কীভাবে খাবার স্যালাইন তৈরি করা যায় তা জেনেছ। সম্প্রতি শস্য স্যালাইন নামে আর একটি স্যালাইন উদ্ভাবিত হয়েছে। এক লিটার পানি, ৫০ গ্রাম চালের গুঁড়া, এক চিমটি লবণ মিশিয়ে বাড়িতে এ স্যালাইন তৈরি করা যায়। স্যালাইন ব্যবহারের সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার তা হলো– পাতলা পায়খানা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে স্যালাইন খাওয়াতে হবে, রোগীর বমি হলেও স্যালাইন খাওয়া বন্ধ করা যাবে না, শিশু রোগীকে বুকের দুধ খাওয়ানো, রোগীকে নিয়মিত অন্যান্য খাবারও খাওয়াতে হবে। ডায়রিয়া সেরে যাওয়ার পরও অন্তত এক সপ্তাহ রোগীকে বাড়তি খাবার দিতে হবে।

রোটা ভাইরাসের আক্রমণে ডায়রিয়া হয়। বিশ্বব্যাপী রোটা ভাইরাসজনিত মোট মৃত্যুর ৮২ শতাংশ হয় হত–দরিদ্র দেশগুলোতেই। অনেক কারণে এ রোগে দরিদ্র দেশগুলোতে মৃত্যুর হার বেশি। উন্নত দেশগুলোতেও এ রোগের বিস্তার আছে। তবে মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

কাজ : তোমরা দলবদ্ধ হয়ে শ্রেণিকক্ষে খাবার স্যালাইন তৈরি কর। খাবার স্যালাইন খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা লিখে পোস্টার তৈরি কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি কাকে বলে?

২. উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টি কয়টি?

৩. আদর্শ খাদ্যপিরামিড কী?

৪. রক্তশূন্যতার কারণ কী?

৫. রাতকানা রোগ কেন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ দাঁতের গঠন বর্ণনা কর।

২. সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট হিসেবে কাজ করে?

ক. দস্তা খ. লৌহ

গ. বোরন ঘ. পটাসিয়াম

২. ক্লোরোসিস হয়–

i. নাইট্রোজেনের অভাবে

ii. সালফারের ঘাটতিতে

iii. লৌহের অনুপস্থিতিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দিপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

পাঁচ বৎসর বয়সী সানজানা স্কুলে তার বইয়ের সব লেখা বুঝতে পারে। তবে রাতের বেলা পড়তে বসলে সে বইয়ের লেখাগুলো ঠিকমতো দেখতে পায় না।

৩. সানজানার দেহে কোন ভিটামিনের অভাব রয়েছে?

ক. ভিটামিন 'এ' খ. ভিটামিন 'বি'

গ. ভিটামিন 'সি' ঘ. ভিটামিন 'ডি'

৪. সানজানার রোগটি প্রতিরোধে অধিক পরিমাণে খেতে হবে–

i. যকৃত

ii. গাজর

iii. মলা মাছ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ড: রায়হান দিনের অধিকাংশ সময় গবেষণার কাজে গবেষণাগারে সময় কাটান। এতে তার ওজন বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে তার ছোটভাই জহির দেশের জাতীয় যুব ফুটবল দলের একজন নিয়মিত খেলোয়াড়। সেজন্য তাকে প্রতিদিন অনেক সময় ধরে শারীরিক কসরত ও খেলাধুলা করতে হয়।

ক. কোন জাতীয় খাদ্য দেহে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে?

খ. উচ্চমানের আমিষ বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা কর।

গ. জহিরের খাদ্য তালিকায় কোন ধরনের খাবার অধিক থাকা দরকার? কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জহিরের খাদ্য তালিকায় কোন ধরনের খাবার ড: রায়হানের জন্য প্রযোজ্য নয়? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

২. ইরফান আলী লক্ষ করলেন তার বাগানের গাছগুলোর মধ্যে ঘাসজাতীয় গাছের পাতা হলুদ হয়ে গেছে এবং ফুল গাছের পাতা, ফুল ও কুঁড়ি ঝরে যাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে তিনি একজন উদ্যানতত্ত্ববিদের শরণাপন্ন হলেন। তিনি তাকে তার বাগানে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় কিছু উপাদান সরবরাহের পরামর্শ দিলেন।

ক. মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট কী?

খ. উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. ইরফান আলীর বাগানের ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের উদ্যানতত্ত্ববিদের পরামর্শ মূল্যায়ন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবে পরিবহন

পরিবহন জীবদেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা সার্বক্ষণিকভাবেই ঘটে চলেছে। উদ্ভিদে পানি ও খনিজ পরিবহন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, খাদ্য চলাচলও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। মাটি থেকে গৃহীত পানি ও খনিজলবণ মূল থেকে পাতায় পৌঁছানো যেমন গুরুত্বপূর্ণ, পাতায় প্রস্তুত কৃত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবহনও তেমনি অতীব প্রয়োজনীয়। মানবদেহে পরিবহন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের মতো নয়। উদ্ভিদ ও মানবদেহের পরিবহন পদ্ধতি এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

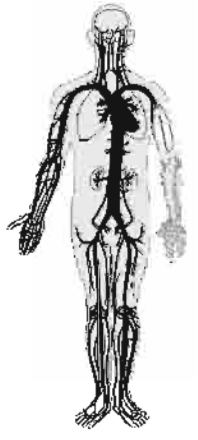

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- উদ্ভিদে পরিবহনের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও পানির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদে পানি ও খনিজ পদার্থ শোষণ প্রক্রিয়া ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণের ফলে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন বর্ণনা করতে পারব।
- উদ্ভিদে পানি ও খনিজ পদার্থ পরিবহন ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রস্বেদনের ধারণা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রস্বেদনের হার নিয়ন্ত্রণে প্রভাবকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রস্বেদন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল তা মূল্যায়ন করতে পারব।
- উদ্ভিদে প্রস্বেদনের পরীক্ষা করতে পারব।
- মানবদেহে সংবহনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত উপাদানের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন গ্রুপের রক্তের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করত পারব।
- রক্ত গ্রুপ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রক্ত নির্বাচন করতে পারব।
- রক্তদানের নিয়মাবলি এবং এর সামাজিক দায়বদ্ধতা বর্ণনা করতে পারব।
- মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব।
- হৃদপিণ্ডের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- হৃদপিণ্ড গঠনগতভাবে যে এর কার্যক্রমের সাথে অভিযোজিত তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্ত সঞ্চালনে রক্তচাপের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আদর্শ রক্তচাপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কোলেস্টরলের প্রকারভেদ, সীমা, উপকারিতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বর্ণনা করতে পারব।
- রক্ত সঞ্চালনে কোলেস্টেরলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্তে অস্বাভাবিকতার কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃদপিণ্ড সম্পর্কিত রোগের লক্ষণ, কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখার উপায় বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিশ্রামরত অবস্থায় এবং শরীরচর্চার পর রক্তচাপ ও পালসরেট পরিমাপ করতে এবং দুই অবস্থানে পরিমাপকৃত রক্তচাপ ও পালসরেট বিশ্লেষণ করতে পারব।
- সঠিকভাবে রক্তচাপ ও পালসরেট করতে পারব।
- হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখার জন্য নিজে সচেতন হব এবং অন্যকে সচেতন করতে পারব।

উদ্ভিদ ও পানির সম্পর্ক

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না। আমরা জানি প্রোটোপ্লাজম জীবদেহের ভৌত ভিত্তি। এই প্রোটোপ্লাজমের শতকরা ৯০ ভাগই পানি। এ কারণেই পানিকে ফ্লুইড অফ লাইফ বলে। পানির পরিমাণ কমে গেলে তাই প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়ে মরে যেতে পারে। এছাড়া উদ্ভিদের দেহে যত বিপাকীয় বিক্রিয়া চলে তা পানির অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। উদ্ভিদদেহে পানির প্রয়োজনীয় দিকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

১। প্রোটোপ্লাজম সজীব রাখতে পানির বিকল্প নেই। একটি সংকুচিত প্রোটোপ্লাজমযুক্ত কোষকে বাঁচাতে চাইলে দেরি না করে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। প্রস্বেদন ও সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চালু রাখতে পরিমাণমতো পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। এজন্যই শুষ্ক মৌসুমে বড় বড় উদ্ভিদেও পানি সেচ দিতে হয়।

৩। পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবক। বিপাকীয় অনেক বিক্রিয়ায় পানির গুরুত্ব অপরিসীম।

৪। উদ্ভিদের কোষ বৃদ্ধি ও চলনে পানির ভূমিকা রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উদ্ভিদ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি কোথায় ও কীভাবে পায়? উদ্ভিদ প্রধানত মূলের মাধ্যমে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। ৩টি প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে শোষণ কাজ সম্পাদন করে। প্রক্রিয়া তিনটি হলো ইমবাইবিশন, ব্যাপন, অভিস্রবণ।

১। **ইমবাইবিশন (Imbibition) :** এক খণ্ড শুকনা কাঠের এক প্রান্ত পানিতে ডুবালে ঐ কাঠের খণ্ডটি কিছু পানি টেনে নেবে। আমরা জানি কলয়েড জাতীয় শুকনা বা আধা শুকনা পদার্থ তরল পদার্থ শুষে নেয়। এ জন্যই কাঠের খণ্ডটি পানি টেনে নিয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে ইমবাইবিশন বলে। সেলুলোজ, স্টার্চ, জিলাটিন ইত্যাদি হাইড্রোফিলিক পানিপ্রিয় পদার্থ। এরা তরল পদার্থের সংস্পর্শে এলে তা শুষে নেয় আবার তরল পদার্থের অভাবে সংকুচিত হয়ে যায়। কোষপ্রাচীর ও প্রোটোপ্লাজম কলয়েডধর্মী হওয়ায় ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে স্ফীত হয়ে উঠে। পানি শোষণের এটি একটি অন্যতম প্রক্রিয়া।

> **কাজ :** ব্যাপন প্রক্রিয়ার পরীক্ষণ।
> **উপকরণ :** একটি ছোট বাটি, আতর বা যে কোনো সুগন্ধী।
> ব্যাপন প্রক্রিয়াটি প্রমাণ করতে আতর বা সুগন্ধী বাটিতে ঢেলে পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা কর।

২। **ব্যাপন (Diffusion) :** ঘরের এক কোণে কিছু সুগন্ধি ঢেলে দিলে তার সুগন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে যায়। কারণ এর ক্ষুদ্র কণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এক গ্লাস পানিতে কিছু চিনি ছেড়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্লাসের পানি মিষ্টি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে চিনির অণু পানিতে ছড়িয়ে পানিকে মিষ্টি স্বাদযুক্ত করে তোলে। এ প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। এটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া (Physical process)। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের অণু বেশি ঘনত্বের এলাকা থেকে কম ঘনত্বের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তাকে ব্যাপন প্রক্রিয়া বলে। একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের বেশি ঘনত্ববিশিষ্ট দ্রবণ হতে কম ঘনত্বের দ্রবণের দিকে দ্রাবকের ব্যাপিত হওয়ার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতাকে ব্যাপন চাপ বলে। একই বায়ু চাপে কোনো একটি দ্রবণ ও দ্রাবকের ব্যাপন চাপের যে পার্থক্য তাকে ব্যাপন চাপ ঘাটতি (Diffusion pressure deficit) বলে। পাতার মেসোফিল টিস্যুতে এই ব্যাপন চাপ ঘাটতির ফলে পানির ঘাটতি আছে এমন কোষ পাশের কোষ থেকে পানি টেনে নেয়। উদ্ভিদের পানি শোষণে ব্যাপনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩। **অভিস্রবণ (Osmosis) :** অভিস্রবণ কী তা কি তোমরা জান? আচ্ছা তোমরা কি খেয়াল করেছ যে মা যখন কিসমিস ভিজিয়ে রাখেন তার কিছুক্ষণ পর চুপসে থাকা কিসমিসগুলো ফুলে টসটসে হয়ে ওঠে। কী করে এসব হয় তা কি ভেবেছ কখনও? ঐ টসটসে কিসমিস যদি পুনরায় ঘন চিনির শরবতে ভিজিয়ে রাখ তাহলে দেখবে আবার ওগুলো চুপসে গেছে। কেন এমন হলো তা কি তোমরা ধারণা করতে পার? এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়াটি জীবন্ত কোষ ছাড়াও কৃত্রিমভাবে ল্যাবরেটরিতেও ঘটানো যায়। যদি দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ যাদের দ্রব ও দ্রাবক একই, একটি বৈষম্য ভেদ্য পর্দা (Selectively permeable membrane) দিয়ে আলাদা করা হয় তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি দ্রবণের ঘনত্ব সমান হয়ে যাবে। একই দ্রব ও দ্রাবকযুক্ত দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি বৈষম্য ভেদ্য পর্দা দ্বারা আলাদা করা হলে, দ্রাবক তার উচ্চ ঘনত্বের দিক থেকে নিম্ন ঘনত্বের দিকে প্রবাহিত হয়। দ্রাবকের বৈষম্য ভেদ্য পর্দা ভেদ করে তার উচ্চ ঘনত্বের দিক থেকে নিম্ন ঘনত্বের দিকে প্রবাহিত হওয়াকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া বলা হয়।

উপকরণ : একখন্ড আলু, ব্লেড, পেট্রিডিস, পানি, চিনি।
কাজ : কোষ থেকে কোষে অভিস্রবণের পরীক্ষণ।
আলু দিয়ে অসমোস্কোপ বানাও। চিনির শরবৎ ঢেলে অভিস্রবণের প্রমাণ দাও।

পানি ও খনিজ লবণ শোষণ : উদ্ভিদে পানি শোষণ ও খনিজ লবণ শোষণ ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় হয়। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা পানি শোষণ বিষয়টি সম্পর্কে আগে জানব।

ক) **পানি শোষণ :** সাধারণভাবে উদ্ভিদ মাটির কৈশিক পানি (Capillary water) তার মূলরোমের মাধ্যমে শোষণ করে। প্রস্বেদনের ফলে পাতার কোষে ব্যাপক চাপ ঘাটতির সৃষ্টি হয়। এর ফলে পাশের কোষ থেকে পানি এই কোষের দিকে ধাবিত হয়। একইভাবে ঐ দ্বিতীয় কোষটিতে আবার ব্যাপন চাপ ঘাটতি সৃষ্টি হয় এবং তার পাশের বা নিচের কোষ থেকে পানি টেনে নেয়। এভাবে ব্যাপক চাপ ঘাটতি ক্রমশ মূলরোম পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং একটি চোষক শক্তির সৃষ্টি হয়। এ চোষক শক্তির টানে মাটির কৈশিক পানি মূলরোমে ঢুকে পড়ে। মাটি থেকে মূলরোমে অভিস্রবণ ও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এ পানি প্রবেশ করে। এভাবে মূলরোম থকে পানি মূলের কর্টেক্সে (Cortex) প্রবেশ করে। এ কাজটিকে কোষ থেকে কোষান্তর অভিস্রবণ (Cell to cell osmosis) পদ্ধতি বলে। একইভাবে পানি অন্তঃত্বক ও পরিচক্র হয়ে পরিবহন নালিকা গুচ্ছে (Vascular bundles) পৌঁছে যায়। পানি একবার পরিবহন কলায় পৌঁছে গেলে তা জাইলেম কলায় মাধ্যমে উপরের দিকে ও পাশের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এভাবে পানি বিভিন্ন শাখা প্রশাখা হয়ে উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছে যায়। এ কাজে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া কাজ করে সেগুলো হলো, অভিস্রবণ ও প্রস্বেদন।

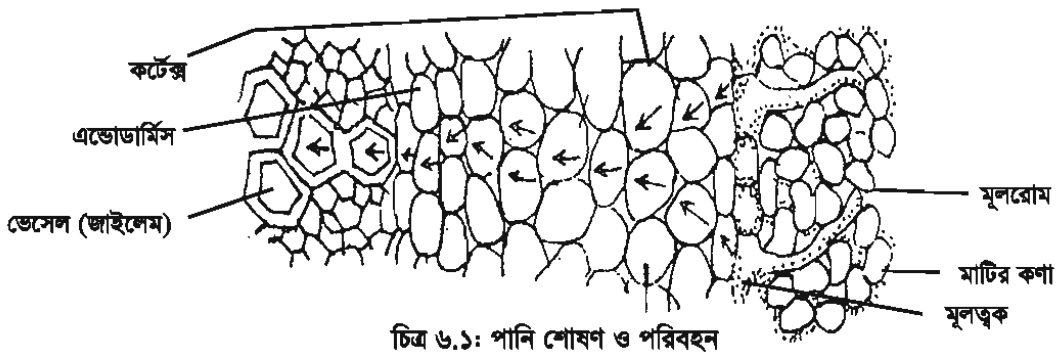

চিত্র ৬.১: পানি শোষণ ও পরিবহন

খ) **খনিজ লবণ শোষণ** : অধিকাংশ উদ্ভিদ পানির সাথে কিছু পরিমাণ খনিজ লবণ শোষণ করে, কিছু লবণ মূলরোম দিয়ে শোষিত হলেও মূলত মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলই শোষণ অঞ্চল হিসেবে কাজ করে। খনিজ লবণ শোষিত হয় আয়ন হিসেবে। শোষণ প্রধানত দুটি উপায়ে হয়ে থাকে। যথা– ১। নিষ্ক্রিয় শোষণ ও ২। সক্রিয় শোষণ।

১। **নিষ্ক্রিয় শোষণ (Passive absorption) :** উদ্ভিদের এ প্রক্রিয়ায় মূলরোম ইমবাইবিশন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পানি শোষণ করে, কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় না।

২। **সক্রিয় শোষণ (Active absorption) :** সক্রিয় শোষণে খনিজ লবণ পরিবহনের জন্য কোষে উৎপন্ন বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয়।

উদ্ভিদে পরিবহন : উদ্ভিদে পরিবহন বলতে মাটি থেকে শোষিত পানি ও খনিজ লবণ এবং পাতায় প্রস্তুত খাদ্যের চলাচলকে বুঝায়।

আমরা জানি জাইলেম ভেসেলের মাধ্যমে পানি ও খনিজ লবণ উদ্ভিদে উপরের দিকে উঠে। প্রস্বেদন টান, কৈষিক শক্তি ও মূলজ চাপের ফলে কোষরস উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছে যায় বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন। এভাবে পাতায় পানি পৌঁছালে সেখানে খাদ্য প্রস্তুত হয়। প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন এলাকায় পরিবহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ফ্লোয়েম টিস্যু। এ খাদ্য ফ্লোয়েমের সিভনলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈব যৌগ ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে বিপরীত দিকে একইসাথে চলাচল করে। উদ্ভিদের নিচের দিকের যৌগগুলো নিচের দিকে, উপরে সংশ্লেষিত যৌগগুলো উপরের দিকে এবং উদ্ভিদের মাঝামাঝি এলাকায় সংশ্লেষিত পদার্থগুলো উপরে বা নিচে যে কোনো দিকে প্রবাহিত হয়।

উদ্ভিদে পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা : পরিবহন অর্থ একস্থান থেকে অন্য স্থানে কোনো পদার্থের স্থানান্তর। পানি ও খনিজ লবণের চলাচলকে উদ্ভিদে পরিবহন বলা হয়। উদ্ভিদে পানি ও খনিজ দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার কথা সব বিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই পানি ও খনিজ পদার্থ উদ্ভিদের কাজে আসতে হলে সেগুলোকে অবশ্যই বিক্রিয়াস্থলে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য পানি ও খনিজের পরিবহন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলরোম দিয়ে পানি ও খনিজ লবণ শোষিত হয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কর্টেক্সের মধ্য দিয়ে জাইলেম ভেসেলে পৌঁছায় এবং প্রস্বেদন স্রোতের সাথে ধীরে ধীরে পাতায় গিয়ে পৌঁছে। সেখানে খাদ্য তৈরি হয়। পাতা থেকে তৈরি খাদ্য ফ্লোয়েমের সিভনল দিয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে যায়। কখনও জাইলেম ভেসেল বা ফ্লোয়েমের সিভনল কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে উদ্ভিদের মৃত্যু অবধারিত। এজন্য বলা যায় উদ্ভিদের পরিবহন উদ্ভিদ জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

পানি ও খনিজ পদার্থের পরিবহন (Translocation of water and minarals)

আমরা ইতোপূর্বে অভিস্রবণ ও প্রস্বেদন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছি। অভিস্রবনের প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে মূল দিয়ে পানি শোষণ করে। মূলরোমের সাহায্যে প্রধানত এ কাজটি হয়। পাশাপাশি উদ্ভিদ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ পুষ্টিও শোষণ করে। অবশ্য খনিজ পুষ্টি শোষণের পদ্ধতি পানি শোষণ পদ্ধতি থেকে আলাদা। এ বিষয়ে উচ্চতর শ্রেণিতে তোমরা বিস্তারিত জানতে পারবে। কোষস্থ পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণকে একত্রে কোষরস (Cell sap) বলে। এবার আমরা কোষরস মূল থেকে উদ্ভিদের সর্বোচ্চ শাখায় ও পাতায় কীভাবে পৌঁছায় তা জানব।

কোষরসের আরোহণ (Ascent of sap) : মূল পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে। এ কোষরস বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে থাকে। একইসাথে কোষরসের পার্শ্ব পরিবহনও চলতে থাকে। কোষরস পরিবহনকে

দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা– ১) মাটিস্থ পানি ও খনিজ লবণসমূহের মূলরোম থেকে মূলের পরিবহন কলায় পৌঁছানো ও ২) মূলের পরিবহন কলা থেকে পাতায় পরিবহন করা। প্রথম ধাপে অভিস্রবণ, ব্যাপন ও প্রস্বেদন টান ইত্যাদি পানিও খনিজ লবণ শোষণ ও পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মূলরোম দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ পদার্থ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোম থেকে পাশের কোষে গমন করে। ঐ কোষ থেকে তা পুনরায় পাশের কোষে যায়। এভাবে কোষ থেকে কোষে পানি ও খনিজ পদার্থ চলতে চলতে একসময় মূলের পরিবহন টিস্যু হয়ে এবং কান্ডের পরিবহন কলা বেয়ে পাতার মেসোফিল কলায় পৌঁছায়।

কাজ : উদ্ভিদে রস উত্তোলন পরীক্ষণ।

উপকরণ : *Peparomia* উদ্ভিদ বোতল, পানি ও স্যাফ্রানিন।

পদ্ধতি : একটি বোতলে কিছু পানি নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা স্যাফ্রানিন নাও। মূলসহ একটি তাজা *Peperonia* উদ্ভিদ এমনভাবে স্থাপন কর যেন মূলগুলো পানিতে ডুবে থাকে। এ অবস্থায় বিকারকে কয়েক ঘণ্টার জন্য রেখে দাও ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল খাতায় লেখ।

সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন

তোমরা আগেই জেনেছ যে উদ্ভিদ অভিস্রবণ পদ্ধতিতে পানিগ্রহণ করে। এ পানি জাইলেম ভেসেলের মাধ্যমে সুউচ্চ বৃক্ষের সর্বোচ্চ স্থানের পাতায়ও পৌঁছে যায়। এই পাতাই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এ পানি ব্যবহার করে। বায়ু থেকে CO_2 গ্রহণ করে পানির সাথে মিশিয়ে আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্ট শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে। এ উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে চলে যায়। উদ্ভিদের প্রতিটি কোষই এ খাদ্য ব্যবহার করে শ্বসন প্রক্রিয়ায় তার বিপাকীয় কাজ চালাতে শক্তির যোগান দেয়। এ কাজের পর যতটুকু খাদ্য অবশিষ্ট থাকে তা উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সঞ্চিত থাকে। গোলআলু (কান্ড), মিষ্টি আলু (মূল), ঘৃতকুমারী (পাতা) এবং বিভিন্ন ফল ও বীজে এ খাদ্য জমা থাকে। আমরা এবার দেখব সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন খাদ্য কীভাবে উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহন (Phloem translocation) : উদ্ভিদের মূল ও পাতা পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করায় খাদ্য চলাচলে একটি দ্রুত ও কার্যকর পরিবহন ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এ কাজটি ফ্লোয়েমের সিভনল করে থাকে। ফ্লোয়েম পরিবহন নালিকাগুচ্ছের অন্যতম গুচ্ছ। আমরা জেনেছি যে পরিবহন কলাগুচ্ছে জাইলেমগুচ্ছ ও ফ্লোয়েমগুচ্ছ থাকে। ফ্লোয়েমগুচ্ছে সিভনল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও বাস্টফাইবার থাকে। সিভনল এক প্রকার কেন্দ্রিকাবিহীন ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত সজীব কোষ। লম্বালম্বিভাবে এরা একটির সাথে অন্যটি যুক্ত হয়ে উদ্ভিদদেহে জালের ন্যায় গঠন সৃষ্টি করে। দুটো কোষের মধ্যবর্তী অনুপ্রস্থ প্রাচীরটি স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হয়ে চালুনির ন্যায় আকার ধারণ করে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সহজেই এক কোষ থেকে অন্য কোষে চলাচল করতে পারে। শীতকালে এ রন্ধ্রগুলো ক্যালোজ নামক রাসায়নিক পদার্থ জমে ছোট হয়, তাই খাদ্য চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। গ্রীষ্মের আগমনে ক্যালোজ গলে যায়, তাই খাদ্য চলাচল বেড়ে যায়।

প্রস্বেদন (Transpiration) : পানি ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। উদ্ভিদ প্রধানত মূল দ্বারা তার প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করে। শোষিত পানির অতি সামান্য অংশ উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলীর জন্য ব্যয় হয়। বাকি অংশ উদ্ভিদ তার বায়বীয় অংশ দ্বারা বাষ্পাকারে বাইরে বের করে দেয়। সাধারণত স্থলজ উদ্ভিদ যে শারীরতত্ত্বীয় প্রক্রিয়ায় তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানি বের করে দেয় তাই প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া। এ কাজটি তার বায়বীয়

অঙ্গের কোনো অংশের মাধ্যমে ঘটে তার ভিত্তিতে এদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা–ত্বকরন্ধ্রীয় প্রস্বেদন, কিউটিকুলার প্রস্বেদন ও লেন্টিকুলার প্রস্বেদন।

১) পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন (Stomatal transpiration) : পাতায়, কচিকাণ্ডে, ফুলের বৃতি ও পাপড়িতে দুটি রক্ষীকোষ বিশিষ্ট এক প্রকার রন্ধ্র থাকে। এদেরকে পত্ররন্ধ্র (Stomata) বালে। কোনো উদ্ভিদের মোট প্রস্বেদনের ৯০–৯৫% প্রসেদন হয় পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে।

২) কিউটিকুলার প্রস্বেদন (Cuticular transpiration) : উদ্ভিদের বহিঃত্বকে বিশেষ করে পাতার উপরে ও নিচে কিউটিনের আবরণ থাকে। এ অবরণকে কিউটিকল বলে। কিউটিকল ভেদ করে কিছু পানি বাষ্পাকারে বাইরে বের হয়। এ প্রক্রিয়াকে কিউটিকুলার প্রস্বেদন বলে।

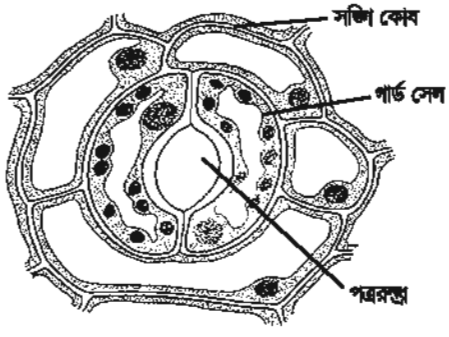

চিত্র– ৬.২: একটি পত্ররন্ধ্র।

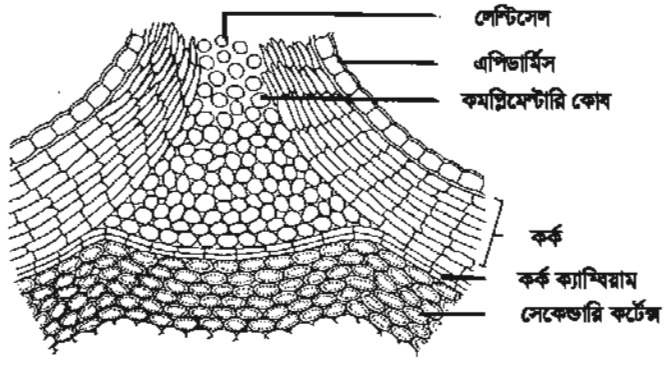

চিত্র–৬.৩: একটি লেন্টিসেল।

৩) লেন্টিকুলার প্রস্বেদন (Lenticular transpiration) : উদ্ভিদে গৌণ বৃদ্ধি হলে কান্ডের বাকল ফেটে লেন্টিসেল নামক ছিদ্র সৃষ্টি হয়। লেন্টিসেলের ভিতরের কোষগুলো আলগাভাবে সজ্জিত থাকে এবং এর মাধ্যমে কিছু পানি বাইরে বেরিয়ে যায়। একে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন বলে।

প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদটি যেমন বাষ্পাকারে অতিরিক্ত পানি মুক্ত করে তেমন এর ফলে সৃষ্ট টানে পানি শোষিত হয়।এ প্রক্রিয়াটি অনেকগুলো প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল। এদের মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা–
ক) বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ ও খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ।

ক) বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ

উদ্ভিদ দেহের বাইরে অবস্থান করে যারা প্রস্বেদনকে প্রভাবিত করে তাদেরকে বাহ্যিক প্রভাবক বলে, যথা–

১। **তাপমাত্রা (Tepmerature) :** তাপমাত্রার তারতম্যের সঙ্গে প্রস্বেদনের হারও ওঠানামা করে। অধিক তাপে পানি সহজেই বাষ্পে পরিণত হতে পারে ফলে প্রস্বেদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ুমন্ডলের জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রস্বেদনের হারও দ্রুততর হয়। তাপমাত্রা কমে গেলে তাই স্বাভাবিক নিয়মেই প্রস্বেদনের হারও কমে যায়।

২। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative humidity) :** বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ও বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতার আনুপাতিক হারকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। কোনো একটি এলাকার বায়ুমন্ডলে অধিক জলীয়বাষ্প থাকা সত্ত্বেও অধিক ধারণ ক্ষমতার জন্য তা শুষ্ক হতে পারে। আবার কম জলীয়বাষ্প থাকা সত্ত্বেও বায়ুমন্ডলের কম ধারণ

ক্ষমতার জন্য এটি সিক্ত হতে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে বায়ু অসম্পৃক্ত থাকে ও জলীয়বাষ্প গ্রহণ করতে পারে কিন্তু অধিক হলে বায়ু সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায় এবং বেশি থাকলে হার কমে যায়।

৩। **আলো (Light) :** আলোর উপস্থিতিতে ত্বকরন্ধ্র খুলে যায়, ফলে প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অন্ধকারে ত্বকরন্ধ্র বন্ধ থাকায় এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। আলোর তারতম্যের জন্য ত্বকরন্ধ্রের আকারেও হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটে। ফলে প্রস্বেদনের হারও ওঠানামা করে। আলো উদ্ভিদদেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমেও প্রস্বেদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

৪। **বায়ুপ্রবাহ (Wind) :** প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদের চারদিকের বায়ু সিক্ত হয়ে ওঠে, ফলে এই প্রক্রিয়ার হার কমতে থাকে। যখন বায়ুপ্রবাহ সম্পৃক্ত বায়ু দূরে সরিয়ে দেয় তখন এই হার আবার বৃদ্ধি পায়। বায়ু প্রবাহের ফলে পত্রসমূহ আন্দোলিত হয় ও ত্বকরন্ধ্রে চাপ পড়ে। ফলে অধিক হারে জলীয়বাষ্প রন্ধ্র পথে বের হয়। এ সব কারণে বায়ু প্রবাহের তারতম্যে প্রস্বেদন হারেরও তারতম্য ঘটে। বায়ুচাপ বৃদ্ধিতে বাষ্পীয়ভবন ক্রিয়া হ্রাস পায়, ফলে প্রস্বেদন কমে যায়। আবার বায়ুচাপ কমে গেলে বাষ্পীয়ভবন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়।

খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ

১। **ত্বকরন্ধ্র :** ত্বকরন্ধ্রের সংখ্যা, আয়তন, গঠন ও অবস্থানের উপর প্রস্বেদন হারে তারতম্য ঘটে।

২। **পত্রের সংখ্যা :** পত্রের সংখ্যা, আয়তন, গঠন ও অবস্থানের উপর প্রস্বেদন হারে তারতম্য লক্ষ করা যায়।

৩। **পত্রফলকের আয়তন :** পত্রফলকের আয়তন বড় হলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। একইভাবে এ আয়তন কমে গেলে প্রস্বেদনের হারও কমে যায়।

৪। **উদ্ভিদের বায়ব অঙ্গের আয়তন :** পাতা ও কাণ্ডসহ উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের কলেবর বৃদ্ধি পেলে প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়।

এছাড়া কিউটিকলের উপস্থিতি, স্পনজি প্যারেনকাইমার পরিমাণ ইত্যাদিও প্রস্বেদন হারের তারতম্য ঘটায়।

কাজ : প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ যে পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় তা পরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণ কর।

উপকরণ : এ পরীক্ষার জন্য দরকার হবে টবসহ একটি সতেজ উদ্ভিদ, একটি কাচের বেলজার বা বড় ও সরু সেলোফেন ব্যাগ, সুতা বা ক্লিপ এবং পরিমাণমতো কিছু পানি।

পদ্ধতি : প্রথমেই টবসহ গাছটিকে টেবিলের উপর বসিয়ে দিতে হবে এবং টবে পরিমাণমতো পানি ঢেলে দিতে হবে। এবার কিছু পাতাসহ একটি শাখাকে সেলোফেন ব্যাগ দিয়ে মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে বা ক্লিপ দিয়ে আটকে অথবা বেলজার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ভিতরের বাষ্প বের হতে বা বাইরের বাতাস ঢুকতে না পারে। এ অবস্থায় টবটি এক ঘণ্টা রেখে দিতে হবে।

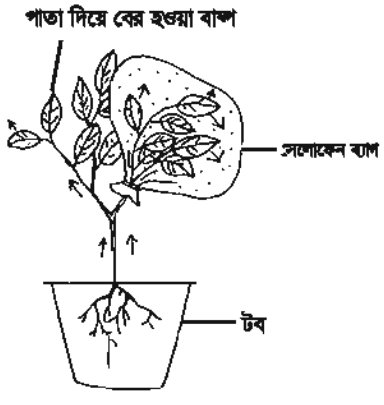

চিত্র–৬.৪ : প্রস্বেদনের পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ : এক ঘণ্টা পর দেখা যাবে যে, সেলোফেন ব্যাগের ভিতরের গায়ে পানির ফোঁটা জমে আছে এবং পুরো ব্যাগটি অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। কেন এমন হলো তা কি তোমরা বুঝতে পারছ?

সিদ্ধান্ত : যেহেতু সেলোফেন ব্যাগে অন্য কোনো পানি ঢোকার সুযোগ ছিল না তাই ঐ পানির কণাগুলো যে পাতা থেকেই বেরিয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এতে প্রমাণিত হলো যে, উদ্ভিদ তার বায়বীয় অঙ্গ দ্বারা পানি বাষ্পাকারে দেহের বাইরে বের করে দেয়।

সতর্কতা :

১) টবের উদ্ভিদটি অবশ্যই সতেজ হতে হবে।

২) সেলোফেন ব্যাগের মুখ ভালোভাবে বেঁধে বায়ু নিরোধী করতে হবে।

প্রস্বেদন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল (Transpiration is a necessary evil)

প্রস্বেদনের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্তমানে সকল বিজ্ঞানীই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন বলে মনে করা হয়। যেকোনো সজীব উদ্ভিদ কোষের বিপাকীয় কার্যক্রম এ প্রক্রিয়ার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রস্বেদনের ফলে জাইলেম বাহিকায় টান পড়ে যাকে প্রস্বেদন টান বলে। এই টানের ফলে উদ্ভিদের মূলরোম পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে এবং শোষিত পানি ও খনিজ লবণ পাতায় পরিবাহিত হয়। এ টানের ঘাটতি হলে পানি শোষণ কমে যাবে এবং খাদ্য প্রস্তুতসহ অনেক বিপাকীয় কার্যক্রম শ্লথ হয়ে যাবে। প্রস্বেদনের ফলে পাতার মেসোফিলে ব্যাপন চাপ ঘাটতি সৃষ্টি হয় যা পানি শোষণে সাহায্য করে। উদ্ভিদ প্রস্বেদনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পত্রফলক কর্তৃক শোষিত তাপশক্তি হ্রাস করে পাতার কোষগুলোর তাপমাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখে।

অন্যদিকে, গুরুত্বপূর্ণ এই প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের বহু ধরনের উপকার করলেও কিছু অপকারী ভূমিকাও এর রয়েছে। যেমন– পানি শোষণের চেয়ে প্রস্বেদনে পানি হারানোর হার অধিক হলে তা উদ্ভিদের জন্য পানি ও খনিজের ঘাটতি দেখা দেবে। এর ফলে উদ্ভিদটির মৃত্যুও হতে পারে। মাটিতে পানির ঘাটতি থাকলে শোষণ কম হবে কিন্তু প্রস্বেদন পূর্বের ন্যায় চলতে থাকবে। এ অবস্থাকে ঠেকাতে প্রকৃতি শীত মৌসুমে বহু উদ্ভিদের পাতা ঝরিয়ে দেয়। প্রস্বেদনের অভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাপন চাপ ঘাটতি হবে না, ফলে অভিস্রবণ কম হবে।

এমতাবস্থায় বলা যায় প্রস্বেদন কিছু ক্ষতিসাধন করলেও এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি কার্যক্রম। বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যের জন্য বিজ্ঞানী কার্টিস প্রস্বেদনকে 'প্রয়োজনীয় ক্ষতি' (Necessary evil) নামে অভিহিত করেছেন।

মানবদেহে সংবহন : রক্ত জীবনীশক্তির মূল। রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্ত দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং কোষে অক্সিজেন ও খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে। ফলে দেহের সব কোষ সজীব ও সক্রিয় থাকে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত প্রতিনিয়ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ এবং অংশে চলাচল করে তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। এ তন্ত্রে প্রবাহিত রক্তের মাধ্যমেই খাদ্য, অক্সিজেন এবং রক্তের বর্জ্য পদার্থ দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয়।

মানবদেহে রক্তপ্রবাহ কেবল হৃদপিণ্ড এবং রক্তনালিসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কখনও বাইরে আসে না। এ ধরনের সংবহনতন্ত্রকে বন্ধ সংবহনতন্ত্র (Close circulatory system) বলা হয়। সারাদেহে রক্ত একবার সম্পূর্ণ পরিভ্রমণের জন্য মাত্র এক মিনিট বা তার চেয়েও কম সময় লাগে। বন্ধ সংবহনতন্ত্রের বড় সুবিধা হলো এ ব্যবস্থায়, ১) রক্ত সরাসরি দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গিয়ে পৌঁছে, ২) রক্তবাহী নালির ব্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো বিশেষ অঙ্গে রক্ত প্রবাহের পরিমাণ দেহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ৩) রক্ত বিভিন্ন অঙ্গে পরিভ্রমণ করে দ্রুত হৃদপিণ্ডে ফিরে আসে।

অন্যান্য তন্ত্রের তুলনায় রক্ত সংবহনতন্ত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলেও এর গঠনশৈলী মোটামুটি সাধারণ। এ তন্ত্রকে সাধারণত দুটি অংশে ভাগ করা হয়। যথা– ১. রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood Circulatory system) : হৃদপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালি নিয়ে গঠিত এবং ২. লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system) : লসিকা, লসিকানালি ও ল্যাকটিয়েলনালি নিয়ে গঠিত।

রক্ত (Blood)

তোমরা নিশ্চয় গরু, ছাগল ও মুরগি জবাই করতে দেখেছ। জবাই করার স্থান থেকে ফিন্‌কি দিয়ে লাল রঙের যে তরল পদার্থ বের হয় তাই রক্ত। এটি একটি অস্বচ্ছ, তরল পদার্থ। রক্ত হৃদপিণ্ড, শিরা, উপশিরা, ধমনি, শাখা ধমনি ও কৈশিকনালি পথে আবর্তিত হয়। লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে রক্তের রঙ লাল দেখায়। এটি ক্ষারধর্মী, লবণাক্ত স্বাদযুক্ত পদার্থ। হাড়ের লাল অস্থিমজ্জাতে রক্তকণিকার জন্ম।

রক্তের উপাদান

রক্ত এক প্রকার তরল যোজক কলা রক্ত, রক্তরস ও কয়েক প্রকার রক্তকণিকার সমন্বয়ে গঠিত।

রক্তরস (Plasma) : রক্তের বর্ণহীন তরল অংশকে রক্তরস বলে। সাধারণত রক্তের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ রক্তরস। রক্তরসের প্রধান উপাদান পানি। এছাড়া বাকি অংশে কিছু আমিষ, জৈবযৌগ ও সামান্য অজৈব লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এর মধ্যে যে পদার্থগুলো বিদ্যমান তা হলো–

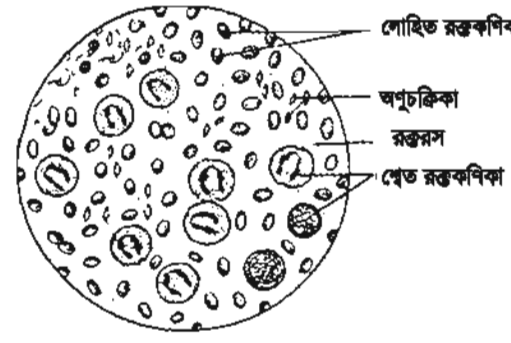

চিত্র ৬.৫: রক্তের উপাদান

১. আমিষ, যথা– অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন এবং ফাইব্রিনোজেন। ২. গ্লুকোজ, ৩. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্বিকণা ৪. খনিজ লবণ, ৫. ভিটামিন, ৬. হরমোন, ৭. এন্টিবডি এবং ৮. বর্জ্যপদার্থ যেমন– কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি। এছাড়া সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ও অ্যামাইনো এসিড সামান্য পরিমাণে থাকে। আমরা যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি তা পরিপাক হয়ে অন্ত্রের গাত্রে শোষিত হয় ও রক্তরসে মিশে যায় এবং দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়। পুষ্টিকর দ্রব্যাদি দেহকোষগুলো গ্রহণ করে দেহের পুষ্টি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করে।

রক্তকণিকা (Blood corpuscles)

মানবদেহে তিন প্রকার রক্তকণিকা দেখা যায়, ১) লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood Corpuscles), ২) শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Corpuscles) এবং ৩) অণুচক্রিকা (Blood Platelets)।

১) লোহিত রক্তকণিকা : মানবদেহে তিন প্রকার রক্তকণিকার মধ্যে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং শ্বাসকার্যে অক্সিজেন পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না, দেখতে অনেকটা বৃত্তের মতো দ্বি–অবতল। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে প্রায় ৫০ লক্ষ। শ্বেত রক্তকণিকার চেয়ে প্রায় ৫০০ গুণ বেশি। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা কম থাকে। তুলনামূলকভাবে শিশুদের দেহে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ বেশি থাকে। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হয়, আবার সমপরিমাণে তৈরিও হয়।

লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন, অক্সিহিমোগ্লোবিনরূপে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন করে।

হিমোগ্লোবিন : হিমোগ্লোবিন এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ। লোহিত রক্তকণিকায় এর উপস্থিতির কারণে রক্ত লাল দেখায়। রক্তে উপযুক্ত পরিমাণ হিমোগ্লোবিন না থাকলে রক্তাল্পতা বা রক্তশূন্যতা (Anemia) দেখা দেয়। বাংলাদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী এ রোগে ভুগে। এ রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে সুষম খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

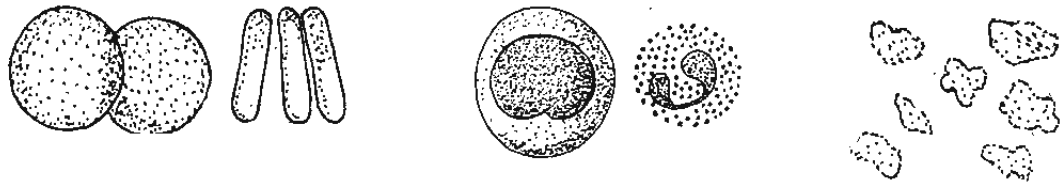

লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা অণুচক্রিকা

চিত্র ৬.৬: বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

২) শ্বেত রক্তকণিকা : মানুষের রক্তে কয়েক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। এদের আকার অনিয়মিত, বড় ও সংখ্যায় লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে অনেক কম। প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে ৫–১০ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। লাল অস্থিমজ্জা ও লসিকাগ্রন্থিতে শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি হয়। এদের রং নেই, কিন্তু নিউক্লিয়াস আছে। শ্বেত রক্তকণিকা আকার বদলাতে পারে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। শ্বেত রক্তকণিকা ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে রোগজীবাণু ভক্ষণ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম ফ্যাগোসাইটোসিস। মৃত শ্বেত রক্তকণিকা পুঁজে পরিণত হয়। রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অতিমাত্রায় বেড়ে গেলে লিউকোমিয়া রোগ হয়। শ্বেত রক্তকণিকা দেহে প্রহরীর মতো কাজ করে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ধ্বংস করে এবং অ্যান্টিবডি তৈরি করে।

৩) অণুচক্রিকা : অণুচক্রিকা আকারে ছোট, বর্তুলাকার ও বর্ণহীন। এরা গুচ্ছাকারে থাকে। প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার অণুচক্রিকা থাকে। অস্থিমজ্জার মধ্যে অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়। অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। কোনো রক্তবাহী নালির ক্ষতি হলে এরা অনতিবিলম্বে থ্রোম্বোপ্লাস্টিন নামক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য নিঃসরণ করে। যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। রক্তে উপযুক্ত পরিমাণ অণুচক্রিকা না থাকলে রক্তপাত সহজে বন্ধ হয় না। ফলে অনেক সময় রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকে।

কাজ : নিচের ছকটি খাতায় আঁক ও পূরণ কর।

লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে পার্থক্য :

বৈশিষ্ট্য	লোহিত রক্তকণিকা	শ্বেত রক্তকণিকা
১. নিউক্লিয়াস		
২. আকার		
৩. হিমোগ্লোবিন		
৪. সংখ্যা		
৫. কাজ		

রক্তের কাজ

রক্ত দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি দেহের নানাবিধ কাজ করে, যেমন–

১. **অক্সিজেন পরিবহন :** লোহিত রক্তকণিকা অক্সিহিমোগ্লোবিনরূপে কোষে অক্সিজেন পরিবহন করে।

২. **কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারণ :** রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোষগুলোতে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় রক্তরস সোডিয়াম বাই কার্বনেটরূপে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে এবং নিঃশ্বাস বায়ুর সাথে ফুসফুসের সাহায্যে দেহের বাইরে বের করে দেয়।

৩. **খাদ্যসার পরিবহন :** রক্তরস গ্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড, চর্বিকণা ইত্যাদি কোষে সরবরাহ করে।

৪. **তাপের সমতা রক্ষা :** দেহের মধ্যে অনবরত দহনক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে। এতে করে বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন মাত্রার তাপ সৃষ্টি হয় এবং তা রক্তের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে দেহের সর্বত্র তাপের সমতা রক্ষা হয়।

৫. **বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন :** রক্ত দেহের সব ধরনের দূষিত ও বর্জ্য পদার্থ বহন করে এবং বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে সেসব ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে নিষ্কাশন করে।

৬. **হরমোন পরিবহন :** হরমোন নালিবিহীন গ্রন্থিতে তৈরি এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বা রস। এই রস সরাসরি রক্তে মিশে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত হয় এবং বিভিন্ন জৈবিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. **রোগ প্রতিরোধ :** কয়েক প্রকারের শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দেহকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এন্টিবডি ও এন্টিজেন উৎপাদনের মাধ্যমে রক্ত দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৮. **রক্ত জমাট বাঁধা :** দেহের কোনো অংশ কেঁটে গেলে অনুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং দেহের রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

ব্লাড গ্রুপ বা রক্তের গ্রুপ

একজন আশঙ্কাজনক বা মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্তের প্রয়োজন, তার রক্তের গ্রুপ 'বি' পজেটিভ। তোমরা এ রকম বিজ্ঞাপন প্রায়শই টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাও। রক্তের গ্রুপ বা ব্লাড গ্রুপ কী? কেনইবা ব্লাড গ্রুপ জানা প্রয়োজন? অসংখ্য পরীক্ষা–নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন ব্যক্তির লোহিত রক্ত কণিকায় 'A' এবং 'B' নামক দুই ধরনের এন্টিজেন (Antigens) থাকে এবং রক্তরসে 'a' ও 'b' দুই ধরনের এন্টিবডি (antibodies) থাকে। এই এন্টিজেন ও এন্টিবডির উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা যায়। একে ব্লাড গ্রুপ বলে। বিজ্ঞানী কার্লল্যান্ড স্টেইনার ১৯০১ সালে মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করে তা 'A', 'B' 'O' এবং 'AB' এ চারটি গ্রুপের নামকরণ করেন। আজীবন একজন মানুষের রক্তের গ্রুপ একই রকম থাকে, পরিবর্তন হয় না।

নিচের সারণিতে রক্তের গ্রুপের এন্টিবডি ও এন্টিজেনের উপস্থিতি দেখানো হলো–

রক্তের গ্রুপ	এন্টিজেন (লোহিত রক্তকণিকায়)	এন্টিবডি (রক্তরসে)
A	A	b
B	B	a
A B	A, B	নেই
O	নাই	a, b

আমরা উপরের সারণিতে রক্তে বিভিন্ন এন্টিজেন ও এন্টিবডির উপস্থিতি দেখেছি। এর ভিত্তিতে আমরা ব্লাড গ্রুপকে এভাবে বর্ণনা করতে পারি। যেমন–

১. A গ্রুপ : এ শ্রেণির রক্তে A এন্টিজেন ও b এন্টিবডি থাকে।

২. B গ্রুপ : এ শ্রেণির রক্তে B এন্টিজেন ও a এন্টিবডি থাকে।

৩. A, B গ্রুপ : এই শ্রেণির রক্তে A ও B এন্টিজেন থাকে এবং কোনো এন্টিবডি থাকে না।

৪. O গ্রুপ : এ শ্রেণির রক্তে কোনো এন্টিজেন থাকে না কিন্তু a ও b এন্টিবডি থাকে।

সারণি : মানুষের রক্তে গ্রুপ অনুযায়ী দাতা ও গ্রহীতার তালিকা–

রক্তের গ্রুপ	যে গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A	A, A B	A ও O
B	B, A B	B ও O
A B	A B	সব গ্রুপ
O	A, B, AB, O	O

উপরের সারণিটি লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে O গ্রুপের রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তি সব গ্রুপের রক্তের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারে। এদের বলা হয় সর্বজনীন রক্তদাতা (Universal donor)। A B রক্তধারী ব্যক্তি যেকোনো ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করতে পারেন। তাই তাকে সর্বজনীন রক্তগ্রহীতা (Universal receipient) বলা হয়।

রক্তদান ও সামাজিক দায়বদ্ধতা : আঘাত, দুর্ঘটনা, শল্যচিকিৎসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হলে দেহে রক্তের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য ঐ ব্যক্তির দেহে রক্ত সংযোজনের প্রয়োজন হয়। জরুরি ভিত্তিতে এই রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য রোগীর দেহে অন্য মানুষের রক্ত দিতে হয়। অন্যকে রক্তদান করা বর্তমানে একটি সাধারণ ঘটনা। জরুরি অবস্থায় অন্য ব্যক্তির রক্ত সরাসরি বা ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা রক্ত রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। কোনো ব্যক্তির শিরার মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে অন্যের রক্ত প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকে রক্ত সংযোজন (Blood transfusion) বলে। এটি একটি চমৎকার ফলপ্রদ ব্যবস্থা, যার ফলে রোগীর প্রাণ রক্ষা হয়। তবে কোনো অবস্থাতেই রোগীর রক্তের গ্রুপ ও প্রকৃতি পরীক্ষা না করে রোগীর দেহে অন্য কোনো ব্যক্তির বা ব্লাড ব্যাংকে রক্ষিত রক্ত প্রবেশ করানো উচিত নয়। ব্যতিক্রম হলে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়ে রোগীর জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। যেমন– রক্তকণিকাগুলোর জমাট বাঁধা, বিশ্লিষ্ট হওয়া, জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব ও প্রস্রাবের সাথে হিমোগ্লোবিন নির্গত হওয়া ইত্যাদি।

আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হয়। মনে রাখতে হবে এটি আমাদের সবার জন্য একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা। যেহেতু রক্তের কোনো বিকল্প নেই, তাই এরূপ অবস্থায় অনেক সময় প্রচুর রক্তের প্রয়োজন হয় এবং অন্যের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে ঐ জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে হয়। এরূপ জরুরি পরিস্থিতিতে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।

রক্ত সঞ্চালনের আগে রোগীর রক্তের শুধু গ্রুপই নয়, রক্তের রেসার্স ফ্যাক্টর (Rh-factor) ও রোগ–জীবাণুর উপস্থিতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। রোগীর জীবন সংকটাপন্ন অবস্থায় রক্ত সঞ্চালন করতে হলে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ জানা না থাকলে O এবং Rh^- নেগেটিভ রক্ত সঞ্চালন করা অধিক নিরাপদ।

অন্যকে রক্তদান করা একটি মহৎ কাজ। এতে রক্তদাতার নিজের কোনো ক্ষতি হয় না। একজন সুস্থ মানুষের দেহ থেকে ৪৫০ মি.লি রক্ত বের করে দিলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। তার দেহ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ লক্ষ লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি করতে পারে। দেখা গেছে কোনো সুস্থ ব্যক্তি চার মাস অন্তর রক্তদান করলে দাতার দেহে সামান্যতম কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয় না।

বর্তমানে রক্তদানে উদ্বুদ্ধকরণে নানা রকম কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। যেমন– কোনো বিশেষ দিবসে বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন। এতে জনসাধারণের মাঝে রক্তদান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও ভীতি অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। অতীতের তুলনায় মানুষ এখন রক্তদান ও গ্রহণ সম্পর্কে অধিক আগ্রহী ও সচেতন।

হৃদপিন্ডের গঠন ও কাজ

হৃৎপিন্ড বক্ষ গহ্বরের বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার ফাঁপা অঙ্গ। এটি হৃদপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। হৃদপিন্ড পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। হৃদপিন্ড প্রাচীরে থাকে তিনটি স্তর, যথা– ১. বহিঃস্তর বা এপিকার্ডিয়াম ২. মধ্যস্তর বা মায়োকার্ডিয়াম ও ৩. অন্তঃস্তর বা এন্ডোকার্ডিয়াম।

বহিঃস্তর (Epicardium) : এটি মূলত যোজক কলা দিয়ে গঠিত। এই স্তরটিতে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি থাকে ও আবরণী কলা দিয়ে আবৃত।

মধ্যস্তর (Myocardium) : এটি বহিঃস্তর ও অন্তঃস্তরের মাঝখানে অবস্থান করে। দৃঢ় অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা এ স্তর গঠিত।

অন্তঃস্তর (Endocardium) : এটি সবচেয়ে ভিতরের স্তর। হৃদপিন্ডের প্রকোষ্ঠগুলো অন্তঃস্তর দ্বারা আবৃত। এই স্তরটি হৃদপিন্ডের কপাটিকাগুলোকেও আবৃত করে রাখে। হৃদপিন্ডের ভিতরের স্তর ফাঁপা এবং চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটি নিচের প্রকোষ্ঠ দুটির চেয়ে আকারে ছোট। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান ও বাম অলিন্দ (right & left auricle) বলে এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান ও বাম নিলয় (right & left ventricle) বলে। অলিন্দদ্বয়ের প্রাচীর তুলনামূলকভাবে পাতলা, আর নিলয়ের প্রাচীর পুরু। অলিন্দ ও

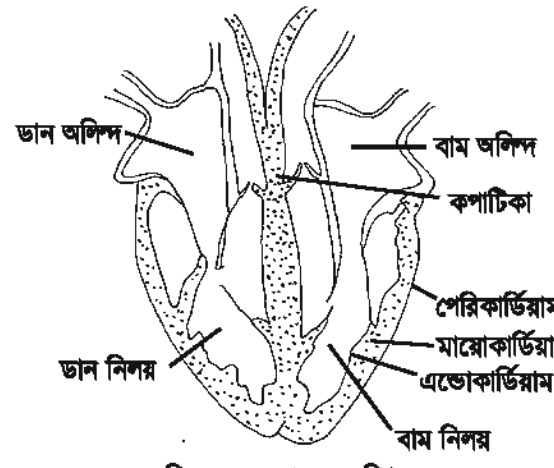

চিত্র ৬.৭ : মানব হৃদপিন্ড

নিলয় যথাক্রমে আন্তঃঅলিন্দ পর্দা ও আন্তঃনিলীয় পর্দা দ্বারা পরস্পর পৃথক থাকে।

হৃদপিন্ডের উভয় অলিন্দ ও নিলয়ের মাঝে যে ছিদ্র পথ আছে তা খোলা বা বন্ধ করার জন্য ভালভ (Valve) বা কপাটিকা থাকে। ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিদ্রপথে তিন পাল্লাবিশিষ্ট ট্রাইকাসপিড ভালভ দ্বারা সুরক্ষিত। অনুরূপভাবে বাম অলিন্দ ও বাম নিলয় দুই পাল্লাবিশিষ্ট বাইকাসপিড ভালভ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। মহাধমনি ও ফুসফুসীয় ধমনির মুখে অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা থাকে। এদের অবস্থানের ফলে পাম্প করা রক্ত একই দিকে চলে এবং এক ফোঁটা রক্তও উল্টো দিকে ফিরে আসতে পারে না।

হৃদপিন্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি

আমরা আগেই জেনেছি যে, হৃদপিন্ড একটি পাম্পের ন্যায় কাজ করে। হৃদপিন্ডের সংকোচন ও শ্লথন বা প্রসারণ দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়। হৃদপিন্ডের অবিরাম সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সংবহন পদ্ধতি অব্যাহত থাকে। হৃদপিন্ডের সংকোচনকে বলা হয় সিস্টোল ও প্রসারণকে বলা হয় ডায়াস্টোল। হৃদপিন্ডের একবার সিস্টোল–ডায়াস্টোলকে একত্রে হৃদস্পন্দন (Heart beat) বলে।

চিত্র ৬.৮: হৃদপিন্ডের অন্তর্গঠন ও রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি

অলিন্দদ্বয় প্রসারিত হলে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃদপিন্ডে প্রবেশ করে। যেমন– ঊর্ধ্ব মহাশিরার কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। ঠিক একই সময় ফুসফুসীয় বা পালমোনারি শিরার মাধ্যমে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে।

অলিন্দদ্বয়ের সংকোচনের ফলে নিলয়দ্বয়ের পেশি প্রসারিত হয়। ফলে ডান অলিন্দ–নিলয়ের ছিদ্রপথের ট্রাইকাসপিড ভালভ খুলে যায় এবং ডান অলিন্দ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। ঠিক একই সময়ে বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের বাইকাসপিড ভালভ খুলে যায় এবং বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এর পরপরই ছিদ্রগুলোর কপাটিকা দ্বারা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নিলয় থেকে রক্ত পুনরায় অলিন্দে প্রবেশ করতে পারে না।

যখন নিলয়দ্বয় প্রসারিত হয় তখন ডান নিলয় থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। এখানে রক্ত পরিশোধিত হয়। ঠিক একই সময়ে বাম নিলয় থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত মহাধমনির মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত পরিবাহিত হয় এবং উভয় ধমনির অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রক্ত পুনরায় নিলয়ে ফিরে আসতে পারে না। এভাবে হৃদপিন্ডে পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

হৃদপিন্ডের কাজ : রক্ত সংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হৃদপিন্ড। এর সাহায্যেই সংবহন তন্ত্রের রক্ত প্রবাহ সচল থাকে। মানব হৃদপিন্ড চার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, তাই সংবহনতন্ত্রে উঁচু ধরনের প্রকোষ্ঠগুলো সম্পূর্ণ বিভক্ত থাকায় এখানে অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনবিহীন রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে থাকে না।

রক্তবাহিকা : যেসব নালির ভেতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত বা সঞ্চালিত হয় তাকে রক্তনালি বা রক্তবাহিকা বলে। এসব নালিপথে হৃদপিন্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরায় হৃৎপিন্ডে ফিরে

আসে। গঠন, আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা বা রক্তনালি তিন ধরনের। যথা– ১. ধমনি, ২. শিরা ও ৩. কৈশিক জালিকা।

১. ধমনি (Artery) : যেসব রক্তনালির মাধ্যমে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃদপিন্ড থেকে সারা দেহে বাহিত হয় তাকে ধমনি বলে। ফুসফুসীয় ধমনি এর ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমধর্মী ধমনি হৃদপিন্ড থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসে পৌঁছে দেয়।

ধমনির প্রাচীর তিন স্তরবিশিষ্ট : ১. টিউনিকা এক্সটার্না (Tunica externa) যা তন্তুময় যোজক কলা দিয়ে তৈরি। ২. বৃত্তাকার অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে তৈরি মাঝের স্তর টিউনিকা মিডিয়া (Tunica media)।

৩. টিউনিকা ইন্টারনা (Tunica interna) নামক ভিতরের স্তরটি সরল আবরণী কলা দিয়ে তৈরি। ধমনির প্রাচীর পুরু ও স্থিতিস্থাপক। ধমনিতে কপাটিকা থাকে না, এর নালিপথ সরু। হৃদপিন্ডের প্রত্যেক সংকোচনের ফলে দেহে ছোট বড় সব ধমনিতে রক্ত তরঙ্গের ন্যায় প্রবাহিত হয়। এতে ধমনিগাত্র সংকোচিত বা প্রসারিত হয়। ধমনির এই স্ফীতি ও সংকোচনকে নাড়িস্পন্দন বলে। ধমনির ভিতর রক্ত প্রবাহ, ধমনিগাত্রের সংকোচন, প্রসারণ ও স্থিতিস্থাপকতা নাড়িস্পন্দনের প্রধান কারণ। হাতের কবজির উপর হাত রেখে নাড়িস্পন্দন অনুভব করা যায়।

> **কাজ :** তুমি তোমার বন্ধু, ভাই, বোনের প্রতি মিনিটের নাড়িস্পন্দন গণনা কর। দৌড়ে আসার পর পুনরায় তোমার বন্ধুর নাড়িস্পন্দন গণনা কর। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কী? কেন এমন হলো তা ব্যাখ্যা কর।

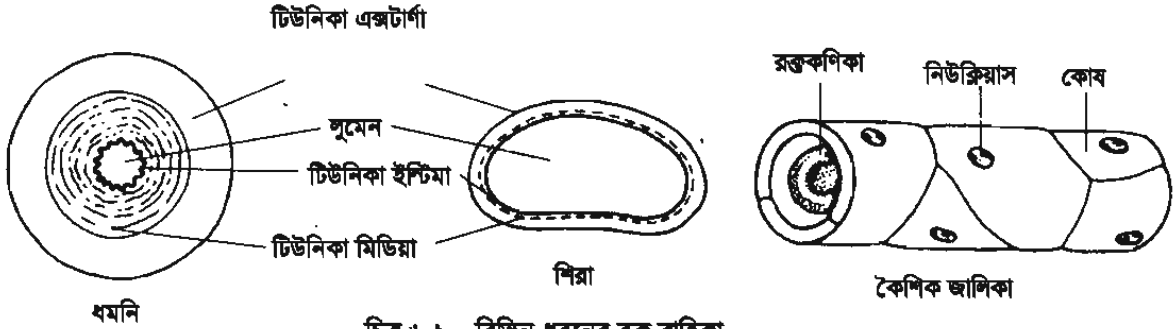

চিত্র ৬.৯ : বিভিন্ন ধরনের রক্ত বাহিকা

কৈশিক জালিকা (Capillaries) : পেশিতন্তুতে চুলের মতো অতি সূক্ষ্ম রক্তনালি দেখা যায়। একে কৈশিক জালিকা বা কৈশিক নালি বলে। এগুলো একদিকে ক্ষুদ্রতম ধমনি ও অন্যদিকে ক্ষুদ্রতম শিরার মধ্যে সংযোগ সাধন করে। ফলে ধমনি শাখা–প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর কৈশিক নালিতে পরিণত হয় এবং প্রত্যেকটি কোষকে পরিবেষ্টন করে রাখে। এদের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা। এই পাতলা প্রাচীর ভেদ করে রক্তে দ্রবীভূত সব বস্তু কোষে প্রবেশ করে।

শিরা (Veins) : যেসব নালি দিয়ে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃদপিন্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে। এরা ধমনির মতোই সারা দেহে ছড়িয়ে থাকে। শিরাগুলো সাধারণত দেহের বিভিন্ন স্থানের কৈশিকনালি থেকে আরম্ভ হয় এবং এ রকম অসংখ্য নালি একত্রে সূক্ষ্ম শিরা, উপশিরা, অতঃপর শিরা ও মহাশিরায় পরিণত হয়ে হৃদপিন্ডে ফিরে আসে। শিরার প্রাচীর ধমনির মতো তিন স্তরবিশিষ্ট। শিরার প্রাচীর কম পুরু, কম স্থিতিস্থাপক ও কম পেশিময়। এদের নালিপথ একটু চওড়া ও কপাটিকা থাকে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সব শিরা কার্বন ডাইঅক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে হৃদপিন্ডে নিয়ে আসে।

কাজ : ধমনি ও শিরার মধ্যে পার্থক্য কর		
বৈশিষ্ট্য	ধমনি	শিরা
১. উৎপত্তি ও সমাপ্তি		
২. রক্ত প্রবাহের দিক		
৩. রক্তের প্রকৃতি		
৪. প্রাচীর		
৫. ভিতরের নালিপথ		
৬. কপাটিকা		
৭. অবস্থান		
৮. রক্তচাপ		

রক্তচাপ (Blood Pressure)

রক্ত প্রবাহের সময় ধমনিগাত্রে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে। হৃদপিন্ডের সংকোচন বা সিস্টোল অবস্থায় ধমনিগাত্রে রক্তচাপের মাত্রা সর্বাধিক থাকে। একে সিস্টোলিক চাপ (Systolic Pressure) বলে। হৃদপিন্ডের (প্রকৃতপক্ষে নিলয়ের) প্রসারণ বা ডায়াস্টোল অবস্থায় রক্তচাপ সবচেয়ে কম থাকে। একে ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic Pressure) বলে। স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ মাপা যায়। এই যন্ত্র দ্বারা ডায়াস্টোলিক ও সিস্টোলিক চাপ দেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় একজন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তির সিস্টোলিক বা সংকোচন রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ১০০–১৫০ মিলিমিটার এবং ডায়াস্টোলিক বা প্রসারণ চাপ পারদ স্তম্ভের ৬৫–৯০ মিলিমিটার।

আদর্শ রক্তচাপ : চিকিৎসকদের মতে পরিণত বয়সে একজন মানুষের আদর্শ রক্তচাপ (Blood pressure) সাধারণত ১২০/৮০ মানের কাছাকাছি। রক্তচাপকে দুটি সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়। একটি উচ্চমান অন্যটি নিম্নমান। রক্তের উচ্চ চাপকে সিস্টোলিক (Systolic) চাপ বলে যার আদর্শ মান ১২০ বা এর কিছু নিচে। নিম্নচাপকে ডায়াস্টোলিক (Diastolic) চাপ বলে। এই চাপটির আদর্শ মান ৮০ বা এর নিচে। এই চাপটি হৃদপিন্ডের দুটি বিটের মাঝামাঝি সময় রক্তনালিতে সৃষ্টি হয়। দুধরনের রক্তচাপের পার্থক্যকে ধমনিঘাত বা নাড়ীঘাত চাপ (Pulse pressure) বলা হয়। সাধারণত সুস্থ অবস্থায় হাতের কব্জীতে পাল্‌স–এর মান প্রতি মিনিটে ৭০। হাতের কব্জিতে হালকা করে চাপ দিয়ে ধরে পালস রেট বের করা যায়। বিপি যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের চাপ নির্ণয় করা হয়।

উচ্চ রক্তচাপ (High blood pressure or hypertension) : উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক হিসেবে গণ্য করা হয়। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০২০ সালের মধ্যে স্ট্রোক ও করোনারি ধমনির রোগ হবে বিশ্বের এক নম্বর মরণব্যাধি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়বে মহামারী আকারে। হৃদরোগ ও স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ হলো উচ্চ রক্তচাপ।

উচ্চ রক্তচাপ কী? রক্ত চলাচলের সময় রক্তনালি গাত্রে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে। আর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তচাপকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সিস্টোলিক চাপ ১২০ এবং ডায়াস্টলিক চাপ ৮০ বা এর নিচের মাত্রাকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রা হিসেবে ধরা হয়। আর এই রক্তচাপ যখন মাত্রাতিরিক্ত হয় তখনই আমরা তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে থাকি।

যে সব কারণে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকি থাকে : বাবা বা মায়ের উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তার সন্তানদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এছাড়াও যারা স্নায়ুবিক চাপে (Tension) বেশি ভোগেন অথবা ধূমপানের অভ্যাস থাকলে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দেহের ওজন বেশি বেড়ে গেলে কিংবা খাদ্যে লবণ ও চর্বিযুক্ত উপাদান বেশি খেলে এমনকি পরিবারের সদস্যদের ডায়াবেটিস বা কোলেস্টেরোলের পূর্ব ইতিহাস থাকলে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়। সন্তান প্রসবের সময় খিঁচুনী রোগের (Eclamsia) কারণে মায়ের উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়।

উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ : মাথা ব্যথা, বিশেষ করে মাথার পেছন দিকে ব্যথা করা প্রাথমিক লক্ষণ। এছাড়াও রোগী মাথা ঘোরা, ঘাড় ব্যথা করা, বুক ধড়ফড় করা ও দুর্বল বোধ করে। অনেক সময় রোগীর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীর সুনিদ্রা হয় না এবং অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠে।

রক্তচাপ নির্ণয় করা : রক্তচাপ মাপক যন্ত্র দিয়ে রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়। রক্তচাপ মাপার শুরুতে রোগীকে কয়েক মিনিট নিরিবিলি পরিবেশে শান্তভাবে সোজা হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। রক্তচাপ মাপার সময় কমপক্ষে দুইবার ১ থেকে ২ মিনিট ব্যবধান রেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা ভালো।

উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকার : উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকারে টাটকা ফল ও শাক–সবজি খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রেখে শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম করা প্রয়োজন। চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ছাড়াও খাবারের সময় অতিরিক্ত লবণ না খাওয়া এবং কাঁচা লবণ খাওয়া সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা দরকার। ধূমপান ত্যাগ করা জরুরি।

কাজ : রক্তচাপ মাপার কৌশল আয়ত্ত করে তোমার বন্ধুদের রক্তচাপ নিচের ছকে উপস্থাপন কর।

শিক্ষার্থীর নাম	রক্তচাপ (সিস্টোল/ডায়াস্টোল)	মন্তব্য

কর্মতৎপরতা, স্বাস্থ্য, বয়স এবং রোগের কারণে মানুষের রক্তচাপের মাত্রা কমবেশি হতে পারে। মোটা লোকদের ওজন কমানো, চর্বিজাতীয় খাদ্য কম খাওয়া, খাবারে কম লবণ দেওয়া ইত্যাদি নিয়মগুলো মেনে চললে উচ্চ রক্তচাপ এড়ানো যায়। রক্তচাপ খুব বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ঔষধ সেবন করা উচিত।

কোলেস্টেরোল

কোলেস্টেরোল (Cholesterol) : কোলেস্টেরোল হাইড্রোকার্বন কোলেস্টেইন (Cholestane) থেকে উৎপন্ন একটি যৌগ। একটি উচ্চশ্রেণির প্রাণিজ কোষের এটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোলেস্টেরোল লিপোপ্রোটিন নামক যৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তে প্রবাহিত হয়। তিন প্রকার লিপোপ্রোটিন দেখা যায়। একটিকে এলডিএল বা LDL (Low Density

Lipoprotein) বলা হয়। অনেকে একে খারাপ কোলেস্টেরোল বলে থাকে। সাধারণত আমাদের রক্তে ৭০% LDL থাকে। ব্যক্তি বিশেষে এই পরিমাণের পার্থক্য দেখা যায়। রক্তে এইচডিএল বা HDL (High Density Lipoprotein) কে সাধারণত ভালো কোলেস্টেরোল বলা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন HDL হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। শরীরিক বৃদ্ধিতে HDL LDL-এর ঠিক উল্টো কাজ করে থাকে।

তৃতীয় ধরনের লিপোপ্রোটিনকে ট্রাই–গ্লিসারাইড (Triglyceride) বলা হয়। এই কোলেস্টেরোল আমাদের খাদ্যে এবং শরীরে চর্বি হিসেবে থাকে। এ কারণে রক্তের প্লাজমায় এরা অবস্থান করে। রক্তের চর্বিকে ট্রাই–গ্লিসারাইড ও কোলেস্টেরোল মিলিত এক যৌগ হিসেবে দেখা হয়। ট্রাই–গ্লিসারাইড আমাদের খাদ্যের প্রাণীজ চর্বি অথবা কার্বোহাইড্রেট থেকে তৈরি হয়ে থাকে। নিম্নের সারণিতে রক্তে কোলেস্টেরোলের আদর্শ মান দেখান হলো।

কোলেস্টেরোলের প্রকার	পুরুষের মান গ্রাম/ডেসি লিটারে	মহিলাদের মান গ্রাম/ডেসি লিটারে
LDL	১.৬৮– ৪.৫৩	১.৬৮– ৪.৫৩
HDL	০.৯০– ১.৪৫	০.৯০– ১.৬৮
ট্রাই–গ্লিসারাইড	০.৪৫– ১.৮১	০.৪০– ১.৫৩

অধিক মাত্রার কেলেস্টেরোল উপস্থিত এমন খাদ্যের মধ্যে মাখন, চিংড়ি, ঝিনুক, গবাদিপশুর যকৃত, ডিম, বিশেষ করে ডিমের কুসুম উল্লেখযোগ্য।

রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরোলের সমস্যা

রক্তে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরোল থাকলে বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়। অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস (Atherosclerosis) অবস্থা সৃষ্টি হবার ফলে ধমনিতে রক্ত চলাচলের জায়গা কমে যায়। করোনারি হৃদরোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। হৃদপিন্ডের ক্রিয়াকলাপের ব্যাঘাত ঘটে যখন কোলেস্টেরোল জমাট বেঁধে ধমনির রক্তপ্রবাহে বাধা দেয়। ফলে রক্তে অক্সিজেনের অভাবে হৃদযন্ত্রের পেশি নষ্ট হয়ে যায়। হৃদপিন্ডের রক্ত চলাচল কমে যাবার ফলে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। এই অবস্থাকে অ্যানজিনা (Angina) বলা হয়। যখন মস্তিষ্কের কোনো অংশের শিরা বা ধমনি ছিড়ে যাওয়ার কারণে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সে অবস্থাকে স্ট্রোক (Stroke) বলে। এ অবস্থায় মস্তিষ্কের স্নায়ু মারা যেতে থাকে। ফলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

কোলেস্টেরোলের কাজ– উপকারিতা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি

কোলেস্টেরোল কোষপ্রাচীর তৈরি ও রক্ষার কাজ করে। প্রতিটি কোষের ভেদ্যতা (Permeability) নির্ণয় করে বিভিন্ন দ্রব্যাদি কোষে প্রবেশ বা বাধা প্রদান করে। মানবদেহের জনন হরমোন এনড্রোজেন ও ইস্ট্রোজেন তৈরিতে সাহায্য করে। অ্যাডরেনাল গ্রন্থির হরমোন তৈরিতে কোলেস্টেরোল ব্যবহৃত হয়। কোলেস্টেরোল পিত্ত তৈরি করে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে চামড়ায় কোলেস্টেরোল থেকে ভিটামিন 'ডি' তৈরি হয়। শরীরে ফ্যাট দ্রবণীর ভিটামিন যেমন, ভিটামিন–এ, ডি, ই ও কে বিপাকে কোলেস্টেরোল প্রয়োজন হয়। স্নায়ুকোষের কার্যকারিতার জন্যে কোলেস্টেরোল প্রয়োজন। দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে কোলেস্টেরোল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

গবেষণায় এখন প্রমাণিত যে রক্তে উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরোল হৃদপিন্ড এবং রক্ত সংবহনের বিশৃঙ্খলার সাথে জড়িত। পিত্তের অন্যতম উপাদান হলেও এটি একটি বর্জ্য পদার্থ এবং যকৃতের মাধ্যমে দেহ থেকে অপসারিত হয়। পিত্তে

কোলেস্টেরোলের মাত্রা বেড়ে গেলে তা তলানির মতো পিত্ত থলিতে জমা হয়। কোলেস্টেরোলের এ তলানিই শক্ত হয়ে পিত্তথলির পাথর (Gall bladder stone) নামে পরিচিত হয়। ম্যালেরিয়া, বহুমূত্র, সিফিলিস প্রভৃতি রোগে এবং অ্যালকোহল, কার্বন মনোক্সাইড, ফসফরাস ইত্যাদির বিষক্রিয়ায় যকৃতে লিপিডের পরিমাণ ২০–৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। এই অবস্থাকে মেদবহুল যকৃৎ (Fatty liver) বলা হয়।

রক্তের অস্বাভাবিকতা –লিউকেমিয়া (Leukemia)

একজন সুস্থ মানুষের শরীরে তিন ধরনের রক্তকোষ থাকে। রক্তের লাল কোষগুলি লোহিত রক্তকণিকা, যা শরীরে অক্সিজেন সরবরাহের কাজ করে। শ্বেত রক্তকণিকা বাইরে থেকে কোনো বস্তু বা জীবাণু রক্তে প্রবেশ করলে অতি সহজেই তা ধ্বংস করে। অণুচক্রিকা রক্তবাহী নালির ক্ষতি হলে রক্ত জমাট বাঁধায় সাহায্য করে। রক্ত কণিকাগুলো মানব শরীরের অস্থিমজ্জায় তৈরি হয়।

রক্তকোষের ক্যানসারকে লিউকেমিয়া (Leukemia) বলে। লিউকেমিয়া হলে দেহের অস্থিমজ্জা থেকে অস্বাভাবিক মাত্রায় শ্বেত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। ফলে হৃদযন্ত্রের সমস্যা, শ্বাস গ্রহণে কষ্ট বা বুকে ব্যথা, নাক থেকে রক্ত পড়া, চামড়ায় ঘা তৈরি, হাত ও পায়ের জোড়ায় ব্যথা ও ফুলে উঠা, হাত বা পা কাঁপতে থাকা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। মানুষের কয়েক ধরনের লিউকেমিয়া দেখা যায়। অনেক সময় এ রোগ দ্রুত বৃদ্ধির ফলে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

রক্ত সংবহনতন্ত্রের কয়েকটি রোগ ও প্রতিকার

হার্ট অ্যাটাক

যখন কারও হৃদযন্ত্রের কোনো অংশ রক্ত জমাট বাঁধার কারণে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বাঁধাগ্রস্থ হয়, এতে হৃদপিন্ডের কোষ কিংবা হৃদপেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে মায়োকারডিয়াল ইনফ্রাকশন অথবা করোনারী থ্রোমবসিস নামে **হার্ট** অ্যাটাক ঘটে। বাংলাদেশে হৃদরোগ বিশেষ করে করোনারি (Coronary) হৃদরোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। হৃৎপিন্ড রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও খাবারের সারবস্তু অর্থাৎ পুষ্টিকর পদার্থ রক্তনালির মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয়। নিজের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য অর্থাৎ তার মাংসপেশির শক্তি অর্জনের জন্য হৃদপিন্ডের তিনটি প্রধান রক্তনালি আছে। এগুলোর মধ্যে অনেক সময় চর্বি জমে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলে প্রাণঘাতী রোগ হার্ট অ্যাটাক হয়। বর্তমান সময়ে হার্ট অ্যাটাকে শুধু ৪০–৬০ বছর বয়সী লোকেরাই আক্রান্ত হচ্ছে না, অনেক ক্ষেত্রে ১৮ বছরের তরুণরাও এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

এ রোগের কারণগুলোর মধ্যে দেহের ওজন বেড়ে যাওয়া প্রধান। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস যেমন অধিক তেলযুক্ত খাবার (বিরানি, তেহারি ইত্যাদি), ফাস্টফুড (বার্গার, বিফ বা চিকেন প্যাটিস ইত্যাদি) খাওয়া, অলস জীবনযাপন এবং শারীরিক পরিশ্রম না করার ফলে এই রোগ দেখা যায়। তদুপরি সর্বদা হতাশা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিমর্ষ থাকায় যেকোনো বয়সে এই রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

রোগের লক্ষণসমূহ : হার্ট অ্যাটাক হলে বুকে অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হয়। বিশেষ করে বুকের মাঝখানে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করা যা প্রাথমিকভাবে এন্টাসিড জাতীয় ঔষধ খেলেও কমবে না। ব্যথা বাঁ দিকে বা সারা বুকে ছড়িয়ে যেতে পারে। ব্যথা অনেক সময় গলা ও বাম হাতে ছড়িয়ে যায়। রোগী প্রচন্ডভাবে ঘামতে থাকে ও বুকে ভারি চাপ অনুভব করছে বলে মত প্রকাশ করে।

প্রতিকার : এমন অবস্থা দেখা দিলে অবহেলা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইসিজি করিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ দেওয়া দরকার।

করোনারি হৃদরোগ এক মারাত্মক হৃদরোগ। এ রোগ থেকে বাঁচতে হলে নিচে কিছু নিয়ম মেনে চলা দরকার, যাতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যেমন– ধূমপান না করা ও নিয়মিত ব্যায়াম করা বা হাঁটা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা, কাঁচা ফল ও শাকসবজি বেশি বেশি খাওয়া। চর্বিযুক্ত খাবার না খাওয়া, ভাজা খাবার, মশলাযুক্ত খাবার, ফাস্টফুড খাওয়া বাদ দেওয়া।

হৃদপিন্ডকে সুস্থ রাখার উপায়

মানুষ পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হবার আগে থেকেই তার হৃদযন্ত্র কাজ করা শুরু করে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট গতিতে চলতে থাকে। মানুষের বাঁচামরায় হৃদযন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখার জন্য সঠিক জীবনধারা (Life Style) ও খাদ্য নির্বাচনের প্রয়োজন রয়েছে। নানা ধরনের তেল বা চর্বি জাতীয় খাদ্য হৃদযন্ত্রের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। রক্তের কোলেস্টেরোল হৃদপিন্ডের রক্তনালিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে থাকে।

মাদক ও নেশা সেবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বা হৃদস্পন্দন সাধারণ মানের থেকে বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদকসেবী কিছুটা মানসিক আনন্দ ও প্রশান্তি পেলেও তার হৃদযন্ত্রের প্রভূত ক্ষতি হয়। ধূমপান অথবা জর্দার নিকোটিনের বিষক্রিয়া শরীরের অন্য অংশের মতো হৃদপেশির ক্ষতি করে। সঠিক খাদ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সুস্থ থাকা যায়। মেদ সৃষ্টিকারী খাদ্য যেমন তেল, চর্বি, অতিরিক্ত শর্করা, সুষম খাদ্য গ্রহণ ও পরিহার করে, প্রতিদিন পরিমিত ব্যায়াম এবং হাঁটা–চলার মাধ্যমে সুস্থ জীবন লাভ করা যায়।

বাতজ্বর (Rheumatic Fever)

স্ট্রেপটোকক্কাস (Streptococcus) অণুজীবের সংক্রমণে সৃষ্ট শ্বাসনালির প্রদাহ, ফুসকুড়িযুক্ত সংক্রামক জ্বর, টনসিলের প্রদাহ অথবা মধ্যকর্ণের সংক্রামক রোগ বাতজ্বরের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সাধারণত শিশুকালেই এ রোগের আক্রমণ শুরু হয় এবং দেহের অনেক অঙ্গপ্রতঙ্গ আক্রান্ত হয়, বিশেষ করে হৃদপিন্ড। হৃদপিন্ড যদি এ রোগে পূর্ণভাবে আক্রান্ত নাও হয়, হৃদপেশি এবং হৃদপিন্ডের কপাটিকা বা ভালভ অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে হৃৎপিন্ড যথাযথভাবে রক্ত পাম্প করতে সক্ষম হয় না এবং দেহে রক্ত প্রবাহের পরিমাণ কমে যায়।

অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা এ রোগ সহজে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন। পরে রোগের প্রকোপ বেড়ে গেলে ওজন হ্রাস, এনিমিয়া, ক্লান্তি, ক্ষুধামন্দা, চেহারায় ফ্যাকাশে ভাব ইত্যাদি দেখা দেয় এবং রোগের উপস্থিতি বুঝা যায়। পরবর্তী সময়ে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, ফুলে যাওয়া এবং ত্বকে লালচে রঙ দেখা দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ শনাক্ত করা গেলে পেনিসিলিন জাতীয় (Penicillin) ঔষধ যথাযথভাবে প্রয়োগে এ রোগের সংক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অনেক চিকিৎসক আক্রান্ত ছেলেমেয়েদের প্রাপ্ত বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পেনিসিলিন খাবার পরামর্শ দেন।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রস্বেদন কী?

২. ব্যাপণ কাকে বলে?

৩. রক্তকণিকা কত প্রকার ও কি কি?

৪. ধমনির কাজ কী?

৫. রক্তচাপ বলতে কী বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. হৃদপিন্ড সুস্থ রাখার উপায় বণনা কর।

২. চিত্রসহ পানি শোষণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হৃদপিন্ডকে আবৃতকারী পর্দার নাম কী?

ক. এপিকার্ডিয়াম খ. মায়োকার্ডিয়াম

গ. পেরিকার্ডিয়াম ঘ. এন্ডোকার্ডিয়াম

২. আরাফাত পায়েস খাওয়ার সময় টসটসে কিসমিস দেখতে পেল। এক্ষেত্রে কিসমিস টসটসে হওয়ার কারণ কী?

ক. ব্যাপন খ. শোষণ

গ. অভিস্রবণ ঘ. ইমবাইবিশন

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাম	রক্তের গ্রুপ
রাফিন	A
তামিম	B
তাসমিয়া	AB
রাতুল	O

৩. রাফিনের রক্তের প্রয়োজন হলে কার নিকট থেকে রক্ত নিতে পারবে?

ক. তামিম খ. তাসমিয়া

গ. রাতুল ঘ. তামিম ও রাতুল

৪. তাসমিয়া–

i. রক্তে A, B এন্টিজেন বহন করে

ii. রাফিনকে রক্ত দান করতে পারবে

iii. তামিমের রক্ত গ্রহণ করতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

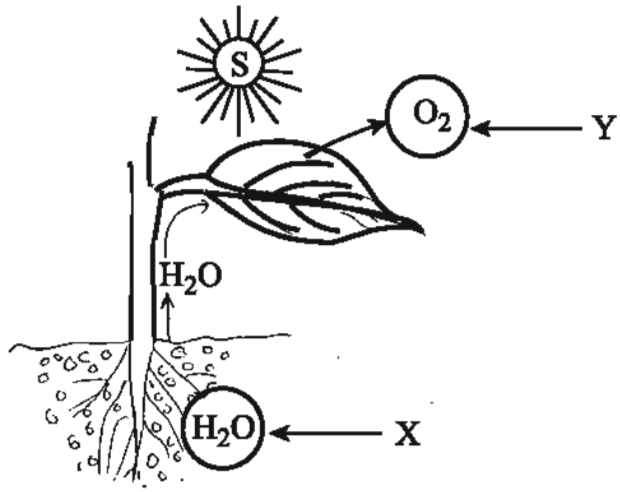

ক. সংলগ্নতা কী?

খ. ইমবাইবিশন বলতে কী বুঝ?

গ. S উপাদানটির অনুপস্থিতি প্রক্রিয়াটিতেতে কীরূপ প্রভাব পড়বে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. X উপাদানটি যদি Y অঞ্চলে না পৌঁছায় তাহলে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কী সমস্যা দেখা দিবে বিশ্লেষণ কর।

২. হাসান সাবেরের বয়স ৫০। তিনি একটি আর্থিক ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি মাথাব্যথা, বুক ধড়ফড় এবং অস্থিরতা ভাব অনুভব করছেন। অন্যদিকে তার ৭ বছর বয়সী মেয়ে মুনের গিটে ব্যাথা, ফুলে যাওয়া, ত্বকে লালচে ভাব দেখা যাচ্ছে। তারা দুজন ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

ক. রক্ত কী?

খ. শ্বেতকণিকা কীভাবে দেহকে রক্ষা করে? বুঝিয়ে লেখ।

গ. হাসান সাহেবের সমস্যাগুলোর কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা দুটির মধ্যে কোনটি অনিরাময়যোগ্য যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

গ্যাসীয় বিনিময়

কিছু ব্যাতিক্রম ব্যতীত সব জীবদেহে গ্যাসীয় আদান প্রদান ঘটে। গ্যাসীয় বিনিময় জীবের একটি শারীরবৃত্তীয় কাজ। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া ভিন্নতর। উদ্ভিদ ও মানব দেহের গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

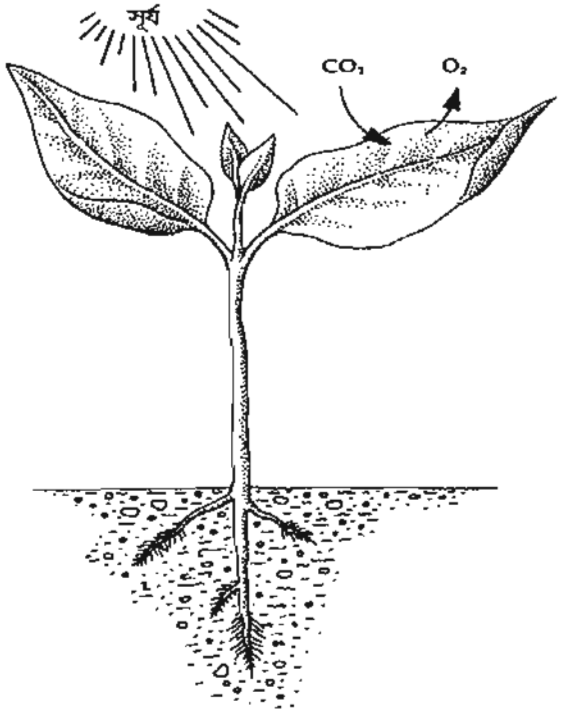

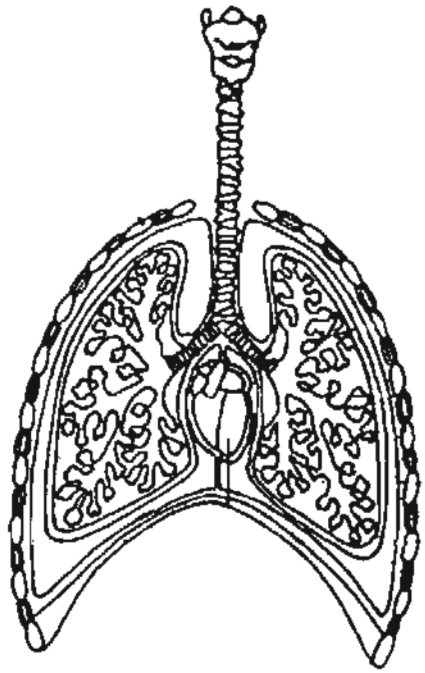

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- উদ্ভিদে গ্যাসীয় বিনিময়ের ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানুষের শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ফুসফুসের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- মানুষের শ্বাস–প্রশ্বাস প্রক্রিয়া ও গ্যাসীয় বিনিময় বর্ণনা করতে পারব।
- শ্বসনতন্ত্রের রোগ লক্ষণ, কারণ, প্রতিরোধ, প্রতিকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসটির প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারব।
- ফুসফুসের চিত্র অংকন করে চিহ্নিত করতে পারব
- শ্বসনতন্ত্রের রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।

উদ্ভিদে গ্যাস বিনিময়

আমরা জানি যে উদ্ভিদের জীবনে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) ও শ্বসন (Respiration) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রক্রিয়া। মূলত এই দুটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদে গ্যাস বিনিময় ঘটে। এই প্রক্রিয়া দুটি সংঘটিত হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। উদ্ভিদ শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য (Physiological activities) পরিবেশ থেকে বিভিন্ন গ্যাস সংগ্রহ করে। বিক্রিয়া শেষে অন্য একটি গ্যাস বাইরের পরিবেশে বের করে দেয়। উদ্ভিদে প্রাণীর মতো শ্বাস নেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ অঙ্গ নেই। তবে পত্রের স্টোমাটা ও পরিণত কাণ্ডের বাকলে লেন্টিসেল এর মাধ্যমে অক্সিজেন (Oxygen), কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide) ও অন্যান্য গ্যাসের বিনিময় ঘটে। উদ্ভিদে প্রাণীর মতো ঘন ঘন অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড এর আদানপ্রদান হয় না। দিনের বেলা বা পর্যাপ্ত আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণের হার অধিক হয়। সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত অক্সিজেন গ্যাসের কিছু অংশ শ্বসন প্রক্রিয়ায় ব্যয় হয়। আবার শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের কিছু অংশ সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়, তাই আদান-প্রদানকৃত অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ প্রায় সমান।

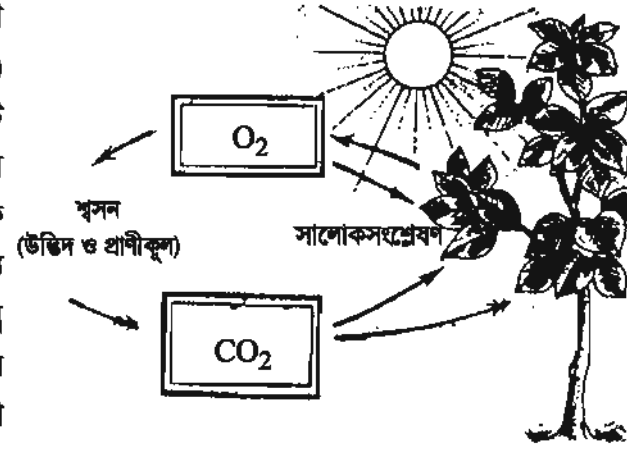

চিত্র ৬.১ ঃ উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়

রাতের বেলা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে তাই অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় না। অন্যদিকে দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা শ্বসন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়, ফলে শ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের উৎপাদন চলতে থাকে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাতার স্টোমাটার মাধ্যমে পরিবেশে বের হয়ে যায়। পরিণত কাণ্ডের বাকলে যে লেন্টিসেল (Lenticell) তৈরি হয় তার মাধ্যমেও এসব গ্যাসের বিনিময় ঘটে। এ জন্য বড় গাছের নিচে রাত্রিবেলা ঘুমালে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

উদ্ভিদ তার পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় গ্যাস সংগ্রহ করে। পাতা যেমন বায়ু থেকে অক্সিজেন,কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস সংগ্রহ করে তেমনি মূলও মাটিস্থ পানি থেকে প্রয়োজনীয় গ্যাস সংগ্রহ করে। এভাবে উদ্ভিদ দেহে গ্যাস বিনিময় চলতে থাকে।

মানব শ্বসনতন্ত্র

অক্সিজেন জীবন ধারণের অপরিহার্য উপাদান। কোনো প্রাণীই অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। মানবদেহে বায়ুর সাথে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে ও তা রক্তের মাধ্যমে দেহের সব অঙ্গে পৌঁছায়। দেহকোষে পরিপাককৃত খাদ্যের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটে। ফলে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। এই তাপ দেহকে উষ্ণ রাখে ও প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়।

অক্সিজেন ও খাদ্য উপাদানের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। রক্ত এ উপাদানগুলোকে ফুসফুসে নিয়ে যায়। সেখানে অক্সিজেন শোষিত হয় ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্কাশন করা হয় তাকে শ্বাসকার্য বলে। যে জৈবিক প্রক্রিয়া প্রাণীদেহের খাদ্যবস্তুকে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে জারিত করে মজুদ শক্তিকে ব্যবহার যোগ্য শক্তিতে রূপান্তর এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্কাশন করে

তাকে শ্বসন বলে। দেহের ভিতর গ্যাসীয় আদান প্রদান একবার ফুসফুসে এবং পরে দেহের প্রতিটি কোষে পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয়। শ্বসনের সরল বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{শক্তি (এ.টি.পি)}$$

গ্লুকোজ + অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি + শক্তি (এ.টি.পি)

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ প্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ এবং নিঃশ্বাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহ থেকে বের করতেই হয়, তা না হলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। কারণ তিন–চার মিনিটের বেশি দেহে অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। দেহের সচেতন, অচেতন উভয় অবস্থাতেই অবিরাম অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের নির্গমণ চলে। আর সাথে সাথে প্রতিনিয়ত দেহ রক্ষার নানাবিধ প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। ফলে প্রাণী বেঁচে থাকে।

শ্বসনতন্ত্র (Respriatory system) : যে অঙ্গগুলোর সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালিত হয় সেগুলোকে একত্রে শ্বসনতন্ত্র বলে। নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো শ্বসনতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। যথা–

১. নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ
২. গলনালি বা গলবিল
৩. স্বরযন্ত্র
৪. শ্বাসনালি
৫. বায়ুনালি বা ব্রংকোস
৬. ফুসফুস
৭. মধ্যচ্ছদা

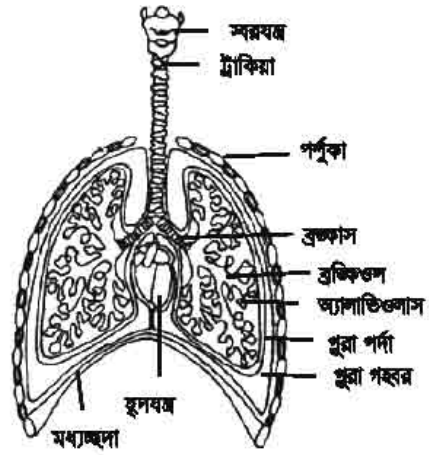

চিত্র: ৭.১ মানব শ্বসনতন্ত্র

১. নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ (Nasal cavity) : শ্বসনতন্ত্রের প্রথম অংশের নাম নাসিকা। এটা মুখগহ্বরের উপরে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার গহ্বর। নাক বা নাসিকার সাহায্যে কোনো বস্তুর সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বুঝা যায়। এক বিশেষ ধরনের স্নায়ু এ অঙ্গকে উদ্দীপিত করে, ফলে আমরা গন্ধ পাই। নাসিকা এমনভাবে গঠিত যে, তা প্রশ্বাস বায়ুকে ফুসফুসের গ্রহণ উপযোগী করে দেয়।

নাসাপথ সম্মুখে নাসিকা ছিদ্র ও পশ্চাতে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি পাতলা প্রাচীর দ্বারা এটি দুই ভাগে বিভক্ত। এর সম্মুখভাগ লোমাবৃত ও পশ্চাতভাগ শ্লেষা প্রস্তুতকারী পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত। আমাদের শ্বাস–প্রশ্বাসের সময় বায়ুতে বিদ্যমান ধূলিকণা, রোগজীবাণু ও আবর্জনা থাকলে তা এই লোম ও পর্দাতে আটকে যায়। এতে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করার পূর্বে কিছু পরিমাণে নির্মল হয়ে যায়। এছাড়া নিঃশ্বাসের জন্য গৃহীত বায়ু নাসাপথ দিয়ে যাওয়ার সময় কিছুটা শুষ্ক ও আর্দ্র হয়। এর ফলে হঠাৎ ঠান্ডা বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারে না।

চিত্র: ৭.২ নাসাপথ ও গলবিল

২. গলবিল (Pharynx) : মুখ হাঁ করলে মুখগহ্বরের পশ্চাতে যে অংশটি দৃষ্টিগোচর হয়, সেটাই গলবিল। নাসাপথের পশ্চাতভাগ থেকে স্বরযন্ত্রের উপরিভাগ পর্যন্ত এটা বিস্তৃত। এর পশ্চাতভাগের উপরিতলে একটি ছোট জিহ্বার মতো অংশ থাকে, এটাই আলাজিহ্বা।

খাদ্য ও পানীয় গলাধঃকরণের সময় এটা নাসাপথের পশ্চাতপথ বন্ধ করে দেয়। ফলে কোনো প্রকার খাদ্য নাসিকা পথে বাইরে আসতে পারে না।

৩. স্বরযন্ত্র (Larynx) : এটা গলবিলের নিচে ও শ্বাসনালির উপরে অবস্থিত। স্বরযন্ত্রের দুইধারে দুটি পেশি থাকে। এগুলো স্বররজ্জু বা ভোকালকর্ড। স্বরযন্ত্রের উপরে একটি জিহ্বা আকৃতির ঢাকনা রয়েছে। একে উপজিহ্বা (Epiglottis) বলে। শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার সময় এটি খোলা থাকে এবং এ পথে বায়ু ফুসফুসে যাতায়াত করে। আহারের সময় ঐ ঢাকনাটা স্বরযন্ত্রের মুখ ঢেকে দেয়। ফলে আহার্য দ্রব্যাদি সরাসরি খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে। তবে শ্বসনে এর কোনো ভূমিকা নেই।

৪. শ্বাসনালি (Trachea) : এটি খাদ্যনালির সম্মুখে অবস্থিত একটি ফাঁপা নল। এ নালিটি স্বরযন্ত্রের নিম্নাংশ থেকে শুরু করে কিছুদূর নিচে গিয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি বায়ুনলের সৃষ্টি করে। এগুলো শ্বাসনালি। এর প্রাচীর কতকগুলো অসম্পূর্ণ বলায়াকার তরুণাস্থি ও পেশি দ্বারা গঠিত। এর অন্তর্গাত্র ঝিল্লি দ্বারা আবৃত। এ ঝিল্লিতে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত কোষ থাকে। এর ভেতর দিয়ে বায়ু আসা যাওয়া করে। শ্বাসনালির ভিতর দিয়ে কোনো অপ্রয়োজনীয় বস্তু প্রবেশ করলে সূক্ষ্ম লোমগুলো ধূলিকণাকে শ্লেষার সাথে বাইরে বের করে দেয়।

৫. ব্রংকাস (Bronchus) : শ্বাসনালি স্বরযন্ত্রের নিম্নাংশ থেকে ফুসফুসের নিকটবর্তী হয়ে ডান ও বাম দিকে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়। এ শাখাগুলো যথাক্রমে বাম ও ডান ফুসফুসে প্রবেশ করে। এগুলো ব্রংকাই নামে পরিচিত। ফুসফুসে প্রবেশ করার পর ব্রংকাই দুটি অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এগুলোকে অণুক্লোম শাখা বা ব্রংকিওল বলে। এদের গঠনশৈলী শ্বাসনালির অনুরূপ।

৬. ফুসফুস (Lung) : ফুসফুস শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। বক্ষগহ্বরের ভিতর হৃৎপিন্ডের দুই পাশে দুটি ফুসফুস অবস্থিত। এটি স্পঞ্জের মতো নরম ও কোমল, হালকা লালচে রঙের। ডান ফুসফুস তিন খন্ডে এবং বাম ফুসফুস দুই খন্ডে বিভক্ত। ফুসফুস দুই ভাঁজ বিশিষ্ট প্লুরা নামক পর্দা দ্বারা আবৃত। দুই ভাঁজের মধ্যে এক প্রকার রস নির্গত হয়। ফলে শ্বাসক্রিয়া চলার সময় ফুসফুসের সাথে বক্ষগাত্রের কোনো ঘর্ষণ লাগে না। ফুসফুসে অসংখ্য বায়ুথলি বা বায়ুকোষ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্বাসনালি ও রক্তনালি থাকে। বায়ুথলিগুলোই হলো অ্যালভিওলাস (Alveolus)।

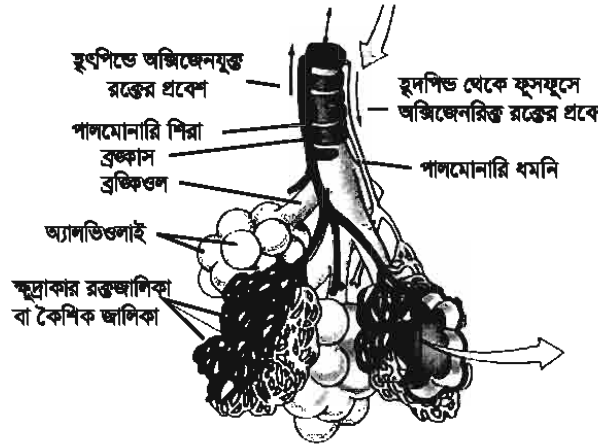

চিত্র: ৭.৩ ফুসফুস মধ্যস্থ বায়ুথলি

বায়ুথলিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুক্লোম শাখাপ্রান্তে মৌচাকের মতো অবস্থিত। নাসাপথ দিয়ে বায়ু সরাসরি বায়ুথলিতে যাতায়াত করতে পারে। বায়ুথলি পাতলা আবরণী দ্বারা আবৃত এবং প্রতিটি বায়ুথলি কৈশিকনালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। বায়ু প্রবেশ করলে এগুলো বেলুনের মতো ফুলে উঠে ও পরে আপনা আপনি সংকুচিত হয়। বায়ু ও কৈশিক নালিকার গাত্র এত

পাতলা যে, এর ভিতর দিয়ে গ্যাসীয় আদান প্রদান ঘটে।

কাজ–১: ফুসফুসের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।

৭. **মধ্যচ্ছদা (Diaphragm)** : বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বর পৃথককারী পেশিবহুল পর্দাকে মধ্যচ্ছদা বলে। এটি দেখতে অনেকটা প্রসারিত ছাতার মতো। মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হলে নিচের দিকে নামে, তখন বক্ষগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এটি প্রসারিত হলে উপরের দিকে উঠে ও বক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। মধ্যচ্ছদা প্রশ্বাস গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শ্বাসক্রিয়া: শ্বাস প্রশ্বাসের অঙ্গগুলো কেবলমাত্র গলবিলের দিকে খোলা থাকে, অন্য সবদিক বন্ধ থাকে। ফলে নাসাপথের ভিতর দিয়ে ফুসফুসের বায়ুথলি পর্যন্ত বায়ু নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে। স্নায়ুবিক উত্তেজনা দ্বারা শ্বাসকার্য পরিচালিত হয়। স্নায়ুবিক উত্তেজনার কারণে পিঞ্জরাস্থির মাংসপেশি ও মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হয়। ফলে মধ্যচ্ছদা নিচের দিকে নেমে যায় ও বক্ষগহ্বর প্রসারিত হয়। বক্ষগহ্বরের আয়তন বেড়ে গেলে বায়ুর চাপ কমে যায়, ফলে ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর চাপ বাইরের বায়ুর চাপের চেয়ে কমে যায়। বক্ষগহ্বরের ভিতর ও বাইরের চাপের সমতা রক্ষার জন্য প্রশ্বাস বায়ু ফুসফুসের ভিতর সহজে প্রবেশ করতে পারে। এই পেশি সংকোচনের পরপরই পুনরায় প্রসারিত হয়। তাই মধ্যচ্ছদা পুনরায় প্রসারিত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং বক্ষগহ্বরের আয়তন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এতে ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়, ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বায়ুসম্পৃক্ত বাতাস নিঃশ্বাসরূপে বাইরে নির্গত হয়। এভাবে মানবদেহে প্রতিনিয়ত শ্বাসকার্য চলতে থাকে। মূলত এটা বহিঃশ্বসন।

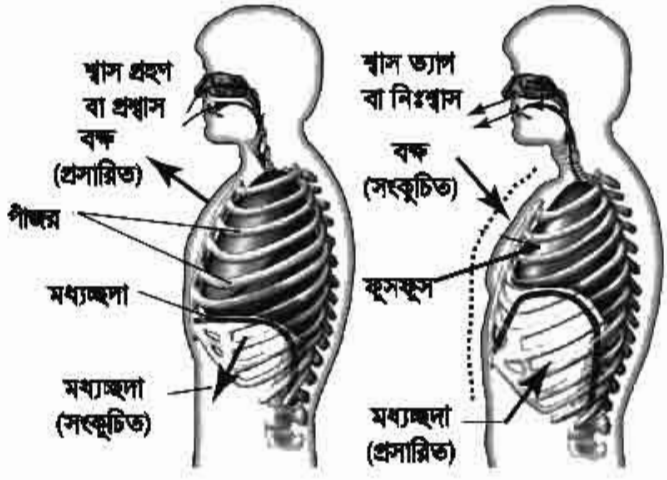

চিত্র ৭.৪ : শ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ

গ্যাসীয় বিনিময় : গ্যাসীয় বিনিময় বলতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিনিময়কে বুঝায়। এটি মূলত বায়ু ও ফুসফুসের রক্তনালির ভিতরে ঘটে। গ্যাসীয় বিনিময়কে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। যথা– অক্সিজেন শোষণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ।

অক্সিজেন শোষণ : শ্বসনের সময় অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে। রক্তে প্রবেশ করার পর অক্সিজেন মুক্ত অবস্থায় থাকে না। এর একটি বড় অংশ লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন নামক একটি অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ যৌগ গঠন রক্তরসে অক্সিজেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। দেহে রক্ত পরিবহনের সময় বেশ কিছু পরিমাণ অক্সিজেন রক্তরস থেকে কলারস বা লসিকায় প্রবেশ করে। উল্লেখ্য যে, লসিকায় তখন অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায় এ ক্রিয়াটি ঘটে। ফলে রক্তরসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে

যায়। হিমোগ্লোবিন তখন তার সাথে যুক্ত অক্সিজেন ছাড়তে থাকে। এভাবে প্রথমে অক্সিজেন রক্তরস ও পরে লসিকা বা কোষরসে প্রবেশ করে। অক্সিজেন পরিবহনের সময় নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য ঘটনার অবতারণা হয় তা হলো–

ফুসফুসের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলি ও রক্তের চাপের পার্থক্যের জন্য অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রবেশ করে। ফুসফুস থেকে ধমনির রক্তে অক্সিজেন প্রবেশ করার পর রক্তে অক্সিজেন দুভাবে পরিবাহিত হয়। সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে পরিবাহিত হয়। বেশির ভাগ অক্সিজেনই হিমোগ্লোবিনের লৌহ অংশের সাথে হালকা বন্ধনের মাধ্যমে অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। যা অক্সিহিমোগ্লোবিন নামে পরিচিত। অক্সিহিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেন সহজে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

হিমোগ্লোবিন + অক্সিজেন ⟶ অক্সিহিমোগ্লোবিন

অক্সিহিমোগ্লোবিন ⟶ মুক্ত অক্সিজেন + হিমোগ্লোবিন (অস্থায়ী যৌগ)

রক্ত কৈশিকনালিতে পৌঁছার পর অক্সিজেন পৃথক হয়ে প্রথমে লোহিত রক্তকণিকার আবরণ, কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদ করে লসিকাতে প্রবেশ করে। অবশেষে লসিকা থেকে কোষ আবরণ ভেদ করে কোষে পৌঁছে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন: খাদ্য জারন বিক্রিয়া কোষে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রথমে কোষ আবরণ ভেদ করে লসিকাতে প্রবেশ করে এবং লসিকা থেকে কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদ করে রক্তরসে প্রবেশ করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রধানত বাইকার্বনেট রূপে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে আসে, সেখানে কৈশিকনালি ও বায়ুথলি ভেদ করে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

কাজ–১ : নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসের প্রকৃতি নির্ণয়ক পরীক্ষাঃ

উপকরণ : দুটি টেস্টটিউব, দুটি প্লাস্টিকের নল ও চুনের পানি।

পদ্ধতি : টেস্টটিউব দুটিতে সমপরিমাণ চুনের পানি নিতে হবে তারপর দুটি টেস্টটিউবের মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করাতে হবে যেন নল দুটি চুনের পানি স্পর্শ করে। এবার নল দুটির অপর প্রান্ত তোমার মুখে প্রবেশ করাতে হবে এবং নল দুটির ভিতর দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ করতে হবে। ১৫ সেকেন্ড পর দ্রবণ দুটির কোনো পরিবর্তন হয় কিনা লক্ষ কর। যদি দুটি টেস্টটিউবের চুনের পানির কোনো পরিবর্তন না ঘটে তবে আরও ১৫ সেকেন্ড পরীক্ষণটি করতে থাক।

চিত্র ৭.৫: নি:শ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসের প্রকৃতি নির্ণয়ক পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ : একটু লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে টেস্টটিউবের ভিতর নিঃশ্বাস বায়ু প্রবেশ করেছিল সে দ্রবণটির (চুনের পানি) রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। চুনের পানি দুধের মতো রং ধারণ করেছে। অন্য টেস্টটিউবটির চুনের পানি আগের মতোই স্বচ্ছ রয়েছে।

সিদ্ধান্ত : নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতির কারণে চুনের পানি ঘোলা হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ প্রশ্বাস বায়ু থেকে বেশি থাকে। অপর পক্ষে প্রশ্বাস বায়ুতে নিঃশ্বাস বায়ু অপেক্ষা কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কম থাকায় চুনের পানির কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

কাজ– ২ : নিচের ছকটি পূরণ কর।

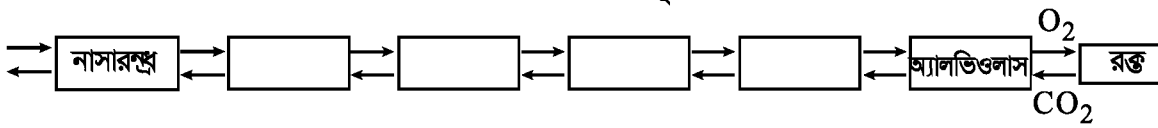

শ্বাসনালি সংক্রান্ত রোগ

ফুসফুস শ্বসনতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ অঙ্গটি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনেক সময় অজ্ঞতা ও অসাবধানতার কারণে ফুসফুসে নানা জটিল রোগ দেখা দেয় ও সংক্রমণ ঘটে। ফুসফুসের সাধারণ রোগগুলোর কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও সাবধানতাগুলো জানা থাকলে অনেক জটিল সমস্যা এমনকি মৃত্যুঝুঁকিও অনেকাংশে কমানো যায়।

এ্যাজমা বা হাঁপানী (Asthma) : ভাইরাসজনিত কারণে অথবা বায়ুদূষণ বা ধূমপানের কারণে সর্দি কাশি হয়। দীর্ঘদিনের সর্দি, কাশি ও হাঁচি থেকে একসময় স্থায়ীভাবে এ্যাজমা বা হাঁপানী রোগের সৃষ্টি হয়। এটি ছোঁয়াচে বা জীবাণুবাহিত রোগ নয়।

কারণ

যে সব খাবার খেলে এলার্জি হয় (চিংড়ি, গরুর মাংস, ইলিশ মাছ ইত্যাদি), বায়ুর সাথে ধোঁয়া, ধূলাবালি, ফুলের রেণু ইত্যাদি শ্বাস গ্রহণের সময় ফুসফুসে প্রবেশ করলে হাঁপানী হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত সর্দি কাশি থেকে হাঁপানী হতে পারে।

ব্যতিক্রম: বছরের বিশেষ ঋতুতে বা ঋতু পরিবর্তনের সময় এ রোগ বেড়ে যায়।

লক্ষণ

- হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।
- শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়, ঠোঁট নীল হয়ে যায়, গলার শিরা ফুলে যায়।
- রোগী জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে, এসময় বুকের ভিতর সাঁই সাঁই আওয়াজ হয়।
- ফুসফুসের বায়ুথলিতে ঠিকমতো অক্সিজেন সরবরাহ হয় না বা বাধাগ্রস্থ হয়, ফলে রোগীর বেশি কষ্ট হয়।
- কাশির সাথে কখনও কখনও সাদা কফ বের হয়।
- সাধারণত জ্বর থাকে না।
- শ্বাস নেওয়ার সময় রোগীর পাঁজরের মাঝে চামড়া ভিতরের দিকে ঢুকে যায়।
- রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

- চিকিৎসায় এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। তবে ঔষধ সেবনে রোগী কিছুটা আরামবোধ করে।
- যেসব খাদ্য খেলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় সেগুলো না খাওয়া।
- আলো–বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা।
- যেসব জিনিসের সংস্পর্শ হাঁপানী বাড়ায় তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা। যেমন– পশুর লোম, কৃত্রিম আঁশ ইত্যাদি।

- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়া ও সাবধানতা অবলম্বন করা।
- ধূমপান, গুল, সাদা পাতা, জর্দা ইত্যাদি ব্যবহার পরিহার করা।
- শ্বাসকষ্টের সময় রোগীকে তরল খাদ্য খাওয়ানো।

প্রতিরোধ

- স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করা।
- বায়ু দূষণ, বাসস্থান বা কর্মক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হতে পারে এমন সব বস্তুর সংস্পর্শ পরিহার করা।
- হাঁপানী রোগীর শ্বাসকষ্ট লাঘবের জন্য সবসময় সাথে ঔষধ রাখা ও প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা।

ব্রংকাইটিস (Bronchitis)

শ্বাসনালির ভিতরে আবৃত ঝিল্লীতে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণকে ব্রংকাইটিস বলে। ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে ঝিল্লীগাত্রে প্রদাহ হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্যাঁতসেঁতে ধূলিকণা মিশ্রিত আবহাওয়া, ঠান্ডা লাগা ও ধূমপান থেকে এ রোগ হতে পারে। একবার ব্রংকাইটিস হলে বার বার এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণত শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দূষণ এ রোগের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন– কলকারখানার ধূলাবালি ও ধোঁয়াময় পরিবেশ।

লক্ষণ

- কাশি, বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হয়।
- কাশির সময় রোগী বুকে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করে।
- জ্বর হয়, রোগীর ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পাড়ে।
- শক্ত খাবার খেতে পারে না।
- কাশির সাথে অনেক সময় কফ বের হয়।

প্রতিকার

- ধূমপান, মদ্যপান, তামাক বা সাদাপাতা খাওয়া বন্ধ করা।
- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগী চিকিৎসা করানো।
- রোগীকে সহনীয় উষ্ণতা ও শুষ্ক পরিবেশে রাখা।
- পুষ্টিকর তরল ও গরম খাবার খাওয়ানো। যেমন– গরম দুধ, স্যুপ ইত্যাদি।
- রোগীর পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া।

প্রতিরোধ

- ধূমপান, মদ্যপান ও তামাক সেবনের মতো বদাভ্যাস ত্যাগ করা।
- ধুলাবালি ও ধোয়াপূর্ণ পরিবেশে কাজ করা থেকে বিরত থাকা।
- শিশু বা বয়স্কদের যেন মাথায় ঠান্ডা না লাগে সেদিকে নজর রাখা।

নিউমোনিয়া (Pneumonia)

নিউমোনিয়া একটি ফুসফুসের রোগ। অত্যধিক ঠান্ডা লাগলে এ রোগ হতে পারে। হাম ও ব্রংকাইটিস রোগের পর ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হতে দেখা যায়। শিশু ও বয়স্কদের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ।

কারণ : নিউমোকক্কাস (Pneumococcus) নামক ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ

- ফুসফুসে শ্লেষা জাতীয় তরল পদার্থ জমে কফ সৃষ্টি হয়।
- কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়।
- দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ বেশি জ্বর হয়।
- চূড়ান্ত পর্যায়ে বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় আওয়াজ হয়, মারাত্মক শ্বাসকষ্ট হয়।

প্রতিকার

- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- তরল ও গরম পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো।
- বেশি করে পানি পান করানো।

প্রতিরোধ

- শিশু, বয়স্কদের যেন ঠান্ডা না লাগে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
- ধূমপান পরিহার করা।
- আলো বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা।
- রোগীকে সহনীয় উষ্ণতায় ও শুষ্ক পরিবেশে রাখা।

যক্ষ্মা (Tuberculosis)

যক্ষ্মা একটি পরিচিত বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগ। যেকোনো লোক, যেকোনো সময়ে এ রোগ দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। যারা অধিক পরিশ্রম করে, দুর্বল, স্যাঁতসেঁতে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে, অপুষ্টিতে ভোগে অথবা যক্ষ্মা রোগীর সাথে বসবাস করে তারা এ রোগে সহজে আক্রান্ত হয়। আমাদের অনেকের ধারণা যক্ষ্মা শুধুমাত্র ফুসফুসের রোগ। আসলে ধারণাটা একেবারেই সঠিক নয়। যক্ষ্মা দেহের যেকোনো স্থানে হতে পারে। যেমন– অন্ত্র, হাড়, ফুসফুস ইত্যাদি। দেহে এ রোগের আক্রমণ ঘটলে সহজে এর লক্ষণ প্রকাশ পায় না। যখন জীবাণুগুলো দেহের রোগ প্রতিরোধক শ্বেত রক্তকণিকাকে পরাস্ত করে দেহকে দুর্বল করে তখনই এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কারণ : Mycobacterium tuberculosis নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করলে অতিসহজে দেহে রোগ জীবাণুর বিস্তার ঘটে।

রোগ নির্ণয় : চামড়ার পরীক্ষা ও এক্সরে সাহায্যে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

লক্ষণ

- রোগীর ওজন কমতে থাকে, আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হতে থাকে।
- সাধারণত তিন সপ্তাহের বেশি সময় কাশি থাকে।
- খুসখুসে কাশি হয় এবং কখনও কখনও কাশির সাথে রক্ত যায়।
- রাতে ঘাম হয়, বিকেলের দিকে জ্বর আসে। দেহের তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়ে না।
- বুকে পিঠে ব্যথা হয়।
- অজীর্ণ ও পেটের পীড়া দেখা দেয়।

প্রতিকার

- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করা।
- এ রোগের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগ নিবারণের নিয়মগুলো কঠিনভাবে মেনে চলা।
- রোগীকে হাসপাতালে বা স্যানাটোরিয়ামে পাঠানো অধিক নিরাপদ।
- রোগীর ব্যবহারের সবকিছু পৃথক রাখা উচিত।
- রোগীর কফ বা থুথু মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়।
- রোগীর জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা ও পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা।
- ডাক্তারের নির্দেশ ব্যতীত কোনো অবস্থায় ঔষধ সেবন বন্ধ করা উচিত নয়।

প্রতিরোধ

- এ মারাত্মক রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে হলে শিশুদের যক্ষ্মা প্রতিসেধক বি.সি.জি টিকা দেওয়া। শিশুর জন্মের পর থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- বর্তমানে দেশের বিভিন্ন টিকাদান কেন্দ্রে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

টিউমার, ক্যান্সার এ শব্দগুলোর সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এগুলো অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের ফসল। মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এভাবে কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত থাকে। কোনো কারণে এই নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেলে অস্বাভাবিকভাবে কোষ বিভাজন চলতে থাকে। এর ফলে টিউমার সৃষ্টি হয়।

ক্যান্সার কোষও এই নিয়ন্ত্রণহীন অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনেরই ফসল। গবেষণায় দেখা গেছে বিভিন্ন প্রকার প্যাপিলোমা ভাইরাস ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এ ভাইরাসের ই৬ এবং ই৭ নামের দুটি জিন এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে, যা কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রক দুটি প্রোটিন অণুকে স্থানচ্যুত করে। এর ফলে কোষ বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যায়, সৃষ্টি হয় অর্বুদ। অনেক সময় এ দুটি জিন পোষক কোষের জিনের সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী প্রোটিন অণুসমূহের কাজ বন্ধ করে দেয়। সৃষ্টি হয় ক্যান্সার কোষ, তথা ক্যান্সার।

ক্যান্সার একটি মারাত্মক রোগ। ক্যান্সার হয় লিভারে, ফুসফুসে, মস্তিষ্কে, স্তনে, ত্বকে অর্থাৎ দেহের প্রায় সকল অঙ্গে।

ফুসফুসের ক্যান্সার (Lung cancer)

সব ধরনের ক্যান্সারের মধ্যে ফুসফুস ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। আমাদের দেশে পুরুষদের ক্যান্সারে মৃত্যুর প্রধান কারণ ফুসফুস ক্যান্সার।

ফুসফুস ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপান।

- বায়ু ও পরিবেশ দূষণ এবং বাসস্থান অথবা কর্মক্ষেত্রে দূষণ ঘটতে পারে এমন সব বস্তুর (যেমন– এ্যাসবেস্টাস, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, নিকেল, কঠিন ধাতুর গুঁড়া ইত্যাদি) সংস্পর্শে আসার কারণে ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।
- যক্ষ্মা বা কোনো ধরনের নিউমোনিয়া ফুসফুসে এক ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হয়।
- ধারণা করা হয়, খাদ্য তালিকায় আঁশ জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি এই রোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

লক্ষণ

ফুসফুস ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো যত দ্রুততা সাথে নির্ণয় করা যায় এবং চিকিৎসা প্রদান করা যায়, বেশিদিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক অবস্থায় যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলো হলো–

- দীর্ঘদিন ধরে খুসখুসে কাঁশি ও বুকে ব্যথা।
- ভগ্নস্বর, ওজন হ্রাস এবং ক্ষুদামন্দা।
- হাঁপানী, ঘনঘন জ্বর হওয়া।
- বারবার ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়া দ্বারা সংক্রমিত হওয়া।
- হাড়ে ব্যথা অনুভব, দুর্বলতা, কোনো গ্রন্থি অবশ হয়ে যাওয়া, জন্ডিস দেখা দেওয়া।

রোগ নির্ণয়

প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সারের সম্ভবতা যাচাইয়ের জন্য থুথু বা শ্লেষা বিশ্লেষণ করা, বুকের এক্স–রে করা।

প্রতিকার

- রোগের লক্ষণগুলো দেখা গেলে অনতিবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।
- রোগ নির্ণয়ের পর ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনে রেডিয়েশন থেরাপি প্রয়োগ করা।

প্রতিরোধ

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যান্সার প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে যথা–

- ধূমপান ও মদ্যপান না করা।
- অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাদ্য কম খাওয়া।
- নিয়মিত ব্যায়াম করা।
- পরিমাণমতো শাকসবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

অ্যামেরিকার ক্যান্সার ইনিস্টিটিউট, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ট্রল এবং ক্যান্সার বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

অনুশীলনী

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোষীয় শ্বসন কাকে বলে?

২. প্লুরার কাজ কী?

৩. ব্রংকাইটিস কী?

৪. মধ্যচ্ছদার কাজ কী?

৫. নিউমোনিয়া কেন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. যক্ষ্মা রোগের লক্ষণগুলো লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটির সংক্রমণে যক্ষ্মা হয়?

ক. ভাইরাস খ. ব্যাকটেরিয়া

গ. ছত্রাক ঘ. প্রোটোজোয়া

২. উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়ে সাহায্য করে–

i. স্টোমাটা

ii. লেন্টিসেল

iii. মূলরোম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

শারীরিক দুর্বলতার জন্য রিতা ডাক্তারের শরাণাপন্ন হলো। ডাক্তার তার দেহে রক্তের একটি বিশেষ কণিকার অপর্যাপ্ততার কথা জানান। ঘাটতি পূরণে ডাক্তার তাকে পুষ্টিকর খাবার ও শাকসবজি অধিক পরিমাণে খেতে পরামর্শ দিলেন।

৩. রিতার রক্তে কোনটির অভাব রয়েছে?

ক. লোহিত রক্তকণিকা খ. শ্বেত রক্তকণিকা

গ. অনুচক্রিকা ঘ. রক্তরস

৪. বিশেষ কণিকাটি–

i. লৌহ উপাদান যুক্ত

ii. অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে

iii. কার্বন ডাইঅক্সাইড ধারণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

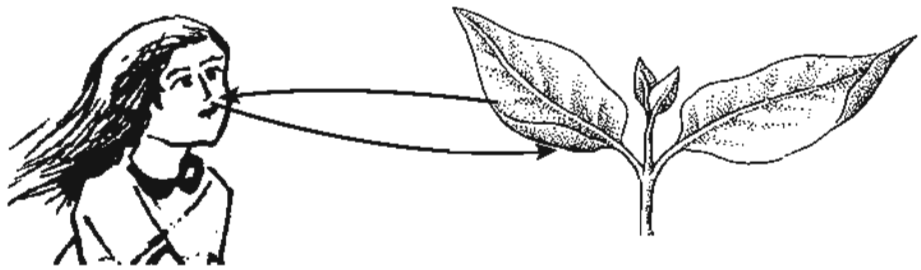

চিত্র– P চিত্র– Q

ক. রক্তের কোন কণিকা অক্সিজেন বহন করে?

খ. ট্রাকিয়া বলতে কী বুঝায়?

গ. P এর সংঘটিত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গ্যাস বিনিময়ের ক্ষেত্রে P ও Q একে অপরের উপর নির্ভরশীলতার বিষয়টি তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. রাশেদ ও জামিল জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে কাজ করে। কাঁশি ও বুকে ব্যথাসহ অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় ভোগায় উভয়ে ডাক্তারের শরাণাপন্ন হন। ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হন যে রাশেদের শ্বসন অঙ্গের কোষ বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে জামিলের রোগটি শ্বসন অঙ্গ ছাড়াও অন্ত্র ও হাড়ে বিস্তার লাভ করেছে।

ক. মধ্যচ্ছদা কী?

খ. বহিঃশ্বসন বলতে কী বুঝায়?

গ. রাশেদের দেহে রোগটি কীভাবে ছড়ায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাশেদ ও জামিলের রোগ দুটির মধ্যে কোনটির নিরাময় তুলনামূলকভাবে সহজতর– কারণ বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

মানব রেচন

জীবদেহের কোষাভ্যন্তরে অসংখ্য রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। এতে জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। জীব বেঁচে থাকে। রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন কিছু পদার্থ দেহের জন্য অপরিহার্য। আবার কিছু পদার্থ দেহের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো দেহ থেকে বের করে দেওয়া অতীব জরুরি। যেমন– শ্বসনের সময় গ্লুকোজ ভেঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। রক্ত এই কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায় এবং ফুসফুস থেকে বাইরে নির্গত হয়। এ অধ্যায়ে দেহ থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ও বৃক্কের নানা রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

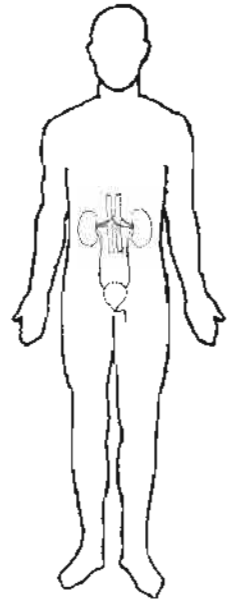

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- মানুষের রেচন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানবদেহে উৎপন্ন রেচন পদার্থের বর্ণনা করতে পারব।
- বৃক্কের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- রেচনের একক নেফ্রনের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৃক্কে পাথর সৃষ্টি প্রতিরোধ এবং প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- বৃক্ক বিকলের লক্ষণ ও করণীয় বর্ণনা করতে পারব।
- বৃক্কের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতে ডায়ালাইসিসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৃক্ক প্রতিস্থাপন এবং মরণোত্তর বৃক্ক দানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মূত্রনালির রোগ ও সুস্থ থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- মরণোত্তর বৃক্কদান বিষয়ে জনমত নিরূপণের একটি অনুসন্ধান কাজ করতে পারব।
- মানব বৃক্ক ও নেফ্রনের চিত্র অংকন করে চিহ্নিত করতে পারব।
- সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মরণোত্তর বৃক্ক দান বিষয়ে পোস্টার অংকন করতে পারব।
- বৃক্ক ও মূত্রনালির সুস্থতা রক্ষার সচেতনতা সৃষ্টি করতে লিফলেট অংকন করতে পারব।

রেচন মানব দেহের একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দেহে বিপাক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থগুলো নিষ্কাশিত হয়। দেহের এ সকল বর্জ্য পদার্থগুলো শরীরে কোনো কারণে জমতে থাকলে নানা রকমের অসুখ দেখা দেয়, পরবর্তীতে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে দেহের বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশিত হয়ে বের করে দিয়ে দেহের শারীরবৃত্তীয় ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। শরীরের অতিরিক্ত পানি, লবণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জৈব পদার্থগুলো সাধারণত দেহ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

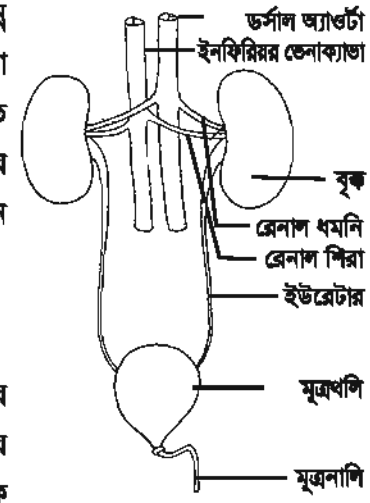

চিত্র ৮.১ : মানব রেচনতন্ত্র

মানব দেহের রেচন অঙ্গ হলো বৃক্ক। আর বৃক্কের একক হলো নেফ্রন।

রেচন পদার্থ : রেচন পদার্থ বলতে মূলতঃ নাইট্রোজেন গঠিত বর্জ্য পদার্থকে বুঝায় মানব দেহের রেচন পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে আসে। মূত্রের প্রায় ৯০ ভাগ উপাদান হচ্ছে পানি। অন্যান্য উপাদনের মধ্যে আছে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ও বিভিন্ন ধরনের লবণ। ইউরোক্রোম নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতিতে মূত্রের রং হালকা হলুদ হয়। আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণে মূত্রের অম্লতা বৃদ্ধি ও ফলমূল এবং তরিতরকারি গ্রহণে সাধারণত ক্ষারীয় মূত্র তৈরি হয়।

বৃক্ক (কিডনি) : মানবদেহের রেচন অঙ্গ হলো বৃক্ক বা কিডনি। মানবদেহের উদরগহ্বরের পিছনের অংশে, মেরুদণ্ডের দুদিকে বক্ষপিঞ্জরের নিচে পৃষ্ঠপ্রাচীর সংলগ্ন অবস্থায় দুটি বৃক্ক অবস্থান করে। প্রতিটি বৃক্কের আকৃতি শিম বিচির মতো এবং রং লালচে হয়। বৃক্কের বাইরের দিক উত্তল ও ভিতরের দিক অবতল হয়। অবতল অংশের ভাঁজকে হাইলাস (Hilus) বলে। হাইলাসে অবস্থিত গহ্বরকে পেলভিস (Pelvis) বলে। পেলভিস থেকে দুটি ইউরেটার বের হয়ে মূত্রাশয়ে প্রবেশ করে। হাইলাসের ভিতর থেকে ইউরেটার ও রেনাল শিরা বের হয় এবং রেনাল ধমনি বৃক্কে প্রবেশ করে। ইউরেটারের ফানেল আকৃতির প্রশস্ত অংশকে পেলভিস বলে।

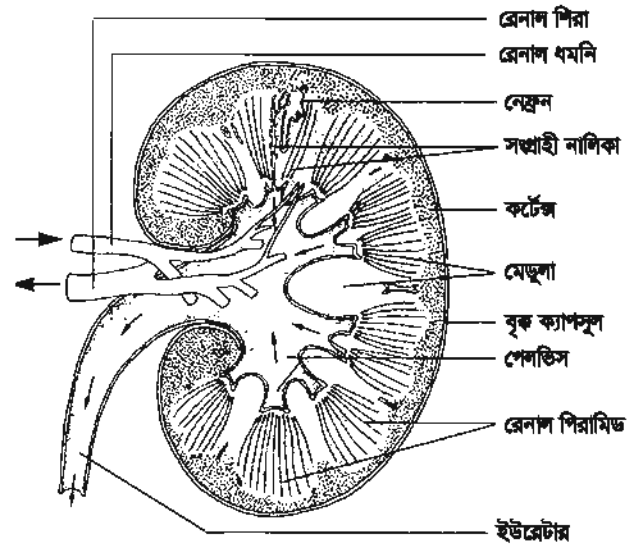

চিত্র ৮.২ : বৃক্কের লম্বচ্ছেদ

বৃক্ক সম্পূর্ণ রূপে এক ধরনের তন্তুময় আবরণ দিয়ে বেষ্টিত থাকে। একে ক্যাপসুল বলে। ক্যাপসুল সংলগ্ন অংশকে কর্টেক্স এবং ভিতরের অংশকে মেডুলা বলে। উভয় অঞ্চলই যোজক কলা এবং রক্তবাহী নালি দিয়ে গঠিত। মেডুলায় সাধারণত ৮–১২টি রেনাল পিরামিড থাকে। এদের অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে পিড়কা (Papilla) গঠন করে। এসব পিড়কা সরাসরি পেলভিসে উন্মুক্ত হয়।

প্রতিটি বৃক্কে বিশেষ এক ধরনের নালিকা থাকে যাকে ইউরিনিফেরাস নালিকা বলে। প্রতিটি ইউরিনিফেরাস নালিকা দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত, যথা– নেফ্রন, (Nephrone) ও সংগ্রাহী নালিকা (Collecting tubule)। নেফ্রন মূত্র তৈরি করে আর সংগ্রাহী নালিকা রেনাল পেলভিসে মূত্র বহন করে।

বর্জ্য পদার্থ	অঙ্গ	মন্তব্য
CO_2		
নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ		
ইউরিয়া, ইউরিক এসিড		
অতিরিক্ত পানি		

নেফ্রন : বৃক্কের ইউরিনিফেরাস নালিকার ক্ষরনকারী অংশ ও কার্যিক একককে নেফ্রন বলে। মানবদেহের প্রতিটি বৃক্কে প্রায় ১০ লক্ষ নেফ্রন থাকে। প্রতিটি নেফ্রন একটি রেনাল করপাসল (Renal carpuscle) বা মালপিজিয়ান অঙ্গ এবং রেনাল টিউব্যুল (Renal tubule) নিয়ে গঠিত।

প্রতিটি রেনাল করপাসল আবার গ্লোমেরুলাস (Glomerulous) এবং বোম্যান্স ক্যাপসুল এ দুটি অংশে বিভক্ত। বোম্যান্স ক্যাপসুল গ্লোমেরুলাসকে বেষ্টন করে থাকে।

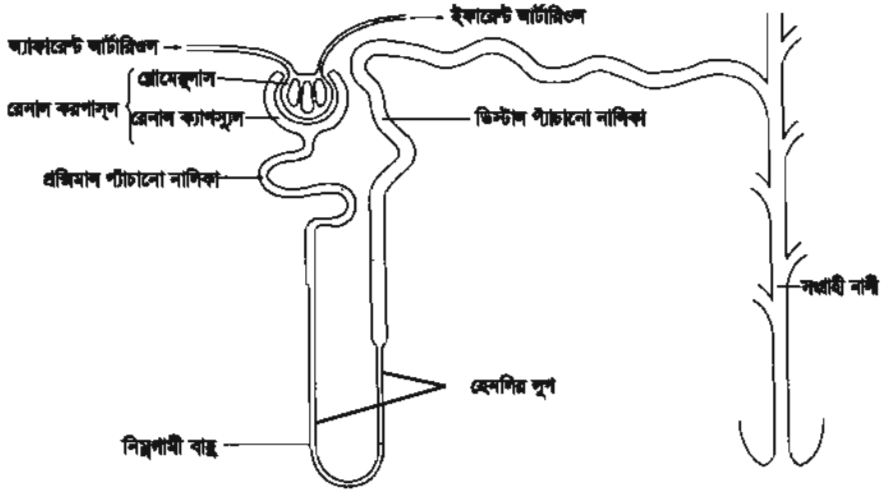

চিত্র ৮.৫.৩. ঃ একটি নেফ্রন

বোম্যান্স ক্যাপসুল দ্বিস্তর বিশিষ্ট পেয়ালার মতো প্রসারিত একটি অংশ। গ্লোমেরুলাস একগুচ্ছ কৈশিক জালিকা দিয়ে তৈরি। রেনাল ধমনি থেকে সৃষ্ট অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল (Afferent arteriole) ক্যাপসুলের ভিতরে ঢুকে প্রায় ৫০টি কৈশিকনালিকা তৈরি করে। এগুলো আবার বিভক্ত হয়ে সূক্ষ্ম রক্তজালিকার সৃষ্টি করে। এসব জালিকার কৈশিকনালিগুলো মিলিত হয়ে ইফারেন্ট অ্যার্টারিওল (Efferent arteriole) সৃষ্টি করে এবং ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসে।

গ্লোমেরুলাস ছাঁকনির মতো কাজ করে রক্ত থেকে পরিস্রুত তরল (Glomerular filtrate) উৎপন্ন করে।

বোম্যান্স ক্যাপসুলের অন্তঃস্থদেশ থেকে সংগ্রাহী নালি পর্যন্ত বিস্তৃত চওড়া নালিকাটিকে রেনাল টিউব্যুল বলে। দুই বৃক্কে মোট ২০ লক্ষ রেনাল টিউব্যুল থাকে। প্রতিটি রেনাল টিউব্যুল ৩টি অংশে বিভক্ত, যথা: গোড়াদেশীয় প্যাঁচানো নালিকা (Proximal convoluted tubule), হেনলি–র লুপ (Henle's loop), প্রান্তীয় প্যাঁচানো নালিকা (Distal convoluted tubule)।

কাজ : মানববৃক্ক ও নেফ্রনের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।

বৃক্কের কাজ : একজন স্বাভাবিক মানুষ প্রতিদিন প্রায় ১৫০০ মিলিলিটার মূত্র ত্যাগ করে। মূত্রে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ থাকে। এগুলো মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এসব অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে অসিরণে বৃক্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃক্কস্থিত নেফ্রন একটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে মূত্র উৎপন্ন করে। উৎপন্ন মূত্র সংগ্রাহী নালিকার মাধ্যমে বৃক্কের পেলভিসে পৌঁছায় এবং পেলভিস থেকে ইউরেটারের ফানেল আকৃতির প্রশস্ত অংশ বেয়ে ইউরেটারে প্রবেশ করে। ইউরেটার থেকে মূত্র মূত্রথলিতে আসে এবং সাময়িকভাবে জমা থাকে। মূত্রথলি মূত্র দ্বারা পরিপূর্ণ হলে মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা জাগে এবং মূত্রথলির নিচের দিকে অবস্থিত ছিদ্রপথে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে। এভাবে বৃক্ক মানবদেহ থেকে ক্ষতিকর নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে।

বৃক্ক মানবদেহে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড ইত্যাদির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়াও মানবদেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, পানি, অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।

কাজ : নিচের ছকে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে কোন অঙ্গ কীভাবে অংশ নেয় তা লেখ।

অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা : মানবদেহে যাবতীয় শারীরবৃত্তিক কাজ সম্পাদনের জন্য দেহে পরিমিত পানি থাকা অপরিহার্য। মূলত মূত্রের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি পানি দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। দেহের পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণে বৃক্ক প্রধান ভূমিকা পালন করে। বৃক্ক নেফ্রনের মাধ্যমে পুনঃশোষণ প্রক্রিয়ায় দেহে পানির সমতা বজায় রাখে। গ্লোমেরুলাসে তরল পদার্থ পরিস্রুত হয়। দেহে পানির পরিমাণ বেড়ে গেলে রক্ত বেশি তরল হয়ে যায়। এতে দেহে নানা রকম জটিলতা সৃষ্টি হয়, যেমন– রক্তে নাইট্রোজেন আধিক্য, কোষের ক্ষতি, রক্ত সংবহনে ব্যর্থতা ইত্যাদি।

বৃক্কে পাথর

নানারকম রোগের কারণে বৃক্ক বা কিডনির স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটে। যেমন, কিডনির প্রদাহ, প্রস্রাবে সমস্যা, কিডনিতে পাথর হওয়া উল্লেখযোগ্য। কিডনির রোগের লক্ষণগুলো হলো শরীর ফুলে যাওয়া, প্রস্রাবে প্রোটিন বা আমিষ যাওয়া, রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া করা, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া বা প্রস্রাব বন্ধ হওয়া।

মানব বৃক্কে উদ্ভূত ছোট আকারের পাথর জাতীয় পদার্থের সৃষ্টিই বৃক্কের পাথর হিসেবে পরিচিত। বৃক্কে পাথর সবারই হতে পারে। তবে দেখা গেছে মেয়েদের থেকে পুরুষের পাথর হবার সম্ভাবনা বেশি। অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, বৃক্কে সংক্রমণ রোগ, কম পানি পান করলে, অতিরিক্ত প্রাণীজ আমিষ যেমন– মাংস ও ডিম খেলে বৃক্কের পাথর হবার কারণ হতে পারে।

প্রাথমিকভাবে বৃক্কে পাথর হলে তেমন সমস্যা ধরা পড়ে না। সমস্যা হয় যখন পাথর প্রস্রাব নালিতে চলে আসে ও প্রস্রাবে বাধা দেয়। উপসর্গ হিসেবে কোমরের পিছনে ব্যথা হবে। অনেকের প্রস্রাবের সাথে রক্ত বের হয়। অনেক সময় কাঁপুনী দিয়ে জ্বর আসে। বৃক্কের পাথরের চিকিৎসা নির্ভর করে পাথরের আকার ও অবস্থানের উপর। সাধারণত অধিক পানি গ্রহণ ও ঔষধ সেবনে পাথর অপসারণ করা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে ইউটেরোস্কোপিক, আল্ট্রাসনিক লিথট্রিপসি অথবা বৃক্কে অস্ত্রোপচার করে পাথর অপসারণ করা যায়।

বৃক্ক বিকল, ডায়ালাইসিস ও প্রতিস্থাপন

নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনিতে পাথর ইত্যাদি কারণে কিডনি ধীরে ধীরে বিকল হয়ে যায়। আকস্মিক কিডনি অকেজো বা বিকল হওয়ার কারণগুলো হলো জটিল নেফ্রাইটিস, ডায়রিয়া, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ইত্যাদি।

কিডনি বিকলে হলে মূত্র ত্যাগের সমস্যা দেখা যাবে। রক্তে ক্রিয়েটিনিন বৃদ্ধি পাবে। রক্তের বর্জ্য দ্রব্যাদি অপসারনে নির্দিষ্ট সময় পর পর রোগীকে ডায়ালাইসিস করা হয়।

ডায়ালাইসিস : বৃক্ক সম্পূর্ণ অকেজো বা বিকল হবার পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ত পরিশোধিত করার নাম ডায়ালাইসিস। সাধারণত 'ডায়ালাইসিস মেশিনের' সাহায্যে রক্ত পরিশোধিত করা হয়। এ মেশিনটির ডায়ালাইসিস টিউবটির এক প্রান্ত রোগীর হাতের কব্জির ধমনির সাথে ও অন্য প্রান্ত ঐ হাতের কব্জির শিরার সাথে সংযোজন করা হয়। ধমনি থেকে টিউবের মধ্য দিয়ে রক্ত ডায়ালাইসিস টিউবের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করানো হয়। এর প্রাচীর আংশিক বৈষম্য ভেদ্য হওয়ায় ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ বাইরে বেরিয়ে আসে। পরিশোধিত রক্ত রোগীর দেহের শিরার মধ্য দিয়ে দেহের ভিতর পুনরায় প্রবেশ করে। এখানে উল্লেখ্য যে ডায়ালাইসিস টিউবটি এমন একটি তরলের মধ্যে ডুবানো থাকে যার গঠন রক্তের প্লাজমার অনুরূপ হয়। এভাবে ডায়ালাইসিস মেশিনের সাহায্যে নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ বাইরে নিষ্কাশিত হয়। তবে এটি একটি ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া।

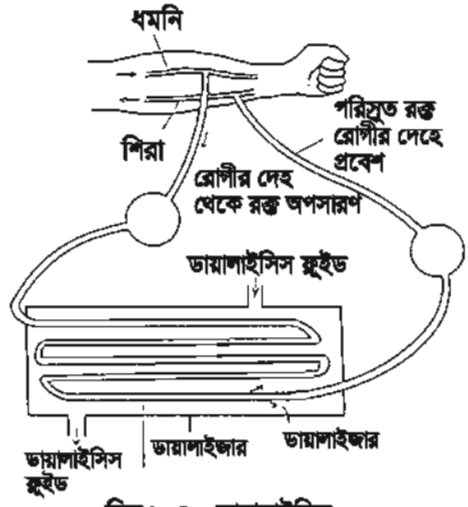

চিত্র ৮.৪ : ডায়ালাইসিস

প্রতিস্থাপন : যখন কোনো ব্যক্তির কিডনি বিকল বা অকেজো হয়ে পড়ে তখন কোনো সুস্থ ব্যক্তির কিডনি তার দেহে প্রতিস্থাপন করা যায়। তখন তাকে কিডনি সংযোজন বলে। কিডনি সংযোজন দুভাবে করা যায়– কোনো নিকট আত্মীয়ের কিডনি একজন কিডনি রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করে এটি করা যায়। তবে নিকট আত্মীয় বলতে বাবা মা, ভাইবোন, মামা, খালা, বুঝায়। আবার মৃত ব্যক্তির কিডনি নিয়ে রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা যায়। মৃত ব্যক্তি বলতে 'ব্রেন ডেথ' বুঝায়। তাছাড়া মরণোত্তর চক্ষুদানের মতো মরণোত্তর বৃক্কদানের মাধ্যমে একজন কিডনি বিকল বা অকেজো রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভবপর হতে পারে। সমগ্র পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কিডনি অকেজো রোগী কিডনি সংযোজনের মাধ্যমে সুস্থ জীবন যাপন করছে। আমাদের দেশেও কিডনি সংযোজন কার্যক্রম সাফল্যের সাথে করা হচ্ছে। মানুষের সব সময় একটি কিডনি কার্যকর থাকে। তাই একটি সুস্থ কিডনি প্রতিস্থাপন করে রোগের চিকিৎসা করা যায়। তবে দেখতে হবে যে টিস্যুম্যাচ করে কিনা। পিতামাতা, ভাইবোন ও নিকট আত্মীয়ের কিডনির টিস্যুম্যাচ হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। মরণোত্তর সুস্থ কিডনি দানে মানব জাতির উপকার করা যায়।

অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে, দৈনিক প্রায় ৮ গ্লাসের (২ লিটার) কম পানি পান করলে এবং নানা কারণে মূত্রনালির রোগ দেখা দেয়। মূত্রনালির সংক্রমন হলে মূত্রনালি জ্বালাপোড়াসহ নানা উপসর্গ দেখা দেয়। ডাক্তারের সত্বর পরামর্শ ও চিকিৎসা গ্রহণে সম্পূর্ন আরোগ্য লাভ করা প্রয়োজন।

কাজ : মরণোত্তর বৃক্ক দানের বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

মূত্রনালি সুস্থ রাখার উপায় : শিশুদের টনসিল ও খোস পাঁচড়া থেকে সাবধান হওয়া। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা। ডায়রিয়া ও রক্তক্ষরণ ইত্যাদির দ্রুত চিকিৎসা করা। ধূমপান, ব্যথা নিরাময়ের ঔষধ পরিহার করা। পরিমাণমতো পানি পান করা। নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করা।

কাজ : কীভাবে বৃক্ক ও মূত্রনালির সুস্থতা রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে দলগতভাবে লিফলেট তৈরি কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ডায়ালাইসিস কী?

২. মালপিজিয়াল অঙ্গ কাকে বলে?

৩. পেলভিস কাকে বলে?

৪. রেচন পদার্থ বলতে কী বুঝায়?

৫. বৃক্কে পাথর বলতে কী বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মূত্রনালি সুস্থ রাখার উপায়গুলো ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইউরিয়া কোথায় তৈরি হয়?

ক. বৃক্কে খ. যকৃতে

গ. দেহ কোষে ঘ. রেনাল ধমনিতে

২. বৃক্কে পাথর হবার সম্ভাবনা কমে

i. শারীরিক ওজন হ্রাস পেলে

ii. কম পানি পান করলে

iii. স্বল্প পরিমাণ আমিষ খেলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তান্নি পানি ও অন্যান্য খাদ্য গ্রহণে নিয়মনীতি মেনে চলে না। ইদানিং তার মূত্রের পরিমাণ কম হওয়াসহ কোমরের পিছনে ব্যথা হচ্ছে।

৩. তান্নির দেহে উক্ত উপাদানটি কম হওয়ার কারণ–

i. ঘাম বেশি হওয়া

ii. ফল কম খাওয়া

iii. লবণাক্ত খাদ্য গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. তান্নির শরীরে উক্ত সমস্যার কারণ–

i. শরীরে পানি আসা

ii. মূত্রনালির প্রদাহ

iii. প্রস্রাবে শর্করা যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

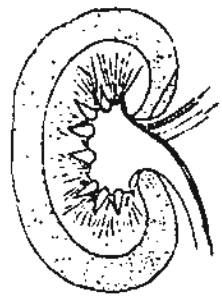

চিত্র– A

ক. মেডুলা কী?

খ. গ্লোমেরুলাস বলতে কী বুঝায়?

গ. চিত্র– A কে ছাঁকনির সাথে তুলনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্র– A বিকল হলে কীভাবে এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মতামত দাও।

নবম অধ্যায়

দৃঢ়তা প্রদান ও চলন

প্রতিকূল পরিবেশে খাদ্য অনুসন্ধান, আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে। যে পদ্ধতিতে প্রাণী নিজ প্রচেষ্টায় সাময়িকভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায় তাকে ঐ প্রাণীর চলন বলে। যে তন্ত্র দেহের কাঠামো গঠন করে, নির্দিষ্ট আকৃতি দেয় এবং বিভিন্ন অঙ্গকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে এবং চলনে সাহায্য করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে। এ অধ্যায়ে আমরা কঙ্কালতন্ত্রের গঠন, কাজ ও এর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারব।

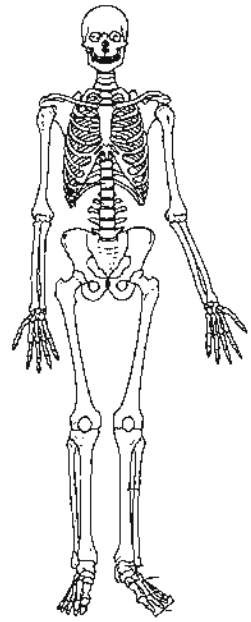

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- মানব কঙ্কালের বর্ণনা করতে পারব।
- দৃঢ়তা প্রদান এবং চলনে কঙ্কালের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার অস্থি ও অস্থিসন্ধির কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পেশির ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- টেনডন ও লিগামেন্টের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অস্টিওপোরেসিসের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- আর্থ্রাইটিস এর কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- অস্টিওপোরেসিস ও আর্থ্রাইটিসের কারণ অনুমান করতে পারব।
- মানব কঙ্কালের বিভিন্ন অংশের চিত্র অংকন করে চিহ্নিত করতে পারব।
- অস্থির সুস্থতা রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।

মানব কঙ্কালের সাধারণ পরিচিতি

একটি ঘর তৈরি করতে হলে সর্বপ্রথম এর কাঠামো বানাতে হয়। আমাদের দেহের কাঠামো হলো কঙ্কাল (Skeleton)। লম্বা, ছোট, চ্যাপ্টা, অসমান মোট ২০৬ টি অস্থির সমন্বয়ে মানব কঙ্কাল গঠিত। এটি মানবদেহকে নির্দিষ্ট আকার দেয়। হৃদপিন্ড, ফুসফুস, পাকস্থলি, অন্ত্র, মস্তিষ্ক ইত্যাদি দেহের কোমল অংশসমূহকে অস্থির আবরণে সুরক্ষিত রাখে।

শক্ত অস্থির কাঠামো ছাড়া দেহের স্থিতিশীল আকার সম্ভব নয়। মানবদেহের সব অস্থি এবং এদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য অংশ একত্রে কঙ্কাল গঠন করে। অস্থি ও তরুণাস্থি দ্বারা কঙ্কাল গঠিত। অস্থিসন্ধি অস্থিতন্ত্রের অংশগুলোকে সংযুক্ত করে এবং অস্থির বিচলনে সহায়তা করে। অস্থিগুলো ঐচ্ছিক মাংসপেশি দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন থাকায় ইচ্ছামতো অঙ্গ সঞ্চালন ও চলাফেরা করা সম্ভব হয়। অস্থি ও তরুণাস্থি, পেশি, পেশিবন্ধনী ও অস্থিবন্ধনী নিয়ে কঙ্কালতন্ত্র গঠিত।

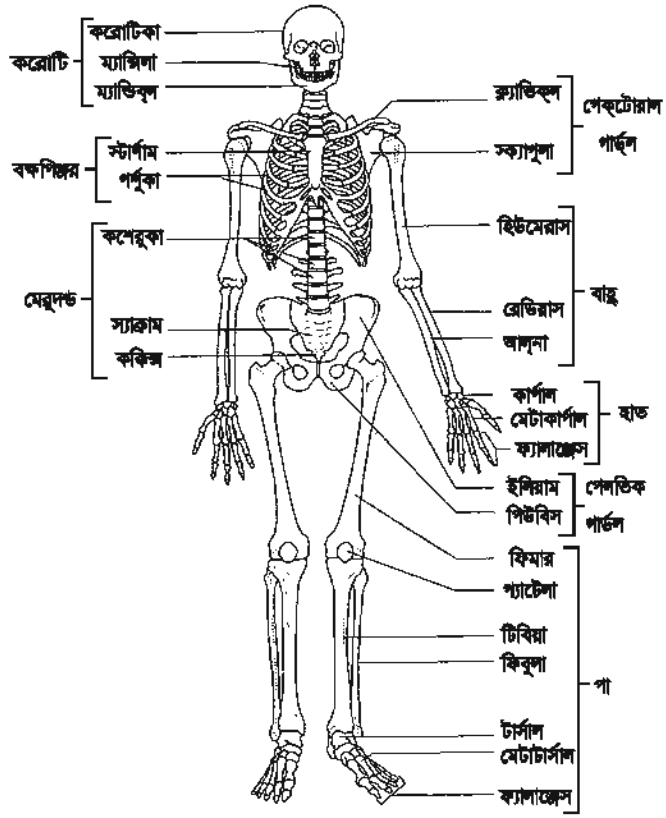

চিত্র ৯.১ : মানব কঙ্কাল

মানব দেহের কঙ্কালতন্ত্রকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. বহিঃকঙ্কাল ও ২. অন্তঃকঙ্কাল।

১. বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton): কঙ্কালের এ অংশগুলো বাইরে অবস্থান করে। যেমন– নখ, চুল, লোম এর অন্তর্ভুক্ত।

২. অন্তঃকঙ্কাল (Endoskeleton): কঙ্কাল বলতে আমরা অন্তঃকঙ্কালই বুঝি। কঙ্কালের এ অংশগুলো আমারা বাইরে থেকে দেখতে পাই না। অস্থি ও তরুণাস্থি সমন্বয়ে এ কঙ্কালতন্ত্র গঠিত।

দৃঢ়তা প্রদান এবং চলনে কঙ্কালের ভূমিকা

কঙ্কালের সাহায্যে নিম্নলিখিত কাজ সম্পন্ন হয়। যথা–

১. **দেহ কাঠামো গঠন :** কঙ্কাল মানবদেহকে একটি নির্দিষ্ট আকার ও কাঠামো দান করে। এটি নিচের অঙ্গগুলোর সাথে উপরের অঙ্গগুলোর সংযুক্তি সাধন করে।

২. **রক্ষণাবেক্ষণ ও ভারবহন :** মস্তিষ্ক করোটির মধ্যে মেরুরজ্জু মেরুদন্ডে এবং হৃদপিন্ড ও ফুসফুস বক্ষগহ্বরে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে। পেশিসমূহ কঙ্কালের সাথে আটকে থাকে এবং দেহের ভারবহনে সম্পৃক্ত।

৩. **নড়াচড়া ও চলাচল :** হাত, পা, স্কন্ধচক্র ও শ্রোণীচক্র নড়াচড়ায় সাহায্য করে। এ কাজে পেশিতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অস্থির সাথে পেশি আটকানোর ফলে অস্থি নাড়ানো সম্ভব হয় এবং আমরা চলাচল করতে পারি।

৪. **লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন :** অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়।

৫. **খনিজ লবণ সঞ্চয় :** অস্থি খনিজ লবণ (ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি) সঞ্চয় করে রাখে। এতে অস্থি শক্ত ও মজবুত থাকে।

অস্থি (Bone)

অস্থি যোজক কলার রূপান্তরিত রূপ। এটি দেহের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় কলা। অস্থির মাতৃকা বা আন্তঃকোষীয় পদার্থ একপ্রকার জৈবপদার্থ দ্বারা গঠিত। অস্থির মাতৃকা শক্ত ও ভঙ্গুর। মাতৃকার মধ্যে অস্থিকোষগুলো ছড়ানো থাকে। অস্থিকোষ অস্টিওব্লাস্ট (Osteoblast) বলা হয়। এসব কোষ শাখা–প্রশাখাযুক্ত দেখতে অনেকটা মাকড়সার মতো। অস্থি মূলত ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের বিভিন্ন যৌগ দিয়ে তৈরি। এছাড়া অস্থিতে প্রায় ৪০–৫০ ভাগ পানি থাকে। জীবিত অস্থিকোষে ৪০% জৈব এবং ৬০% অজৈব যৌগ পদার্থ নিয়ে গঠিত। অস্থি বৃদ্ধির জন্য প্রচুর ভিটামিন 'ডি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। এসব খাবারের অভাবে অস্থির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

তরুণাস্থি (Cartilage)

তরুণাস্থি অস্থির মতো শক্ত নয়। এগুলো অপেক্ষাকৃত নরম ও স্থিতিস্থাপক। এটি যোজক কলার ভিন্নরূপ। এর কোষগুলো একক বা জোড়ায় জোড়ায় খুব ঘনভাবে স্থিতিস্থাপক মাতৃকাতে বিস্তৃত থাকে। তরুণাস্থি কোষগুলি থেকে কন্ড্রিন নামক এক প্রকার শক্ত, ঈষদচ্ছ রাসায়নিক বস্তু নিঃসৃত হয়। মাতৃকা কন্ড্রিন দ্বারা গঠিত। এর বর্ণ হালকা নীল। জীবিত অবস্থায় তরুণাস্থি কোষের প্রোটোপ্লাজম খুব স্বচ্ছ থাকে, নিউক্লিয়াসটি গোলাকার, কন্ড্রিনের মাঝে গহ্বর দেখা দেয়। এগুলোকে ক্যাপসুল বা ল্যাকিউনি বলে। এর ভিতর কন্ড্রিওব্লাস্ট বা কন্ড্রিওসাইট থাকে। সব তরুণাস্থি একটি তন্তুময় যোজক কলা নির্মিত আবরণী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, একে পেরিকন্ড্রিয়াম বলে। আবরণটি দেখতে চকচকে সাদা। তাই আমরা সাধারণত তরুণাস্থি সাদা, নীলাভ ও চকচকে দেখতে পাই। আমাদের দেহে কয়েক রকম তরুণাস্থি আছে। তরুণাস্থি বিভিন্ন অস্থির সংযোগস্থলে, কিংবা অস্থির কিছু অংশে উপস্থিত থাকে। যেমন– কানের পিনার তরুণাস্থি।

কাজ : অস্থি ও তরুণাস্থির মধ্যে পার্থক্য কর।

অস্থিসন্ধি (Bonejoint)

দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি বলে। প্রতিটি অস্থিসন্ধির অস্থিসমূহ একরকম স্থিতিস্থাপক রজ্জুর মতো বন্ধনী দিয়ে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে; ফলে অস্থিগুলো সহজে সন্ধিস্থল থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। সন্ধিস্থল বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে সহায়তা করে।

আমাদের দেহের সব অস্থিসন্ধি এক রকম নয়। এদের কোনোটি একেবারে অনড়, যেমন আন্তঃকশেরুকীয় অস্থিসন্ধি, কোনোটি আবার সহজে সঞ্চালন করা যায়, যেমন হাত ও পায়ের অস্থিসন্ধি।

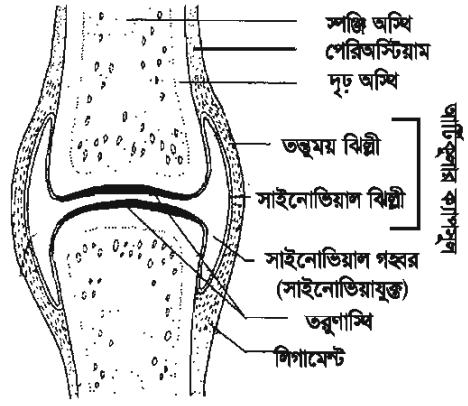

চিত্র ৯.২: সাইনোভিয়াল সন্ধি

সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি (Synovial joint) : একটি অস্থিসন্ধিতে দুটি মাত্র অস্থির বর্হিভাগ এসে মিলিত হয়ে একটি সরল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি গঠন করে। আর যখন দুয়ের অধিক অস্থি মিলিত হয় তখন একে জটিল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি বলে।

যে অস্থিসন্ধি ক্যাপসুল বা অস্থিসন্ধি আবরণী এবং সাইনোভিয়াল রস (Synovial fluid) নামক এক ধরনের তৈলাক্ত পদার্থসহ অস্থিসন্ধি গহ্বর নিয়ে গঠিত হয় তাকে সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি বলে। এ অস্থিসন্ধির অংশগুলো হলো– তরুণাস্থিতে আবৃত অস্থিপ্রান্ত, সাইনোভিয়াল রস এবং অস্থিসন্ধিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখার জন্য অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট বেষ্টিত একটি মজবুত আবরণী বা ক্যাপসুল। অস্থিসন্ধিতে সাইনোভিয়াল রস ও তরুণাস্থি থাকাতে অস্থিতে অস্থিতে ঘর্ষণ ও তজ্জনীত ক্ষয় হ্রাস পায় ও অস্থিসন্ধির নড়াচড়া করাতে কম শক্তি ব্যয় হয়।

অস্থিসন্ধি কয়েক ধরনের। যেমন–

১. **নিশ্চল অস্থিসন্ধি (Fixed joint) :** নিশ্চল অস্থিসন্ধিগুলো অনড় অর্থাৎ নাড়ানো যায় না, যেমন করোটিকা অস্থিসন্ধি।

২. **ঈষৎ সচল অস্থিসন্ধি (Slightly movable joint) :** এসব অস্থিসন্ধি একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকলেও সামান্য নড়াচড়া করতে পারে ফলে আমরা দেহকে সামনে, পিছনে ও পাশে বাঁকাতে পারি। যেমন– মেরুদন্ডের অস্থিসন্ধি।

৩. **পূর্ণ সচল অস্থিসন্ধি (Freely movable joint) :** এ সকল অস্থিসন্ধি সহজে নড়াচড়া করানো যায়। এ জাতীয় অস্থিসন্ধির মধ্যে বল ও কোটরসন্ধি, কবজাসন্ধি প্রধান।

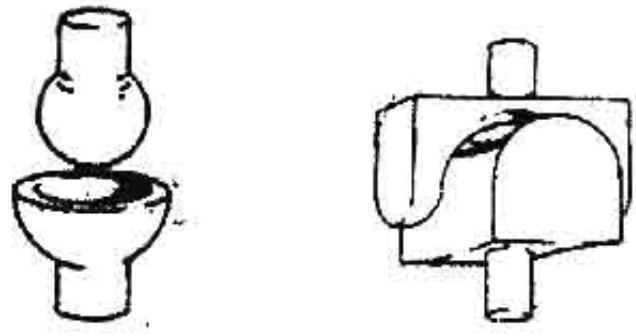

বল ও কোটর কব্জা

চিত্র ৯.৩ : বল ও কোটর এবং কব্জা অস্থি সন্ধি

বল ও কোটরসন্ধি (Ball & Socket joint) : বল ও কোটরসন্ধিতে সন্ধিস্থলে একটি অস্থির মাথার মতো গোল অংশ অন্য অস্থির কোটরে এমন ভাবে স্থাপিত থাকে যাতে অস্থিটি বাঁকানো, পার্শ্ব চালনা ও সকল দিকে নাড়ানো সম্ভবপর হয়।

কব্জাই সন্ধি (Hinge joint) : কব্জা যেমন দরজার পাল্লাকে কাঠামোর সাথে আটকে রাখে, সেরূপ কব্জার মতো সন্ধিকে কব্জা সন্ধি বলে। যেমন– হাতের কনুই, জানু এবং আঙ্গুলগুলিতে এ ধরনের সন্ধি দেখা যায়। এসব সন্ধি কেবলমাত্র এক দিকে নাড়ানো যায়।

কাজ : মানব কঙ্কালের বিভিন্ন অংশের চিত্র অংকন করে চিহ্নিত কর।

পেশির ক্রিয়া

অভ্যন্তরীন অঙ্গো ও রক্তনালি গাত্রে অনৈচ্ছিক পেশি, হৃদপিন্ডের হৃদপেশি এবং অস্থিগাত্র সংলগ্ন ঐচ্ছিক কঙ্কাল পেশি নিয়ে পেশিতন্ত্র গঠিত। তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে বিভিন্ন পেশি সম্পর্কে জেনেছ। পেশিতন্ত্র বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। যেমন–

- অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন, চলাফেরায় সহায়তা, অঙ্গ বিন্যাস ও ভারসাম্য রক্ষা করা।
- কঙ্কালতন্ত্রের সাথে যৌথভাবে দেহের নির্দিষ্ট আকার গঠন করা।
- পেশিতে গ্লাইকোজেন সঞ্চয় করে শক্তির উৎস ও ভবিষ্যতের জন্য শক্তি সংরক্ষণ করে।
- বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়ায় হৃদপেশি হৃদপিন্ডের স্পন্দন ও রক্ত সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করে।

মানুষের চলনে অস্থি ও পেশির ভূমিকা

মানুষের চলনে অস্থি ও পেশির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অস্থি দেহের কাঠামো কঙ্কাল গঠন করে। আর পেশিতন্ত্র এই কাঠামোর উপর আচ্ছাদন তৈরি করে। ঐচ্ছিক পেশি টেন্ডন নামক দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক অংশ দ্বারা অস্থিকে আটকে রাখে। স্নায়ুবিক উত্তেজনা পেশির মধ্যে উদ্দীপনা জোগানোর ফলে পেশি সংকুচিত হয়। উদ্দীপনা অপসারণে পেশি পুনরায় শ্লথ বা প্রসারিত হয়। এই সংকোচন ও প্রসারণের সহায়তায় সংলগ্ন অস্থির নড়াচড়া সম্ভব হয়। এভাবে পেশি কোনো অঙ্গকে প্রসারিত করে, দেহের কোনো অঙ্গকে ভাঁজ করে, প্রয়োজনে দেহের অক্ষ থেকে দেহের কোনো অঙ্গকে দূরে সরিয়ে দেয়, কোনো অঙ্গকে দেহের অক্ষের দিকে টেনে আনে, কোনো অঙ্গকে উপরের দিকে উঠায়, কোনো অঙ্গকে নিচে নামায় বা কোনো অঙ্গকে প্রধান অক্ষের চারপাশে, ডানে বায়ে ঘোরানো ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে। নিম্নে একটি উদাহরণ দ্বারা পেশির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা যায়। কনুই বাঁকা বা সোজা করতে হলে ঐচ্ছিক পেশি কীভাবে ক্রিয়া করে তা লক্ষ কর। কনুই বাঁকা করতে হলে ইচ্ছাধীনস্নায়ুর তাড়নায় বাইসেপস পেশি সংকুচিত হয় এবং রেডিয়াস ও আলনাকে টেনে বাঁকা করে। এ সময় ট্রাইসেপস পেশি শ্লথ হয়ে লম্বা হয়। কনুই সোজা করতে হলে ঠিক তার বিপরীত কার্যক্রমটি ঘটে। অর্থ্যাৎ ইচ্ছাধীনস্নায়ুর তাড়নায় ট্রাইসেপস পেশি সংকুচিত হয় এবং রেডিয়াস ও আলনাকে টেনে সোজা করে। এ সময় বাইসেপস পেশি শ্লথ হয়ে লম্বা হয়। এভাবে বাইসেপস ও ট্রাইসেপস পেশির সংকোচন ও শ্লথ হওয়ার মাধ্যমে আমরা কনুই বাঁকানো বা সোজা করতে পারি। এভাবে দেহের বিভিন্ন পেশি কার্যক্রমের মাধ্যমে অঙ্গ সঞ্চালন ঘটে।

চিত্র: ৯.৪ : বাহু নাড়ার কাজে বাইসেপস ও ট্রাইসেপস পেশির বিপরীত ক্রিয়া প্রদর্শন

টেনডন (Tendon) ও অস্থিবন্ধনী (Ligament)

আমরা তোমাদের যখন বলি পেশি হাড়ের সাথে আটকে থাকে অথবা একটি হাড়ের সাথে অন্য হাড় বন্ধনীর সাহায্যে আটকে থাকে, তখন তোমাদের মনে নিশ্চয় প্রশ্ন জাগে এরা কেন আটকে থাকে? কীভাবে আটকে থাকে? মাংসপেশির প্রান্তভাগ রজ্জুর মতো শক্ত হয়ে অস্থিপাতের সাথে সংযুক্ত হয়। এই শক্ত প্রান্তকে টেনডন বলে। ঘন, শ্বেত তন্তুময় যোজক টিস্যু দ্বারা টেনডন গঠিত। এসব টিস্যু শাখাপ্রশাখাবিহীন, অরঞ্জিত এবং উজ্জ্বল শ্বেততন্তু দ্বারা গঠিত। এ ধরনের টিস্যুর আন্তঃকোষীয় পদার্থ বা ম্যাট্রিক্সে শ্বেততন্তু ছড়ানো থাকে। তন্তুগুলো শ্বেতবর্ণের, শাখাবিহীন। এরা গুচ্ছাকারে ও পরস্পর সমান্তরাল ভাবে বিন্যস্ত থাকে। অনেকগুলো তন্তু একত্রে আঁটি বা বান্ডেল তৈরি করে। আঁটিগুলো একত্রে সংবদ্ধ হয়ে আঁটিগুচ্ছ তৈরি করে। আঁটিগুচ্ছগুলো তন্তুময় টিস্যুগুচ্ছ বা অ্যারিওলার টিস্যু দ্বারা বেষ্টিত হয়ে অধিকতর বড় আঁটিতে শ্রেণিবদ্ধ হয়। একে পেরিটেনিয়াম বলে। এই আঁটিগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে ফাইব্রোব্লাস্ট নামক কোষ দেখতে পাওয়া যায়। অ্যারিওলার টিস্যুর দৈর্ঘ্য বরাবর টেনডনের মধ্যে রক্তনালি, লসিকানালি এবং স্নায়ু প্রবেশ করে। এদের স্থিতিস্থাপকতা নেই। এভাবে টেনডন গঠিত হয়।

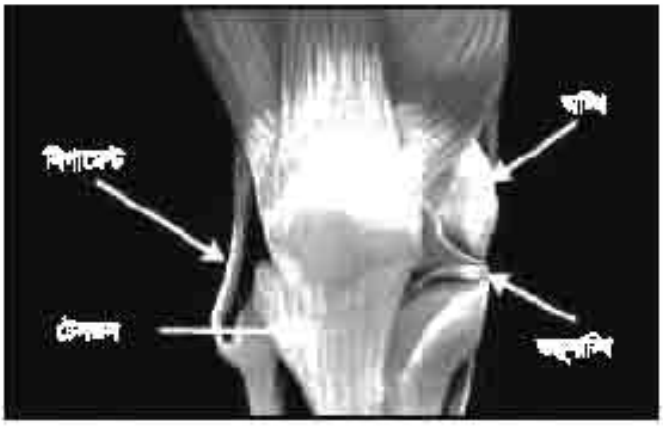

চিত্র ৯.৫ : টেনডন ও লিগামেন্ট

পেশি ও টেনডনের সংযোগ স্থলে টেনডন তন্তুগুলি পেশিতন্তুর সারকোলেমার সংযোজিত হয়। পেশি ও টেনডনের সংযোগকে আরও শক্তিশালী করার জন্য টেনডনের আঁটিগুচ্ছ বেষ্টনকারী অ্যারিওলার টিস্যু, পেশি বান্ডেল বা আঁটির আবরক টিস্যুর সাথে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ তৈরি করে। টেনডন বেশ শক্ত। পেশি বা অস্থির তুলনায় টেনডনের ভেঙে বা ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা অনেক কম। পেশিবন্ধনী পেশি প্রান্তে রজ্জুর ন্যায় শক্ত হয়ে অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে, পেশি অস্থির সাথে আবদ্ধ হয়ে দেহ কাঠামো গঠন ও দৃঢ়তা দানে সাহায্য করে, অস্থিবন্ধনী গঠনে সাহায্য করে এবং চাপটানের বিরুদ্ধে যান্ত্রিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

পাকানো কাপড়ের মতো কোমল অথচ দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা অস্থিসমূহ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। একে অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট বলে। লিগামেন্ট শ্বেততন্তু ও পীততন্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এতে পীত বর্ণের স্থিতিস্থাপক তন্তুর সংখ্যা বেশি থাকে। এর মধ্যে সরু, শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট জালকাকারে বিন্যস্ত কতকগুলো তন্তুও ছড়ানো থাকে। এ তন্তুগুলো গুচ্ছাকারে না থেকে আলাদাভাবে অবস্থান করে। এদের স্থিতিস্থাপকতা আছে। তন্তুগুলো ইলাস্টিন নামক আমিষ দ্বারা তৈরি। তন্তুগুলোর মাঝে ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থাকে। কব্জা যেমন পাল্লাকে দরজার কাঠামোর সাথে আটকে রাখে অনুরূপভাবে অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট হাড়কে আটকে রাখে। এতে জয়েন্টটি সবদিকে দোলা বা বাঁকা হয়ে সঞ্চালন করতে পারে এবং হাড়গুলি স্থানচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয় না।

কাজ। একটি খাতায় টীকা ও পূরণ কর।

বৈশিষ্ট্য	টেনডন	লিগামেন্ট
গঠন		
কাজ স্থিতিস্থাপকতা		

অস্টিওপোরেসিস (Osteoporesis)

তোমরা আগে জেনেছ, অস্থির গঠন ও দৃঢ়তার জন্য ক্যালসিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অস্থির বৃদ্ধির জন্য চাই ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য। অস্টিওপোরেসিস একটি ক্যালসিয়াম অভাবজনিত রোগ।

বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের সাধারণত এ রোগটি হয়। যেসব বয়স্ক পুরুষ বহুদিন যাবৎ স্টেরয়েডযুক্ত ঔষধ সেবন করেন তাদের ও মহিলোদের মেনোপস হওয়ার পর এ রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি। যারা অলস জীবন যাপন করেন, কায়িক পরিশ্রম কম করেন তাদের এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া অনেকদিন ধরে আর্থ্রাইটিসে ভুগলে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

কারণ

দেহে খনিজ লবণ বিশেষ করে ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে এ রোগটি হয়। মহিলাদের মেনোপস হওয়ার পর অস্থির ঘনত্ব ও পুরুত্ব কমতে থাকে।

লক্ষণ

- অস্থি ভঙ্গুর হয়ে যায়, পুরুত্ব কমতে থাকে,
- পেশির শক্তি কমতে থাকে,
- পিঠের পিছন দিকে ব্যথা অনুভব হয়,
- অস্থিতে ব্যথা অনুভব হয়।

রোগ নির্ণয়

অস্থির খনিজ পদার্থের ঘনত্বমাপক যন্ত্রের সাহায্যে এ রোগ নির্ণয় করা হয়। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় তেমন কোনো উপসর্গ দেখা দেয় না। হঠাৎ করেই সামান্য আঘাতে কোমর বা দেহের অন্যান্য কোনো অঙ্গের হাড় ভেঙ্গে যায়।

প্রতিকার

- পঞ্চাশোর্ধ পুরুষ ও মহিলাদের দৈনিক ১২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা,
- ননীতোলা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রহণ করা,
- কমলার রস, সবুজ শাকসবজি, সয়াদ্রব্য ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া।

প্রতিরোধ

- ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা,
- নিয়মিত ব্যায়াম করা,
- সুষম আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ করা।

আর্থ্রাইটিস বা গেঁটে বাত (Arthritis)

আর্থ্রাইটিস এক ধরনের বাত রোগ। অনেকদিন যাবৎ বাত জ্বরে ভুগলে এবং এর যথাযথ চিকিৎসা না করা হলে এ রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণত বয়স্করা এ রোগে আক্রান্ত হয়। কম বয়সী ছেলেমেয়েদের বেলায় গিটে ব্যথা বা যন্ত্রণা হওয়া অন্য রোগের লক্ষণ হতে পারে। যেমন– বাতজ্বর বা যক্ষ্মা।

লক্ষণ

- অস্থিসন্ধি বা গিটে প্রদাহ বা ব্যথা হয়,
- অস্থিসন্ধিগুলো শক্ত হয়ে যায়,
- অস্থিসন্ধি নাড়াতে কষ্ট হয়,
- গিট ফুলে যায়।

প্রতিকার

বয়স্কদের বেলায় এ রোগ পুরোপুরি সারানো যায় না। তবে নিচের ব্যবস্থাগুলো নিলে কিছুটা উপশম হয়।

- অত্যাধিক পরিশ্রম আর ভারী কাজ থেকে বিরত থাকা।
- সম্ভব হলে দিনের বেলায় একটু করে ঘুমিয়ে নিলে উপকার হয়।
- যন্ত্রণাদায়ক গিঁটের উপর গরম স্যাঁক নেওয়া।
- অস্থিসন্ধির নড়াচড়া ঠিক রাখতে হালকা ব্যায়াম করা।
- ডাল জাতীয় খাদ্য পরিহার করা।
- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বেদনা উপশমকারী ঔষধ সেবন ও সঠিক চিকিৎসা দ্বারা এ রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।
- স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাস করা।

প্রতিরোধ

- পর্যাপ্ত আলোবাতাস আছে এমন বাসস্থানে বাস করা।
- নিয়মিত ব্যায়াম করা।
- সুষম ও আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা।

কাজ: তোমার এলাকায় পঞ্চাশোর্ধ মহিলাদের জীবনধারা, খাদ্য গ্রহণের তথ্য সংগ্রহ কর। তাদের মধ্যে অস্টিওপোরেসিস ও আর্থ্রাইটিস এর কারণ অনুসন্ধান করে লিপিবদ্ধ কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অস্থিসন্ধি কাকে বলে।

২. কঙ্কালের পাঁচটি কাজ উল্লেখ কর।

৩. টেনডন ও লিগামেন্টের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

৪. সাইনোভিয়াল সন্ধির বৈশিষ্ট্য কী?

৫. অস্থি ও তরুণাস্থির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

রচনামূলক

১. অস্টিওপোরেসিসের কারণ ও লক্ষণগুলো লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি অস্থির বৈশিষ্ট্য?

ক. স্থিতিস্থাপক খ. নরম

গ. দৃঢ় ঘ. তন্তুময়

২. টেনডনের টিস্যু হচ্ছে–

i. সাদা বর্ণের ও উজ্জ্বল

ii. অশাখ ও তরঙ্গিত

iii. তন্তুময় ও গুচ্ছাকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

৬০ বছরের রহিমা বেগম হাত পায়ের ব্যথার জন্য তেমন কাজ করতে পারেন না। চিকিৎসক বলেছেন তার শরীরে ক্যালসিয়ামের অস্টিওপোরেসিস রোগ হয়েছে।

৩. রহিমা বেগমের উক্ত রোগের লক্ষণ কোনটি?

ক. অস্থির পুরুত্ব বেড়ে যাওয়া খ. অস্থি ভঙ্গুর হয়ে যায়

গ. কোমরে ব্যথা অনুভব করা ঘ. পেশি শক্তি বাড়তে থাকা

৪. রহিমা বেগমের উক্ত রোগটি প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে–

i. রাফেজযুক্ত খাবার খাওয়া

ii. অলসময় জীবন পরিহার করা

iii. ভিটামিন ডি যুক্ত খাদ্য কম খাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ১২ বছরের বিনিতা বেশ স্বাস্থ্যবান এবং চঞ্চল প্রকৃতির। সে তার সারা দিনের কার্যক্রমের অনেকটা সময় দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলা করে কাটায়। একদিন সে দৌড়াতে গিয়ে পড়ে গেলে পায়ের লিগামেন্টে আঘাত পায়।

ক. অস্থি কী?

খ. গেঁটেবাত বলতে কী বুঝায়?

গ. বিনিতার আঘাতপ্রাপ্ত অংশটি দরজার কবজার সাথে তুলনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বিনিতার কার্যক্রমটি সম্পন্ন করতে কীসের সমন্বয় অপরিহার্য–বিশ্লেষণ কর।

২.

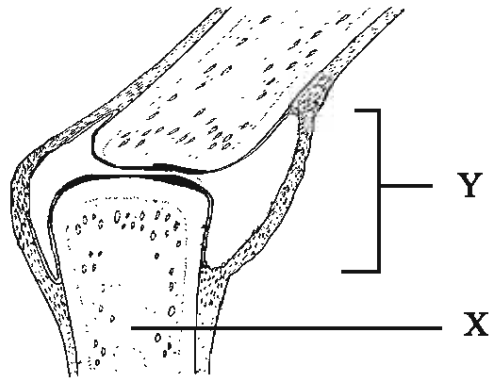

ক. টেনডন কী?

খ. অস্টিওপোরেসিস বলতে কী বুঝায়?

গ. দেহের X অংশটির কোষের গঠন ভিন্ন কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. X ও Y উভয়ের সমন্বিত কার্যক্রম কীভাবে অঙ্গ সঞ্চালনে ভূমিকা রাখে? বিশেরষণ কর।

দশম অধ্যায়

সমন্বয়

আমরা জানি যে,জীব দেহে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া বিক্রিয়া অবিরামভাবে চলছে।এ কাজগুলো একযোগে চলে বলে এ কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয় (Co-ordination) একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে জীবের জীবনে নানারকমের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন কাজ যেমন– প্রজনন, বিপাক, অঙ্কুরোদগম, সুপ্তাবস্থা, বৃদ্ধি, চলন ইত্যাদি সকল শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। মানবদেহেও তেমনি বিভিন্ন কাজের মধ্যে সম্বনয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন– মানব মস্তিষ্ক ও হরমোনের সমন্বয়। এ অধ্যায়ে উদ্ভিদ ও মানব দেহের সংঘটিত বিভিন্ন সমন্বয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

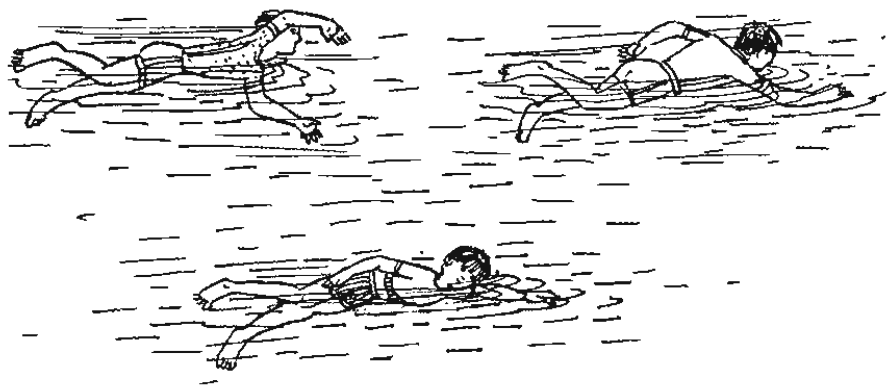

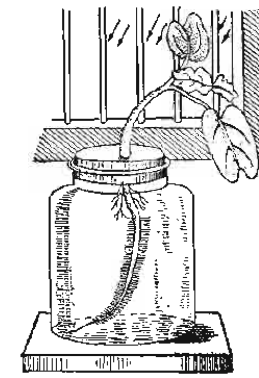

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- উদ্ভিদে সমন্বয় প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণীর সমন্বয় প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাধারণ নিউরনের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রতিবর্তী প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আবেগ সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণরস বা হরমোনের প্রধান কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণরস বা হরমোনের অস্বাভাবিকতার কারণ ও এটি থেকে সৃষ্ট প্রধান শারীরিক সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- স্ট্রোকের কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- স্ট্রোকে তাৎক্ষণিক করণীয় ও প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- স্নায়ুবিক বৈকল্য জনিত শারীরিক সমস্যার লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- সমন্বয় কার্যক্রমে তামাক ও মাদক দ্রব্যের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হরমোনজনিত শারীরিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে পারব।
- পোস্টার/লিফলেট অঙ্কন করে তামাক ও মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- স্নায়ুতন্ত্রে তামাক ও মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হব।

উদ্ভিদে সমন্বয়

প্রাণীর মতো প্রতিটি উদ্ভিদ কোষেও বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম একযোগে প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। এ কাজগুলো একটি নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এ কারণে উদ্ভিদ জীবনে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় (Co-ordination) একটি অপরিহার্য কার্যক্রম। এ সমন্বয় না থাকলে উদ্ভিদ জীবনে বিভিন্ন রকমের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

একটি উদ্ভিদের জীবনকালে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবন চক্রের পর্যায়গুলো, যেমন অঙ্কুরোদগম, বৃদ্ধি ও বিকাশ, পুষ্পায়ন, ফল সৃষ্টি, বার্ধক্যপ্রাপ্তি, সুপ্তাবস্থা ইত্যাদি একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনে চলে। এসব কাজে আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত প্রভাবকগুলোর গুরুত্বও লক্ষ করার মতো।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও চলনসহ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত জটিল ও চলমান। তা সত্ত্বেও এ কাজ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিশেষ নিয়ম মেনে সম্পন্ন হয়। একটি কাজ কোনো ভাবেই অন্য কাজকে বাধা প্রদান করে না।

বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন কীভাবে হয়? উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ, বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি ইত্যাদি উদ্ভিদ দেহে উৎপাদিত বিশেষ এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে হয়ে থাকে। যা সকল কাজকেই নিয়ন্ত্রণ করে। এ পদার্থকে হরমোন বা প্রাণরস বলে। উদ্ভিদের এই জৈব রাসায়নিক পদার্থটিকে ফাইটোহরমোন (Phytohormones) বলা হয়। কেউ কেউ ফাইটোহরমোনকে উদ্ভিদ বৃদ্ধিকারক বস্তু (Plant growth substances) হিসেবে আখ্যায়িত করতে চান। অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে যে রাসায়নিক বস্তুটি কোষে উৎপন্ন হয়ে উৎপত্তি স্থল থেকে বাহিত হয়ে দূরবর্তী স্থানের কোষ বা কোষপুঞ্জের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে তাই হরমোন (Hormone)। উদ্ভিদের প্রতিটি কোষই হরমোন উৎপন্ন করতে সক্ষম।এরা কোনো পুষ্টি দ্রব্য নয় তবে ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপন্ন হয়ে কোষের বিভিন্নতা সৃষ্টি ও দেহের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। প্রাকৃতিক প্রধান হরমোনগুলো হলো অক্সিন (Auxin), জিবেরেলিন (Gibberellin), সাইটোকাইনিন (Cytokinin), অ্যাবসিসিক এসিড (Absicic acid), ইথিলিন (Ethylene) ইত্যাদি। উদ্ভিদে যেসব হরমোন পাওয়া যায় সেগুলো হলো– অক্সিন, জিবেরেলিন, সাইটোকাইনিন এবং অ্যাবসিসিক এসিড।

উল্লিখিত এসব হরমোন ছাড়াও উদ্ভিদে আরও কিছু হরমোন রয়েছে যাদের আলাদা করা বা শনাক্ত করা যায় নি। এদের পুস্টুলেটেড হরমোন (Postulated hormones) বলে। এরা প্রধানত উদ্ভিদের ফুল ও জনন সংশ্লিষ্ট অঙ্গের বিকাশে সাহায্য করে। এদের মধ্যে ফ্লোরিজেন (Florigen) এবং ভার্নালিন (Vernalin) প্রধান। ফ্লোরিজেন পাতায় উৎপন্ন হয় এবং তা পত্রমূলে স্থানান্তরিত হয়ে পত্রমুকুলকে পুষ্পমুকুল হিসেবে রূপান্তরিত করে। তাই দেখা যায় ফ্লোরিজেন উদ্ভিদে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে।

নিচে প্রধান ফাইটোহরমোনগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

অক্সিন : [চার্লস ডারউইন এ হরমোন প্রথম আবিস্কার করেন। যাকে কোল (Kogl) ও হ্যাগেন স্নিট (Haagen Snit) পরবর্তীতে অক্সিন নামে অভিহিত করেন। চার্লস ডারউইন উদ্ভিদের ভ্রূণমুকুলাবরণীর (Coleoptiles) এর উপর আলোর প্রভাব লক্ষ্য করেন]। যখন আলো তীর্যক ভাবে একদিকে লাগে তখন ভ্রূণমুকুলাবরণী আলোর উৎসের দিকে বেঁকে যায়। অথচ অন্ধকারে খাড়াভাবে বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাবে অবস্থিত এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ এর জন্য দায়ী। ঐ পদার্থটি অক্সিন নামক হরমোন । অক্সিন প্রয়োগে শাখা কলমে মূল গজায়, ফলের অকাল ঝরে পড়া রোধ করে। উদ্ভিদ কোষে অক্সিনের পরিবহন নিম্নমুখ ভাবে হয়। অক্সিন এর প্রভাবে অভিস্রবন ও শ্বসন ক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায়।বীজহীন ফল উৎপাদনেও এর ব্যবহার রয়েছে।

জিবেরেলিন : ধানের ব্যাকানি (Bakanae) রোগের জীবাণু এক প্রকার ছত্রাক যা ধান গাছের অতি বৃদ্ধি ঘটায়। এই ছত্রাক থেকে এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশিত হয়, যার প্রভাবেই এরূপ অতিবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই পদার্থটি জিবেরেলিন। অধিকাংশ জিবেরেলিন উদ্ভিদের পাকা বীজে থাকে তবে চারাগাছ, বীজপত্র ও পত্রের বর্ধিষ্ণু অঞ্চলেও তা দেখা যায়। এর প্রভাবে উদ্ভিদের পর্বমধ্যগুলো দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। ফলে উদ্ভিদ কান্ডের অতিবৃদ্ধি ঘটে। এ জন্য খাটো উদ্ভিদে এ হরমোন প্রয়োগ করলে উদ্ভিদটি অন্যান্য সাধারণ উদ্ভিদ থেকেও অধিক লম্বা হয়। ফুল ফোটাতে এবং বীজের সুপ্তাবস্থা দৈর্ঘ্য কমাতে এবং অংকুরোদ্গমে এর কার্যকারিতা রয়েছে।

সাইটোকাইনিন : এ ফাইটোহরমোন বা উদ্ভিদ হরমোনটি ফল, সস্য ও ডাবের পানিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো উদ্ভিদের মূলেও এদের পাওয়া যায়। সাধারণভাবে এরা বিভিন্ন ঘনত্বে অক্সিনের সাথে যুক্ত হয়ে কোষ বিভাজনকে উদ্দীপিত করে। এছাড়া কোষবৃদ্ধি, অঙ্গের বিকাশ সাধন, বীজ ও অঙ্গের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করা ও বার্ধক্য বিলম্বিতকরণে এ হরমোন ভূমিকা পালন করে। কোষে বিভাজনের সময় সাইটোকাইনিন হরমোনের প্রভাবে কোষের সাইটোকাইনেসিস ঘটে।

ইথিলিন : এ হরমোনটি একটি গ্যাসীয় পদার্থ। এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে। এ হরমোন ফল, ফুল, বীজ, পাতা এবং মূলেও দেখা যায়। ইথিলিন বীজ ও মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করে, চারা গাছকে অত্যাধিক লম্বা করে, চারা গাছের বৃদ্ধি,কান্ডের বৃদ্ধি, ফুল ও ফল সৃষ্টির সূচনা করে। ইথিলিন পাতা, ফুল ও ফলের ঝরে পড়া ত্বরান্বিত করে।

হরমোনের ব্যবহার: অক্সিন ও অন্যান্য কৃত্রিম হরমোন শাখাকলমে মূল উৎপাদনে সাহায্য করে। ইন্ডোল অ্যাসিটিক এসিড (IAA) নামে এক ধরনের অক্সিজেনের প্রভাবে ক্যাম্বিয়ামের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্যালাস নামক (Callus) এক প্রকার অনিয়ন্ত্রিত কোষগুচ্ছের সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতস্থান পূরণ হয়। অক্সিন প্রয়োগ করে ফলের মোচন বিলম্বিত করা হয়। বীজহীন ফল উৎপাদনে অক্সিন ও জিবেরেলিন এর ব্যবহার রয়েছে।

বৃদ্ধি (Growth)

উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ বিকাশের ক্ষেত্রে আলো ও উষ্ণতার প্রভাব লক্ষণীয়। এর ফলে বিভিন্ন সংশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান উৎপন্ন হয়ে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি করে। কারো মতে আলোর উপস্থিতিতে অক্সিন হরমোন নিস্ক্রিয় হয়ে যায় ফলে অন্ধকার দিনে অক্সিনের ঘনত্ব বাড়ে। কেউ মনে করেন যে আলোর দিকের অংশের অক্সিন অন্ধকার দিকে চলে যায় ফলে সেদিকে বৃদ্ধি বেশি হয় ও আলোকিত অংশের বৃদ্ধি ব্যহত হয় ফলে উদ্ভিদটি আলোর দিকে বেঁকে যায়।

ভ্রূণমূল বা ভ্রূণকান্ডের অগ্রাংশ অভিকর্ষের উদ্দীপনা অনুভব করতে পারে। একে অভিকর্ষ উপলব্ধি (Geoperception) বলে।অভিকর্ষণের ফলে কোষের উপাদানগুলো নিচে স্থানান্তরিত হয়। এদের চাপ পড়ে পার্শ্বীয় কোষের প্রাচীরে। এর ফলে অভিকর্ষণীয় চলন দেখা যায়। উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ বিকাশের ক্ষেত্রে আলো ও উষ্ণতার প্রভাব লক্ষণীয়। এর ফলে বিভিন্ন সংশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান উৎপন্ন হয়ে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি করে। এর ফলে কোষের উপাদানগুলি নিচে স্থানান্তরিত হয়।

চন্দ্রমল্লিকা একটি হ্রস্বদিবা উদ্ভিদ। উদ্ভিদটির পত্র আলোক পর্যায়ের উদ্দীপক উপলব্ধির স্থান বলে পরিগণিত হয়। দীর্ঘ অন্ধকার দীর্ঘদিবা উদ্ভিদে পুস্প উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু দীর্ঘ আলোক প্রাপ্ত ঐসব উদ্ভিদে পুস্প উৎপাদনে সহায়ক। অতএব বলা যায় উদ্ভিদের পুস্প প্রস্ফুটন দিবাদৈর্ঘ্যের উপর অধিক নির্ভরশীল। উদ্ভিদে আলো–অন্ধকারের ছন্দকে বায়োলজিক্যাল ক্লক বলে।

উদ্ভিদের আলো–অন্ধকারের ছন্দের উপর ভিত্তিকরে পুষ্পধারী উদ্ভিদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১. ছোট দিনের উদ্ভিদ : পুষ্পায়নে দৈনিক গড়ে ৮–১২ ঘণ্টা আলো প্রয়োজন। যেমন– চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া।

২. বড় দিনের উদ্ভিদ : পুষ্পায়নে দৈনিক গড়ে ১২–১৬ ঘণ্টা আলো প্রয়োজন যেমন– লেটুস, ঝিঙা।

৩. আলোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ : পুষ্পায়নে দিনের আলো কোনো প্রভাব ফেলে না। যেমন– শসা, সূর্যমুখী।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্পায়নে আলোর মতো তাপ ও শৈত্যেরও প্রভাব রয়েছে। দেখা গেছে অনেক উদ্ভিদের অঙ্কুরিত বীজকে শৈত্য প্রদান করা হলে তাদের ফুল ধারনের সময় এগিয়ে আসে। শৈত্য প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভিদের ফুল ধারণ কে ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়াকে ভার্নালাইজেশন (Vernalization) বলে। উদ্ভিদে পুষ্প সৃষ্টিতে উষ্ণতার প্রভাব বিজ্ঞানীরা প্রমান করেছেন। শীতের গম গরমকালে লাগালে ফুল আসতে বহু দেরি হয়। কিন্তু বীজ রোপণের পর ২°–৫° উষ্ণতা প্রয়োগ করলে উদ্ভিদে স্বাভাবিক পুষ্প প্রস্ফুটন ঘটে। বিভিন্ন উদ্দীপক, যেমন আলো, অভিকর্ষ ইত্যাদি উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।

এভাবেই উদ্ভিদ তার শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়।

চলন (Movement)

উদ্ভিদ অন্যান্য জীবের মতো অনুভূতি ক্ষমতা সম্পন্ন। এজন্য অভ্যন্তরীন বা বহিঃ উদ্দীপক উদ্ভিদ দেহে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তার ফলে উদ্ভিদে চলন সংঘটিত হয়। কতোগুলো চলন উদ্ভিদ দেহের বৃদ্ধিজনিত আবার কিছু চলন অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বীক উদ্দীপকের প্রভাবে হয়ে থাকে। চলন যে ভাবেই হোক না কেন তা অবশ্যই কোনো না কোনো প্রভাবকের কারণে ঘটে থাকে।

উদ্ভিদ চলনকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা– সামগ্রিক চলন (Movement of locomotion) ও বক্রচলন (Movement of curvature)। উদ্ভিদ দেহের কোনো অংশ যখন সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনের তাগিদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে তাকে সামগ্রিক চলন বলে। যেমন, ছত্রাক ও উন্নত শ্রেণির উদ্ভিদের যৌন জনন কোষ (Gamets) এবং জুস্পোরে এ ধরনের চলন দেখা যায়। তাছাড়া কিছু ব্যাকটেরিয়া ও কিছু শৈবালে যেমন–*Volvox*, *Chlamydomonas* ও ডায়াটম শৈবালেও এ ধরনের চলন পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে মাটিতে আবদ্ধ উন্নত শ্রেণির উদ্ভিদ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করতে পারে না। তবে প্রয়োজনে এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে চালনা করতে পারে এবং এদের অঙ্গগুলো নানাভাবে বেঁকে যায়। এ ধরনের চলনকে বক্রচলন বলে। কাণ্ডের আলোকমুখী চলন, মূলের অন্ধকারমুখী চলন, আকর্ষীর অবলম্বনকে পেঁচিয়ে ধরা ইত্যাদি বক্রচলনের উদাহরণ। সামগ্রিক চলন ও বক্রচলন আবার নানা ধরনের হয়। তার মধ্যে ফটোট্রপিক চলন উল্লেখযোগ্য। নিচে ফটোট্রপিক চলন বা ফটোট্রপিজম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

চিত্র–১০.১: উদ্ভিদের আলোর প্রতি সাড়া প্রদান।

ফটোট্রপিক চলন বা ফটোট্রপিজম (Phototropic movement or phototropism) : ফটোট্রপিক চলন এক ধরনের বক্রচলন। উদ্ভিদের কান্ড ও শাখা প্রশাখার সবসময় আলোর দিকে চলন ঘটে এবং মূলের চলন সবসময় আলোর বিপরীত দিকে হয়। কান্ডের আলোর দিকে চলনকে পজিটিভ ফটোট্রপিজম এবং মূলের আলোর বিপরীত দিকে চলনকে নেগেটিভ ফটোট্রপিজম বলে।

কাজ–১ : শ্রেণিকক্ষের জানালায় টবসহ একটি উদ্ভিদ রেখে এক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ কর এবং প্রাপ্ত ফলাফল যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

কাজ–২ : কয়েকটি অঙ্কুরিত ছোলা বীজের সাহায্যে মূলের ভূ–অভিমুখী চলন পরীক্ষা কর ও প্রাপ্ত ফলাফল যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

প্রাণীর সমন্বয় প্রক্রিয়া

হরমোনাল প্রভাব : প্রাণীর প্রয়োজনীয় সমন্বয় কাজ স্নায়ু ছাড়া ও হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। হরমোন কী তা তোমরা পরবর্তী অধ্যায়ে জানতে পারবে। হরমোনের কারণে প্রাণী তার কার্যকলাপ অর্থাৎ নড়াচড়া বা আচরনের পরিবর্তন করে থাকে। এই বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রচুর গবেষণা হয়েছে। হরমোন নানা ধরনের নালিহীন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। নালিহীন গ্রন্থিগুলো একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেখা গেছে নালিহীন গ্রন্থির কার্যকলাপ আবার স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ব্যাপারটা এই রকম যে কোনো কারখানার কার্যক্রমে হরমোনকে যদি শ্রমিক ধরা হয়, তবে সার্বিকভাবে কোন শ্রমিক, কোথায়, কতক্ষণ কাজ করবে তা যেমন ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণ করেন তেমনটি 'স্নায়ুতন্ত্র'হরমোনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

সমন্বয় সাধনে নানা প্রাণী হরমোন ব্যবহার করে। কোনো পিঁপড়া খাদ্যের খোঁজ পেলে খাদ্য উৎস থেকে বাসায় আসার পথে এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত করে। যাকে ফেরোমন বলে। এর উপর নির্ভর করে অন্য পিঁপড়াগুলোও খাদ্য উৎসে যায় এবং খাদ্য সংগ্রহ করে বাসায় ফিরে আসে। এই কারণে পিঁপড়াদের এক সারিতে চলাচল করতে দেখা যায়। খাদ্য শেষ হলে পিঁপড়া ফেরোমন নিঃস্বরণ বন্ধ করে দেয়, যা বাতাসে উবে যায় সহজেই আর অন্য পিঁপড়াদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য না যেতে প্রভাবিত করে। কোনো কোনো পতঙ্গ ফেরোমন দিয়ে তার স্ব–প্রজাতির সঙ্গীকে খুজে পেতে পারে। দেখা গেছে কোনো কোনো পতঙ্গ বাতাসে ফেরোমন নিঃসৃত করলে ২–৪ কিলোমিটার দূর থেকে তার সঙ্গীরা আকৃষ্ট হয়। তোমরা হয়তো ফেরোমন ব্যবহারে পোকা ধ্বংসের কাজটি দেখেছ। এখানে ফেরোমনের কারণে আকৃষ্ট হয়ে অনিষ্টকারী পোকা ফাঁদে ও পানিতে ডুবে মারা যায়। অনিষ্টকারী পোকা দমনে এ পদ্ধতিটি খুবই পরিবেশ বান্ধব।

স্নায়ুবিক প্রভাব

হাঁটাচলা, উঠাবসা, কথা বলা, চিন্তা করা, পড়া মুখস্থ করা, হাসিকান্না ইত্যাদি কাজগুলো করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ অংশ নেয়। এ অঙ্গগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে একটি সমন্বয় ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনতন্ত্র দেহের কাজ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করে। যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধন করে এবং তাদের কাজে সুসংবদ্ধতা আনায়ন ও শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকেই স্নায়ুতন্ত্র বলে।

আমাদের সমগ্র দেহের বিভিন্ন কাজের সুসংবদ্ধতার জন্য প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ কোষের কাজের সমন্বয় সাধন (Co-ordination)। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধনের জন স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেহ চলে পরিবেশের উদ্দীপনা ও সাড়া জাগানোর ফলে। দেহের বাইরের জগৎ হলো বাহ্যিক পরিবেশ এবং দেহের ভিতর হলো অভ্যন্তরীণ পরিবেশ। বাহ্যিক পরিবেশের উদ্দীপক হলো আলো, গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শ। এসব চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং চর্মের অনুভূতিবাহীস্নায়ু প্রান্তে উদ্দীপনা জাগায়। অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উদ্দীপক হলো চাপ, তাপ ও বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু। এরা অভ্যন্তরীণ অঙ্গের কেন্দ্রমুখী প্রান্তে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। যেকোনো উদ্দীপক অনুভূতি ও কেন্দ্রমুখী স্নায়ুতে তাড়না সৃষ্টি করে। এই তাড়না মস্তিষ্কে পৌঁছে। মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নিয়ে আজ্ঞাবাহী বা মোটরস্নায়ু যোগে তাড়না পাঠিয়ে পেশি কিংবা গ্রন্থিতে সাড়া জাগায় ও কোনো কাজ করতে সাহায্য করে।

স্নায়ুতন্ত্র ছাড়াও হরমোন নামক বিশেষ কতগুলো রাসায়নিক দ্রব্য দেহের সমন্বয়ে অংশ নেয়। তবে এরা মস্তিষ্কের অধীন। প্রথমে ধারণা ছিল সব হরমোনই উত্তেজক পদার্থ। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে সব হরমোন উত্তেজক নয়, এদের মধ্যে কিছু রোধক আছে। হরমোন অতি অল্প পরিমাণে বিশেষ বিশেষ শারীরবৃত্তীয় কাজ বা পদ্ধতি সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এরা উত্তেজক বা রোধক হিসেবে দেহের পরিস্ফুটন, বৃদ্ধি ও বিভিন্ন টিস্যুর কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির আচরণ, স্বভাব ও আবেগ প্রবণতার উপরও হরমোনের প্রভাব অপরিসীম। এগুলো রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী কোনো কোষ বা অঙ্গাকে উদ্দীপিত করে। এজন্য এদেরকে রাসায়নিক দূত হিসেবে অভিহিত করা হয়।

স্নায়ুতন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গা ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং দেহের উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে। স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ দেহের বিভিন্ন অংশে উদ্দীপনা বহন করা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধন করা এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা।

নিচে স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাস ছকে দেওয়া হলো:–

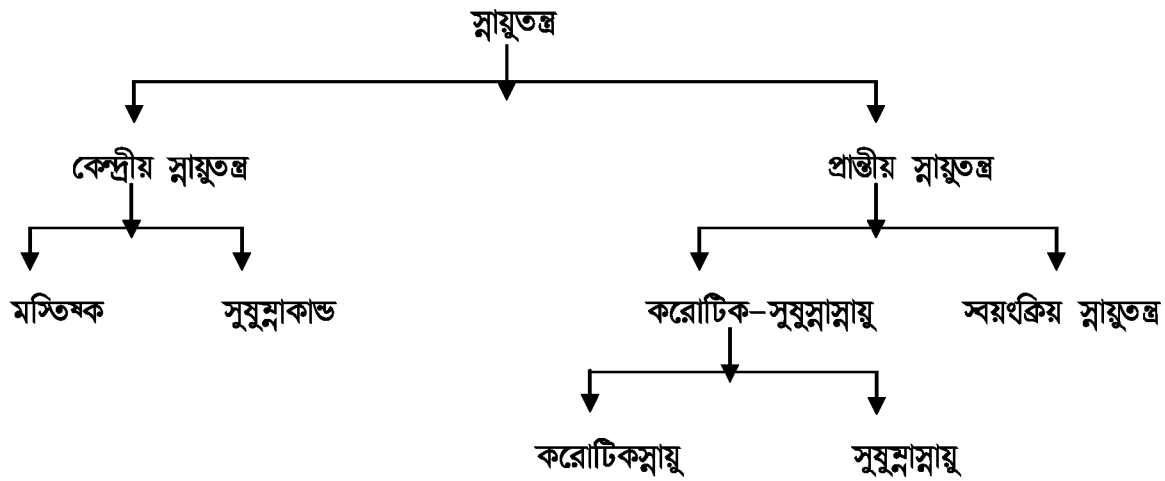

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system)

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড দ্বারা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। মস্তিষ্ক করোটির মধ্যে সুরক্ষিত থাকে।

মস্তিষ্ক (Brain)

সুষুম্নাকাণ্ডের শীর্ষে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত অংশ করোটির মধ্যে অবস্থান করে, তাকে মস্তিষ্ক বলে। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের পরিচালক। মস্তিষ্ক তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা– ক. অগ্র মস্তিষ্ক খ. মধ্য মস্তিষ্ক এবং গ. পশ্চাৎ মস্তিষ্ক।

ক. অগ্র মস্তিষ্ক (Forebrain বা Prosencephalon) : মস্তিষ্কের মধ্যে সেরিব্রাম সবচেয়ে বড় অংশ। সেরিব্রামের ডান ও বাম অংশ দুটি অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত। দুটি অংশের মাঝখানে বিভেদক খাঁজ থাকায় এ বিভক্তি ঘটে। এদের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার (Cerebral hemisphere) বলা হয়। বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান অংশ এবং ডান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের এ অংশটির উপরিভাগ ঢেউ তোলা। মানুষের সেরিব্রামের বাম অংশ তুলনামূলকভাবে বেশি উন্নত। সেরিব্রামকে গুরুমস্তিষ্ক বলা হয়। এটি মেনেনজেস নামক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। এর বাইরের স্তরের নাম কর্টেক্স। কর্টেক্স অসংখ্য নিউরন দ্বারা গঠিত। এর রং ধূসর। তাই কর্টেক্সের অপর নাম গ্রেম্যাটার (Gray matter) বা ধূসর পদার্থ যা মেরুদণ্ডের ভিতর আন্তঃযোগাযোগ রক্ষা করে।

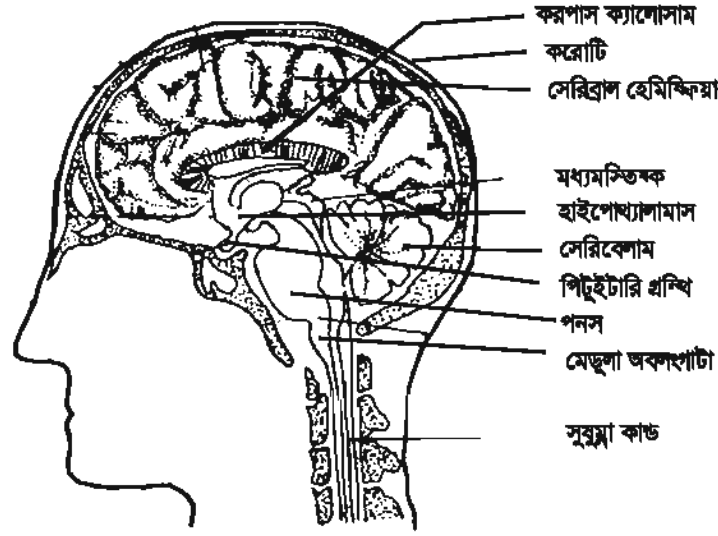

চিত্র ১০.২ : মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

সেরিব্রামের ভিতরের স্তরে স্নায়ুতন্তু থাকে। স্নায়ুতন্তুর রং সাদা। এই স্তরের নাম শ্বেত পদার্থ (White matter)। শ্বেত পদার্থ মেরুরজ্জুর উপরে ও নিচে স্নায়ু তাড়না বহন করে।

সেরিব্রাম হলো প্রত্যেক অঙ্গ থেকে স্নায়ু তাড়না গ্রহণের এবং প্রত্যেক অঙ্গে স্নায়ু তাড়না প্রেরণের উচ্চতর অঙ্গ। দেহ সঞ্চালন তথা প্রত্যেক কাজের ও অনুভূতির কেন্দ্র হলো সেরিব্রাম। এটি আমাদের চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান, স্মৃতি, ইচ্ছা, বাকশক্তি ও ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। কোন উদ্দীপকের প্রতি কি ধরনের সাড়া দিবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

খ. মধ্যমস্তিষ্ক (Midbrain বা Mesencephalon) : পশ্চাৎ মস্তিষ্কের উপরের অংশ হলো মধ্যমস্তিষ্ক। এটি অগ্র ও পশ্চাৎ মস্তিষ্ককে সংযুক্ত করে। মধ্যমস্তিষ্কের পিছনে অবস্থিত নলাকৃতি বৃহৎ অংশের নাম পনস। এটি সেরিবেলাম ও মেডুলা অবলংগাটার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। বিভিন্ন পেশির কাজের সমন্বয় সাধন ও ভারসাম্য রক্ষা করা মধ্যমস্তিষ্কের কাজ।

গ. পশ্চাৎ মস্তিষ্ক (Hindbrain বা Rhombencephalon) : এটি সেরিবেলাম, পনস ও মেডুলা অবলংগাটা নিয়ে গঠিত।

সেরিবেলাম (Cerebellum) : পনসের পৃষ্ঠীয় ভাগে অবস্থিত খণ্ডাংশটি সেরিবেলাম। এটি ডান ও বাম দুই অংশে বিভক্ত। এর বাইরের দিকে ধূসর পদার্থের আবরণ ও ভিতরের দিকে শ্বেত পদার্থ থাকে।

সেরিবেলাম দেহের পেশির টান নিয়ন্ত্রণ, চলনে সমন্বয় সাধন, দেহের ভারসাম্য রক্ষা, দৌড়ানো ও লাফানোর কাজে জড়িত পেশিগুলোর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে।

পনস (Pons) : মেডুলা অবলংগাটা ও মধ্যমস্তিষ্কের মাঝখানে পনস অবস্থিত। এটি একপুচ্ছ স্নায়ুতন্ত্রের সমন্বয়ে তৈরি।

মেডুলা অবলংগাটা (Medulla oblongata) : এটি মস্তিষ্কের সবচেয়ে পিছনের অংশ। এর সামনের দিকে রয়েছে পনস, পিছনের দিক সুষুম্না কাণ্ডের উপরিভাগের সাথে যুক্ত।

মোট বারো জোড়া করোটিক স্নায়ুর (Cranial nerves) মধ্যে মেডুলা অবলংগাটা থেকে আট জোড়া করোটিক স্নায়ু উৎপন্ন হয়। এসব স্নায়ু খাদ্য গলাধঃকরণ, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, গলবিল ইত্যাদির কিছু কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া এই স্নায়ুগুলো শ্রবণ ও ভারসাম্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত।

মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়া বার জোড়া করোটিক স্নায়ু মাথা, ঘাড়, মুখমণ্ডল, মুখগহ্বর, জিহ্বা, চোখ, নাক, কান ইত্যাদি অঞ্চলে বিস্তৃত। স্নায়ুগুলো সংবেদী অথবা মোটর অথবা মিশ্র প্রকৃতির।

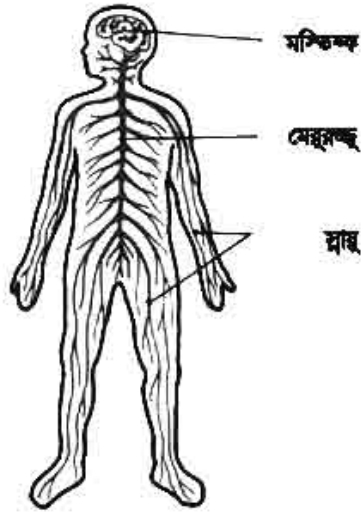

চিত্র ১০.৩ : মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

মেরুরজ্জু (Spinal cord) : মেরুরজ্জু করোটির পিছনে অবস্থিত মহা ছিদ্রটি (Foramen magnum) থেকে কটিদেশে কশেরুকা পর্যন্ত প্রলম্বিত। মেরুরজ্জু মেরুদণ্ডের কশেরুকার ভিতরের ছিদ্রপথে সুরক্ষিত থাকে।

মেরুরজ্জুতে শ্বেত পদার্থ ও ধূসর পদার্থ থাকে। তবে এদের অবস্থান মস্তিষ্কের ঠিক উল্টো। অর্থাৎ শ্বেত পদার্থ থাকে বাইরে আর ভিতরে থাকে ধূসর পদার্থ। দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী ছিদ্র দিয়ে মেরুরজ্জু থেকে ৩১ জোড়া মেরুরজ্জীয় স্নায়ু বের হয়। এসব ঘাড়, গলা, বুক, পিঠ, হাত ও পায়ের স্নায়ু। এসব স্নায়ু মিশ্র প্রকৃতির। মানবদেহে স্নায়ুতন্ত্র যে কাজগুলো করতে সাহায্য করে তা হলো বিভিন্ন উদ্দীপনা গ্রহণ করা এবং তদানুযায়ী উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করা, স্মৃতি সংরক্ষণ করা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা ও বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের সমন্বয় করা।

স্নায়ুকলা (Nervous tissue)

যে কলা দেহের সব ধরনের সংবেদন ও উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং তা পরিবহনের মাধ্যমে উদ্দীপনা অনুসারে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে সেটাই স্নায়ুকলা। বহু সংখ্যক স্নায়ুকোষ বা নিউরনের সমন্বয়ে স্নায়ুটিস্যু গঠিত। নিউরনই স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যিক একক।

নিউরনের গঠন

প্রতিটি নিউরন দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত, যথা– ক. কোষদেহ এবং খ. প্রলম্বিত অংশ।

ক. কোষদেহ (Cell body) : প্লাজমা মেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস সমন্বয়ে গঠিত নিউরনের গোলাকার, তারকাকার, অথবা ডিম্বাকার অংশ কোষদেহ নামে পরিচিত। সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিবস্তু, লাইসোসোম,

চর্বি, গ্লাইকোজেন, রঞ্জক কণাসহ অসংখ্য নিসল দানা থাকে।

খ. প্রলম্বিত অংশ : কোষদেহ থেকে সৃষ্ট শাখা প্রশাখাকেই প্রলম্বিত অংশ বলে। প্রলম্বিত অংশ দুই ধরনের, যথা–

১) ডেনড্রাইট (Dendrite) : কোষদেহের চারদিকের শাখাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশকে ডেনড্রাইট বলে। একটি নিউরনে ডেনড্রাইট সংখ্যা শূন্য থেকে কয়েকটি পর্যন্ত হতে পারে।

২) অ্যাক্সন (Axon) : কোষদেহ থেকে উৎপন্ন বেশ লম্বা শাখাহীন তন্তুটির নাম অ্যাক্সন। এর চারদিকে পাতলা আবরণটিকে নিউরিলেমা বলে। নিউরিলেমা পরিবেষ্টিত অ্যাক্সনকে স্নায়ুতন্তু বলে। বহু সংখ্যক অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট মিলিত হয়ে স্নায়ু গঠন করে। নিউরিলেমা ও অ্যাক্সনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্নেহ পদার্থের একটি স্তর থাকে। একে মায়োলিন বলে।

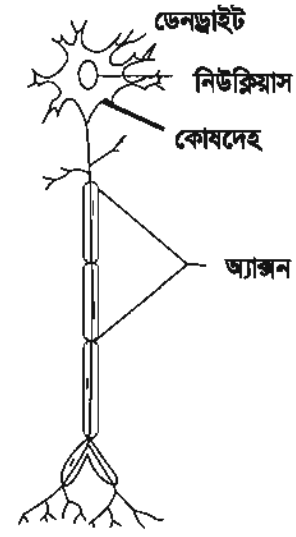

চিত্র ১০.৪ : একটি নিউরন

এ আবরণীটি অবিচ্ছিন্ন নয়। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর এটি সাধারণত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। এই বিচ্ছিন্ন অংশে নিউরিলেমার সাথে অ্যাক্সনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ঘটে। এই আবরণীবিহীন অংশটি র‍্যানভিয়ার এর পর্ব (Node of Ranvier) নামে পরিচিত। অ্যাক্সনের মূল অক্ষের আবরণীকে অ্যাক্সলেমা (Axolema) বলে।

একটি নিউরনের অ্যাক্সনের সাথে দ্বিতীয় একটি নিউরনের ডেনড্রাইট যুক্ত থাকে। এই সংযোগস্থলকে সিন্যাপস (Synapse) বলে। প্রকৃতপক্ষে পর পর অবস্থিত দুটি নিউরনের সন্ধিস্থল হলো সিন্যাপস। সিন্যাপসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ রাসায়নিক (Electro chemical) পদ্ধতিতে স্নায়ু তাড়না প্রবাহিত হয়। সিন্যাপসে নিউরোহিউমার নামক তরল পদার্থ থাকে। কোনো একটি নিউরনের মধ্য দিয়ে স্নায়ু তাড়না প্রবাহিত হয়ে পরবর্তী নিউরনের ডেনড্রাইটে যায়। এর ভিতর দিয়ে স্নায়ু উদ্দীপনা বা স্নায়ু তাড়না একদিকে পরিবাহিত হয়। নিউরনের প্রধান কাজ উদ্দীপনা বহন করা। অনুভূতিবাহী নিউরন গ্রাহক অঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং মোটর বা আজ্ঞাবাহী নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কার্যকরী অঙ্গে উদ্দীপনা প্রেরণ করে।

কাজ : একটি নিউরনের চিত্র এঁকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

একটি টর্চ লাইট দিয়ে তোমার বন্ধুর চোখে আলো ফেল। লক্ষ করে দেখ, আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চোখের তারা ছোট হয়ে গেল। কেন এমন হলো? আলোর উদ্দীপনাজনিত তাড়না রেটিনা থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছালে এর নির্দেশে আইরিশের বৃত্তাকার বা গোলাকার পেশি সংকোচিত হয়। ফলে চোখের তারা ছোট হয়ে যায়। উদ্দীপনার আকস্মিকতায় স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex action)

প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলতে উদ্দীপনার আকস্মিকতা ও স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়াকে বুঝায়। হঠাৎ করে আঙ্গুলে সুঁচ ফুটলে অথবা হাতে গরম কিছু পড়লে আমরা অতিদ্রুত হাতটি উদ্দীপনার স্থান থেকে সরিয়ে নেই। এটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফল। আমরা ইচ্ছা করলে প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। প্রতিবর্তী ক্রিয়া মূলত সুষুম্না কাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, মস্তিষ্ক দ্বারা নয়। অর্থাৎ যেসব উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সুষুম্না কাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

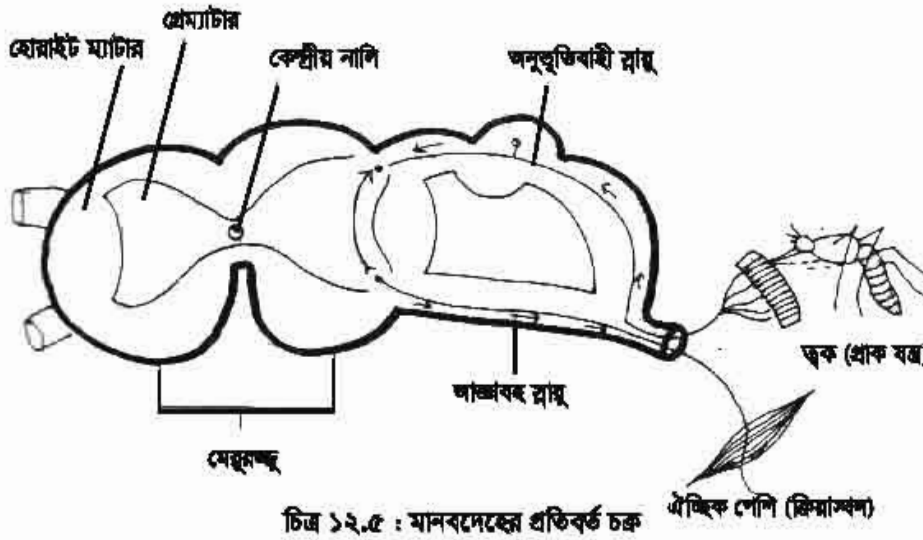

চিত্র ১২.৫ : মানবদেহের প্রতিবর্ত চক্র

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অসতর্কভাবে সেলাই করার সময় আঙ্গুলে সুঁচ ফুটলে তাৎক্ষণিক ভাবে হাত অন্যত্র সরে যায়। এটি একটি প্রতিবর্তী ক্রিয়া। এ ক্রিয়াটি যেভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা হলো আঙ্গুলে সুঁচ ফুটার সময় আঙ্গুলের ত্বকে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের ডেনড্রাইটসমূহ ব্যথার উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এখানে ত্বক গ্রাহক অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

আঙ্গুলের ত্বক থেকে এ উদ্দীপনা সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সনের মাধ্যমে স্নায়ুকাণ্ডের ধূসর অংশে পৌঁছায়। স্নায়ুকাণ্ডের ধূসর অংশে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সন থেকে তড়িৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে উদ্দীপনা মোটর বা আজ্ঞাবাহী স্নায়ুর ডেনড্রাইটে প্রবেশ করে। সংবেদী স্নায়ুর অ্যাক্সন ও আজ্ঞাবাহী স্নায়ুর ডেনড্রাইটের মধ্যবর্তী সিন্যাপসের মধ্য দিয়ে এ উদ্দীপনা পেশিতে প্রবেশ করে। মোটর বা আজ্ঞাবাহী স্নায়ুর নিউরনের ডেনড্রাইট থেকে উদ্দীপনা পেশিতে পৌঁছালে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নির্দেশে পেশির সংকোচন ঘটে। ফলে উদ্দীপনাস্থল থেকে হাত দ্রুত আপনা আপনি সরে যায়।

২. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system)

মস্তিষ্ক থেকে ১২ জোড়া ও মেরুমজ্জা বা সুষুম্না কাণ্ড থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ু নির্গত হয় এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর শাখায় বিভক্ত হয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোকে একত্রে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে। মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন করোটিক স্নায়ু চোখ, নাক, কান, জিহ্বা, দাঁত, মুখমণ্ডল, হৃদপিণ্ড, পাকস্থলি প্রভৃতি অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মেরুরজ্জু থেকে উদ্ভূত স্নায়ুগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করে।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous system) যেসব অঙ্গের উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সেগুলো স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের ভিতরের অঙ্গসমূহ, যেমন– হৃদপিণ্ড, অন্ত্র, পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদির কাজ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। এ তন্ত্রের কার্যকারিতার উপর মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুর কোনো প্রভাব না থাকায় এরা স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে আপন কর্তব্য সম্পাদন করে।

আবেগ সঞ্চালন (Impulse transmission)

পরস্পর সংযুক্ত অসংখ্য নিউরন তন্তুর ভিতর দিয়ে উদ্দীপনা বা তাড়না শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে পৌঁছায়। প্রতি সেকেন্ডে এর বেগ প্রায় ১০০ মিটার। পরিবেশ থেকে যে সংবাদ স্নায়ুর ভিতর দিয়ে তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে তাকে স্নায়ু তাড়না বা উদ্দীপনা বলে। নিউরনের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত নিসল দানা স্নায়ুর মধ্য দিয়ে স্নায়ুর উদ্দীপনা পরিবহনের সাথে সম্পৃক্ত। নিউরনের কার্যকারিতার ফলে উদ্দীপনা গ্রাহক কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলোতে সঞ্চালিত

হয়। এটি মাংসপেশিতে সঞ্চালিত হলে বেশি সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়। ফলে প্রয়োজন মতো দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালিত হয়। এই তাড়না গ্রন্থিতে পৌঁছালে সেখানে রস ক্ষরিত হয়। অনুভূতিবাহী স্নায়ু উত্তেজিত হলে সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হয়ে যন্ত্রণাবোধ, স্পর্শজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি অনুভূতি উপলব্ধি করায়।

চিত্র ১০.৬ : আবেগ সঞ্চালন প্রক্রিয়া

স্নায়ু তাড়না কীভাবে কাজ করে তা নিম্নের উদাহরণ থেকে বুঝা যায়। মনে কর, শিক্ষক শ্রুতলিপি দিচ্ছেন এবং তুমি লিখছ। এ ক্ষেত্রে পুস্তক থেকে প্রতিফলিত আলো শিক্ষকের চোখের রেটিনায় উদ্দীপনা জাগালে স্নায়ু তাড়নার সৃষ্টি হয়। এটা চোখের স্নায়ু দিয়ে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌঁছে। সেখান থেকে এ তাড়না পর পর চিন্তাকেন্দ্র, স্মৃতিকেন্দ্র প্রভৃতি হয়ে মুখমন্ডলের ঐচ্ছিক পেশিকে নির্দেশ দেয়। পেশি সংকুচিত হয়ে সাড়া গ্রহণ করে। এখানে শিক্ষকের কথা বলার পেশিগুলো হলো প্রধান সাড়া অঙ্গ।

শিক্ষকের কথা বাতাসে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই শব্দ তরঙ্গ ছাত্রের কানের পর্দায় উদ্দীপনা জাগায়, যা শ্রবণস্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে পৌঁছে। সেখান থেকে তাড়না ছাত্রের স্মৃতিকেন্দ্র, চিন্তাকেন্দ্র প্রভৃতি হয়ে মোটরস্নায়ুযোগে ছাত্রের ঐচ্ছিক পেশিতে পৌঁছে। পেশির নির্দেশে সাড়া দিয়ে সে হাত দিয়ে লিখতে থাকে। এখানে ছাত্রের পেশি হলো প্রধান সাড়া অঙ্গ।

হরমোন কী?

মানবদেহে ও বিভিন্ন প্রাণীর দেহে একধরনের বিশেষ নালিবিহীন গ্রন্থি থাকে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নালিবিহীন গ্রন্থি নিঃসৃত এ ধরনের রসকে হরমোন বলে। হরমোন পরিবহনের জন্য পৃথক কোনো নালি নেই। হরমোন রক্তস্রোতের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকোষে পৌঁছে কোষের প্রাণরাসায়নিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে, জৈবিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে। সুস্থ দেহের চাহিদা অনুসারে গ্রন্থি থেকে অবিরত ধারায় হরমোন নিঃসৃত হয়। তবে প্রয়োজন অপেক্ষা কম অথবা বেশি পরিমাণ হরমোন নিঃসৃত হলে দেহে নানারকম অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

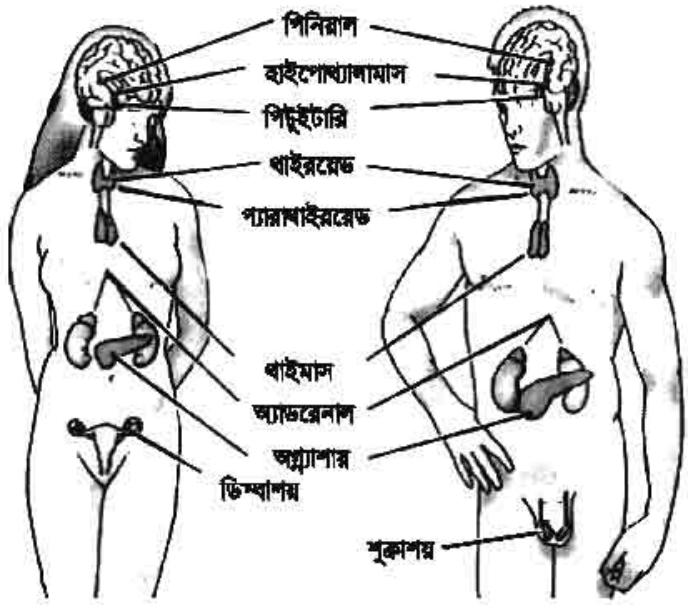

চিত্র ১০.৭ : মানবদেহের মুখ্য নালিবিহীন গ্রন্থি সমূহ

মানবদেহের কয়েকটি মুখ্য নালিবিহীন গ্রন্থির পরিচিতি, কাজ ও নিঃসৃত হরমোন

পিটুইটারি গ্রন্থি : পিটুইটারি গ্রন্থি বা হাইপোফাইসিস মস্তিষ্কের নিচের অংশে অবস্থিত। পিটুইটারি গ্রন্থি মানবদেহের হরমোন উৎপাদনকারী প্রধান গ্রন্থি। কারণ একদিকে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন সংখ্যায় যেমন বেশি, অপরদিকে অন্যান্য গ্রন্থির উপর এসব হরমোনের প্রভাবও বেশি। দেহের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নালিবিহীন গ্রন্থি হলেও এটি আকারে সবচেয়ে ক্ষুদ্র। এই গ্রন্থি থেকে গোনাডোট্রপিন, এডরেনোকর্টিকোট্রপিন, থাইরোট্রপিন, প্রোল্যাকটিন ইত্যাদি হরমোন নিঃসৃত হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থি : থাইরয়েড গ্রন্থি গলায় ট্রাকিয়ার উপরের অংশে অবস্থিত। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন সাধারণত বিপাকের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। চোখ বের হয়ে আসার রোগটি থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যার কারণে হয়ে থাকে। আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায় ও গলগণ্ড গঠন করে। আয়োডিনযুক্ত লবণ খেলে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থি থেকে প্রধানত থাইরক্সিন হরমোন নিঃসরন হয়।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি: প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাইরয়েড গ্রন্থির পিছনে অবস্থিত। হরমোন মূলত শরীরের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থি থেকে প্রধানত প্যারাথাইরক্সিন হরমোন নিঃসৃত হয়।

থাইমাস গ্রন্থি : থাইমাস গ্রন্থি গ্রীবা অঞ্চলে অবস্থিত। থাইমাস গ্রন্থি দেহের জনন অঙ্গের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শিশুকালে এই গ্রন্থি বিকশিত থাকে পরে বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ছোট হয়ে যায়। এই গ্রন্থি হতে থাইমক্সিন হরমোন নিঃসরন হয়।

এডরেনাল গ্রন্থি : এডরেনাল গ্রন্থি কিডনির উপরে অবস্থিত। এডরেনাল গ্রন্থি দেহের অত্যাবশ্যকীয় বিপাকীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থি মূলত কঠিন মানসিক চাপ থেকে পরিত্রাণে সাহায্য করে। এই গ্রন্থি এ্যাডরেনালিন হরমোন নিঃসৃত করে।

আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস : আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস অগ্ন্যাশয়ের মাঝে অবস্থিত। আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস কোষগুচ্ছ শরীরের শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। এর নালিহীন কোষগুলি ইনসুলিন ও গ্লুকাগণ নিঃসরণ করে যা রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এই কোষগুচ্ছ ইনসুলিন হরমোন নিঃসৃত করে।

গোনাড বা জনন অঙ্গ গ্রন্থি : এটি মেয়েদের ডিম্বাশয় ও ছেলেদের শুক্রাশয়ে অবস্থিত। জনন অঙ্গ থেকে নিঃসৃত হরমোন দেহের পরিণত বয়সের লক্ষণসমূহ বিকশিত করতে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও প্রাণীর জনন অঙ্গের বৃদ্ধি, জননচক্র ও যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জনন অঙ্গ থেকে পরিণত বয়সের পুরুষে টেস্টোস্টেরন ও স্ত্রী দেহে ইস্ট্রোজেন হরমোন উৎপন্ন হয়।

প্রাণরস বা হরমোনজনিত অস্বভাবিকতা

থাইরয়েড সমস্যা : সমুদ্রের পানিতে আয়োডিন থাকায় সামুদ্রিক মাছ মানুষের খাদ্যে আয়োডিনের অন্যতম মূল উৎস। আয়োডিনযুক্ত খাবার খেলে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয়। দেখা গেছে সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত এলাকা যেমন হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল কিংবা বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে, মানুষের গলা ফোলা রোগ গলগণ্ড বা গয়টার রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হলে শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধা পায়। ফলে যেমন গায়ের চামড়া খস্‌খসে হয় ও চেহারা গোলাকার গোবেচারা আকারের মুখমন্ডল তৈরি হয়। আয়োডিনের অভাবে হরমোন এর উৎপাদন

ব্যাহত হলে শিশুদের বুদ্ধি বিকাশ কমে যায়। এই জন্য খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া কলা, ফলমূল, কচু, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি খেলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস : অগ্ন্যাশয়ের ভিতর আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস নামক এক প্রকার গ্রন্থি আছে, এই গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত হয়। ইনসুলিন হলো এক প্রকার হরমোন যা দেহের শর্করা পরিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। অগ্ন্যাশয়ে যদি প্রয়োজনমতো ইনসুলিন তৈরি না হয় তবে রক্তে শর্করার পরিমাণ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায়, প্রস্রাবের সাথে গ্লুকোজ নির্গত হয়। এ অবস্থাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে। ডায়াবেটিস দুই ধরনের হয়, যথা– টাইপ–১ ও টাইপ–২। টাইপ–১ এ আক্রান্ত রোগীর দেহে একেবারে ইনসুলিন তৈরি হয় না। তাই ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিতে হয়। অন্যদিকে টাইপ–২ রোগীর দেহে আংশিকভাবে ইনসুলিন তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ঔষধ খেয়ে অগ্ন্যাশয় কোষকে শরীরের জন্য পরিমিত ইনসুলিন তৈরিতে সাহায্য করে। এ রোগটি সাধারণত বংশগত ও পরিবেশের প্রভাবে হয়ে থাকে। এটি সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ নয়। রক্তে ও প্রস্রাবে গ্লুকোজের মাত্রা পরিমাণের চেয়ে বেড়ে গেলে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। লক্ষণগুলো হলো ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, অধিক পিপাসা লাগা, ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া, পর্যাপ্ত খাবার খাওয়া সত্ত্বেও দেহের ওজন কমতে থাকে, দুর্বলতা বোধ করা, চোখে কম দেখা, চামড়া খসখসে ও রূক্ষ হয়ে যাওয়া, ক্ষতস্থান সহজে না শুকানো ইত্যাদি।

আগে ধারণা করা হতো কেবলমাত্রা বয়স্কদের এ রোগটি হয়। এ ধারণাটি সঠিক নয়। ছোট বড় সব বয়সীদের এ রোগ হতে পারে। তবে যারা কায়িক পরিশ্রম করেননা, দিনের বেশির ভাগ সময় বসে কাজ করেন অথবা অলস জীবন যাপন করেন তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাছাড়া স্থূলকায় ব্যক্তিদের এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ রোগ বংশগত। কোনো ব্যক্তির বাবা, মা, দাদা, দাদির এ রোগ থাকলে তার এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। বংশগতভাবে অনেক শিশুর দেহে ইনসুলিন উৎপাদন কম হয়, ফলে শিশুটির ইনসুলিন ঘাটতিজনিত অসুস্থতায় ভুগতে থাকে।

ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা : রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা দ্বারা গ্লুকোজের মাত্রা নির্নয়ের মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসা দ্বারা ডায়াবেটিস রোগ একেবারে নিরাময় করা যায় না, কিন্তু এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ডাক্তারদের মতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি 'D' মেনে চলা অত্যাবশ্যক। এগুলো হলো–Discipline, Diet ও Dose।

ক. শৃঙ্খলা (Discipline) : একজন ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তার সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থা মহৌষধস্বরূপ। এছাড়া (১) নিয়মিত ও ডাক্তারের পরামর্শমতো পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করা, (২) নিয়মিত ব্যায়াম করা, (৩) রোগীর দেহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বিশেষভাবে পায়ের যত্ন নেওয়া, (৪) নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা করা, (৫) দৈহিক কোনো জটিলতা দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।

খ. খাদ্য নিয়ন্ত্রণ (Diet) : ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হলো খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা। মিষ্টিজাতীয় খাবার পরিহার করা ও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ও সময়মতো খাদ্য গ্রহণ করা। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাবারের মেনু অনুসরণ করলে সুফল পাওয়া যায়।

গ. ঔষধ সেবন (Dose) : ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ঔষধ সেবন করা উচিত নয়। ডাক্তার রোগীর শারীরিক অবস্থা বুঝে ঔষধ খাওয়া বা ইনসুলিন নেওয়ার পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে হবে। ঠিকমতো চিকিৎসা না করা হলে রোগীর শ্বসন হার কমে যায়, পানি স্বল্পতার কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে রোগী বেহুশ হয়ে পড়ে। অনেক সময় রোগীর হৃদয়ন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

স্ট্রোক (Stroke) : মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ চলতি কথায় স্ট্রোক বলা হয়। এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি। সাধারণত ধমনিগাত্র শক্ত হয়ে যাওয়া ও উচ্চ রক্ত চাপজনিত কারণে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে পারে। অনেক সময় অত্যধিক স্নায়ুবিক চাপ যেমন–উত্তেজনা বা অধিক পরিশ্রমের কারণে এরূপ রক্তক্ষরণ হয়। মস্তিষ্কের যে কোনো ধমনিতে রক্তক্ষরণ সম্ভব। নির্গত রক্ত মস্তিষ্কে জমাট বেঁধে মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন করে। রক্ত মস্তিষ্কের গহ্বরে ও মাথার খুলিতে ঢুকে গেলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

রোগের লক্ষণ : এই রোগের লক্ষণ হঠাৎ করেই প্রকাশ পায়। লক্ষণগুলো হলো– বমি, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, কয়েক মিনিটের মধ্যে রোগী সংজ্ঞা হারায়, ঘাড় শক্ত হয়ে যেতে পারে, মাংসপেশি শিথিল হয়ে যায়, শ্বসন ও নাড়ির স্পন্দন কমে যায়, মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ধারণ করে।

এই অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। উপযুক্ত চিকিৎসা করা হলে রোগী অনেক সময় বেঁচে যায়। রোগী যদি বেঁচে যায়, কয়েকদিন পর সে তার সংজ্ঞা ফিরে পায় । তবে রোগী কিছুটা ছটফট করে এবং আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যাওয়া অঙ্গো দৃঢ়তা ফিরে আসে। জ্ঞান ফিরে এলে বাক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে রোগীর কথা জড়িয়ে যায়। পক্ষাঘাত বা অবশ হয়ে যাওয়া অঙ্গা (যেমন– হাত) সংলগ্ন পেশি নড়াচড়ায় শক্তি ক্রমশ ফিরে আসে কিন্তু হাত দিয়ে সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা আর কোনোদিন ফিরে পায় না। চিকিৎসার প্রাথমিক পর্যায়ে আরোগ্য লাভ দ্রুত হতে থাকে কিন্তু দুমাস পরে উন্নতি ক্রমশ কমে আসে। বিজ্ঞানীদের মতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে শক্ত আঘাত বা রক্তপাতের ফলে এ রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হঠাৎ আক্রমণে যে স্নায়ু সাময়িকভাবে কার্যক্ষমতা হারায়, সেগুলো দ্রুত আরোগ্য লাভ করে এবং কার্যক্ষমতা ফিরে পায়। আর যেসব স্নায়ু সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেগুলোর কর্মক্ষমতা চিরতরে বিনিষ্ট হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা : মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা রক্ত জমাট বেঁধেছে কিনা তা নির্ণয় করে এই রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই রোগটির সঠিক কারণ অনেক সময় নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। মস্তিষ্কের রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। রোগীর উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা, জ্ঞান ফিরে পাবার পর রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী সম্ভব হলে অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে। রোগীকে উপযুক্ত শুশ্রুষা, মলমূত্র ত্যাগের সুব্যবস্থা করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, পথ্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। প্রয়োজনবোধে রোগীকে নলের সাহায্যে খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গা নড়াচড়া করানো দরকার, এতে ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের অস্থিসন্ধি শক্ত হয়ে যাওয়া রোধ করা সম্ভব হয়। রোগীর জ্ঞান ফিরে এলে নিজ প্রচেষ্টায় নড়াচড়া করতে উৎসাহিত করা উচিত। স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধের উপায় : ধূমপান পরিহার করা, যারা উচ্চরক্ত চাপে ভুগছেন তাদের উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের নিয়মিত ঔষধ সেবন করা, দুশ্চিন্তামুক্ত, সুন্দর ও সাধারণ জীবন যাপন করা।

স্নায়ুবিক বৈকল্যজনিত শারীরিক সমস্যা

প্যারালাইসিস : শরীরের কোনো অংশের মাংসপেশীর কার্যাবলী নষ্ট হওয়াকে প্যারালাইসিস বলে। সাধারণত মস্তিষ্কের কোনো অংশের ক্ষতির কারণে ঐ অংশের সংবেদন গ্রহণকারী পেশিগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। একজনের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ প্যারালাইসিস হতে পারে, যাতে শরীরের একপাশের কোনো অঙ্গা অথবা উভয়পাশের অঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট হয়, যেমন, দুই হাত ও পায়ের প্যারালাইসিস।

কারণ : প্যারালাইসিস সাধারণত মস্তিষ্কের স্ট্রোকের কারণে হয়। এছাড়া মেরুদন্ডের বা ঘাড়ের সুষুম্নাদন্ডে আঘাত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্যারালাইসিস হতে পারে। স্নায়ু রোগ, সুষুম্নাদন্ডের ক্ষয় ও রোগ প্যারালাইসিস এর কারণ হতে পারে।

এপিলেপসি

এপিলেপসি মস্তিষ্কের একটি রোগ যাতে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর খিঁচুনী বা কাঁপুনি দিতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এই রোগকে মৃগী রোগও বলা হয়। অনেকক্ষেত্রে এই রোগের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি হঠাৎ করেই সাময়িকভাবে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ও শরীর কাঁপুনি দিতে দিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কোনো কারণে রোগী পানিতে পড়লে নিজ শক্তিতে উঠতে পারে না, ফলে ডুবে মারা যায়।

এপিলেপসির মূল কারণ এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি। তবে মস্তিষ্কের অবস্থাগত কারণে এপিলেপসি হয়ে থাকে। ইসমিক স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের মৃগী রোগ দেখা দেয়। মাথায় আঘাতজনিত কারণে ম্যানিনজাইটিস, এনসেফ লাইটিস, এইডস্, জন্মগত মস্তিষ্কের বিকৃতি, টিউমার ইত্যাদি কারণেও এপিলেপসির উপসর্গ দেখা দেয়। এপিলেপসি যে কোনো বয়সে হতে পারে, তবে ৫ থেকে ২০ বছর বয়সে মৃগী রোগের ব্যাপকতা বেশি দেখা যায়।

পারকিনসন রোগ

পারকিনসন রোগ মস্তিষ্কের এমন এক অবস্থা যাতে হাতে ও পায়ের কাঁপুনী হয় এবং আক্রান্ত রোগী নড়াচড়া, হাঁটাহাটি করতে অপারগ হয়। এ রোগ সাধারণত ৫০ বছরের বয়সের পরে হয়। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে যুবক যুবতীদের হতে পারে। এই ক্ষেত্রে রোগটি তার বংশে রয়েছে বলে ধরা হয়।

স্নায়ু কোষ এক ধরনের নির্যাস তৈরি করে যাকে ডোপামিন বলে। ডোপামিন শরীরের পেশির নড়াচড়ায় সাহায্য করে। পারকিনসন রোগাক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্কে ডোপামিন তৈরির কোষগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। ডোপামিন ছাড়া ঐ স্নায়ু কোষগুলি পেশি কোষগুলিকে সংবেদন পাঠাতে পারে না। ফলে মাংসপেশি তার কার্যকারিতা হারায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পারকিনসনের কারণে রোগীর মাংসপেশি আরও অকার্যকর হয়ে উঠে, ফলে রোগীর চলাফেরা, লেখালেখি ইত্যাদি কাজ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

পারকিনসন রোগ সাধারণত ধীরে ধীরে প্রকট রূপে দেখা দেয়। রোগী প্রাথমিক অবস্থায় হালকা হাত বা পা কাঁপা অবস্থায় থাকে। অনেকের একটি পা বা পায়ের পাতা নড়াচড়াতে কষ্ট হয়। এছাড়াও চোখের পাতার কাঁপুনি, কোষ্ঠকাঠিন্য, খাবার গিলতে কষ্ট হওয়া, সোজাসুজি হাঁটার সমস্যা, কথা বলার সময় মুখের বাচনভঙ্গি না আসা অর্থাৎ মুখ অনড় থাকা, মাংসপেশিতে টান পড়া বা ব্যথা হওয়া, নড়াচড়ায় কষ্ট হওয়া যেমন চেয়ার থেকে উঠা কিংবা হাঁটতে শুরু করার সময় অসুবিধে দেখা দেয়।

কাজ : হরমোনজনিত শারীরিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ অণুসন্ধান কর এবং একটি অনুসন্ধান মুলক প্রতিবেদন তৈরি কর।

ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত ফিজিওথেরাপি গ্রহণ, পরিমিত খাদ্য গ্রহণ ও সুস্থ জীবন যাপন করার মাধ্যমে রোগী অনেকটা সুস্থ থাকে।

সমন্বয় কার্যক্রমে তামাক ও মাদক দ্রব্যের প্রভাব

আমাদের দেশে সাধারণত তামাক, গাজা, ভাং, চরস, আফিম, মরফিন, কোকেন, মদ ইত্যাদি মাদক দ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এছাড়া বিশ্বের কোকেন ও আফিম থেকে কৃত্রিম উপায়ে ওষুধ তৈরী করা হচ্ছে। এগুলোও নেশার উদ্রেক করে। যেমন – ঘুমের ঔষধ।

মানুষ কেন মাদকাসক্ত হয় তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। যেমন– মাদক দ্রব্যের প্রতি কৌতূহল, বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীদের প্রভাব, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন, সহজ আনন্দ লাভ, পরিবারে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার, মাদক দ্রব্যের সহজলভ্যতা, পারিবারিক কলহ ও অশান্তি, বেকারত্ব, হতাশা, অভাব অনটন, মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য।

তামাক ব্যবহারে, জর্দা চিবিয়ে নিলে কিংবা ধূমপান করলে রক্তে নিকোটিনের মাত্রা বেড়ে যায়। নিকোটিন প্রাথমিক ভাবে স্নায়ু কোষগুলোকে উদ্দীপিত করে, পরবর্তীতে দেহে নিকোটিনের চাহিদা আরও বেড়ে যায়। নিকোটিনের এই চাহিদা মেটাতে জর্দ্দা ব্যবহার বা ধূমপানের নেশায় মানুষ আসক্ত হয়।

নিকোটিন গ্রহণে স্নায়ুকোষের কার্যকরিতা নষ্ট হয়। হাত, পা কিংবা মাথা অনৈচ্ছিক ভাবে (Voluntary) কাঁপতে থাকে। ফলে কোনো সূক্ষ্ম কাজ যেমন সুইয়ের ছিদ্রে সুতা ঢোকানো, সোজা দাগ টানা, লেখালেখিতে ব্যর্থতাজনিত সমস্যা হওয়া, ইত্যাদি দেখা দেয়। মাদক দ্রব্য ব্যবহারে স্নায়ুতন্ত্রের উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। মাদকাশক্তির কারণে ব্যক্তি তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তির ফাদে হার মেনে নেশা দ্রব্য গ্রহণে বাধ্য হয়। নেশা বস্তুর কারণে তার চিন্তাশক্তি ক্রমে লোপ পায়। তামাক ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী কাজে মনোযোগ হারায়, সাধারণ জীবনযাপনে ব্যর্থ হয়। অতিরিক্ত নেশায় অচৈতন্য অবস্থায় কোনো স্থানে পড়েও থাকতে পারে। মাদকাশক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সাহায্যে নেশা থেকে এখন বের হয়ে আসা সম্ভব। এ কাজে পরিবারের সবার সহানুভূতি ও সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি।

মাদকাসক্তির কুফল : মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় :

- নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রসার করা
- বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা রোধ।
- অসৎ বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে থাকা ও এর কুফল সম্পর্কে অবহিত করা
- এ ব্যাপারে জনসচেতনতা গড়ে তোলা ও আইনের সঠিক প্রয়োগ করা।

মাদকাসক্তদের ঘৃনা বা অবহেলার চোখে না দেখে তাদেরকে সহানুভূতির সাথে ধৈর্য সহকারে সমাজে পুণর্বাসন বা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সহায়তা গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। দিন দিন এ অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের কার্যক্রমের মধ্যে মাদকদ্রব্য আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ, নিরোধ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন উল্লেখযোগ্য।

কাজ : তামাক ও মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পোস্টার/লিফলেট অঙ্কন কর এবং একটি শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফাইটোহরমোন কী?

২. অভিকর্ষ উপলব্ধি কী?

৩. স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে?

৪. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র কী নিয়ে গঠিত?

৫. প্যারালাইসিস কেন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে হরমোনের ভূমিকা আলোচনা কর।

২. থাইরয়েড সমস্যার লক্ষণগুলো লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. থাইমাস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন কোনটি?

ক. থাইরক্সিন খ. প্যারাথাইরক্সিন

গ. থাইমক্সিন ঘ. থাইরোট্রপিন

২. আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস–

i. শরীরের শর্করা বিপাকে সহায়তা করে

ii. ইনসুলিন হরমোন নিঃসরণ করে

iii. দেহের বিপাকীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

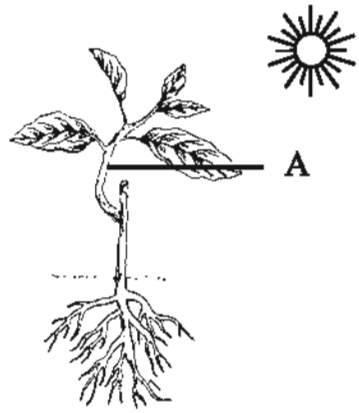

৩. 'A' এর ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য।

ক. আলোক দিকমুখীতা
খ. ভূ–দিকমুখীতা
গ. পানি দিকমুখীতা
ঘ. রাসায়নিক দিকমুখীতা

৪. শীর্ষমুকুল কাটার ফলে পার্শ্বমুকুল সৃষ্টিতে কোনটি কাজ করে?

ক. অক্সিন
খ. জিবারেলিন
গ. সাইটোকাইনিন
ঘ. অ্যাবসিসিক এসিড

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. অহনা বাবার সাথে কৃষি খামারে ঘুরতে যেয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছ পর্যবেক্ষণ করে। সে দেখল, একটি করে আলো জ্বালিয়ে ছোট ছোট চারা গাছ রাখা আছে এবং ঘরটি বেশ ঠান্ডা। সে আরও দেখল, কিছু ফলজ গাছের ফুল ফুটছে না, ছোট অবস্থায় ফলগুলো ঝরে পড়ছে।

ক. বায়োলজিক্যাল ক্লক কী?

খ. ভার্নালাইজেশন বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকে ফলজ গাছগুলোতে এরূপ সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অহনার দেখা গাছগুলো উক্ত পরিবেশে রাখার কারণ–বিশ্লেষণ কর।

২.

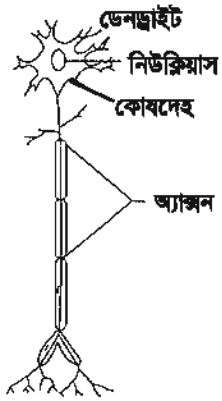

ক. প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী?

খ. প্রাণরস কাকে বলে বুঝিয়ে লেখ।

গ. মানবদেহে উদ্দীপনা তৈরিতে 'A' চিহ্নিত অংশটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত কোষটির গঠন প্রকৃতি একটি সাধারণ কোষ অপেক্ষা ভিন্নতর যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায়

জীবের প্রজনন

প্রজনন (Reproduction) জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীব তার জীবদ্দশায় নিজের প্রতিরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে তার প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখে। জীবভেদে প্রজননের সার্বিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এ অধ্যায়ে মানব প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- জীবে প্রজননের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রজনন অঙ্গ হিসেবে ফুলের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবন চক্রের সাহায্যে উদ্ভিদের যৌন প্রজনন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণীর অযৌন ও যৌন প্রজনন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রজননের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বহিঃ ও অন্তঃনিষেকের পার্থক্য করতে পারব।
- ব্লক চিত্রের সাহায্যে মানুষের প্রজননের ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- প্রজনন কার্যক্রমে হরমোনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানব ভ্রূণের বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানবদেহে এইডস এর সংক্রমণের কারণ, প্রতিরোধও প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর এইডস এর ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এইডস প্রতিরোধে পোস্টার/ লিফলেট অঙ্কন করে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- এইডস রোগীদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন করব।

জীবে প্রজননের ধারণা ও গুরুত্ব

জীবের জন্ম হলে মৃত্যু অবধারিত। শুধুমাত্র জীবের মৃত্যু হলে পৃথিবী থেকে একসময় জীবের অস্তিত্ব বিলিন হয়ে যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি, কারন একদিকে পৃথিবীতে যেমন জীবরে মৃত্যু ঘটছে অন্যদিক তেমনি প্রজননের মাধ্যমে জীবের জন্ম হচ্ছে। প্রজনন হচ্ছে এমন একটি শারীরতত্ত্বীয় কার্যক্রম যার মাধ্যমে জীব তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ বংশধর রেখে যায়। যে প্রক্রিয়ায় কোনো জীব তার বংশধর সৃষ্টি করে তাকেই প্রজনন বলে।

প্রজনন প্রধানত দুই প্রকার, যথা– অযৌন ও যৌন। সাধারণত নিম্নশ্রেণির জীবে যৌন প্রজনন হয় না, তবে কোনো কোনো নিম্নশ্রেণির জীব যৌন উপায়েও প্রজনন ঘটায়। উচ্চ শ্রেণির অধিকাংশ উদ্ভিদ ও উচ্চ শ্রেণির সকল প্রাণী যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশধর সৃষ্টি করে। যৌন জননে দুটি বিপরীতধর্মী জননকোষ পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। এ ক্ষেত্রে একটিকে পুং জননকোষ ও অন্যটিকে স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্বাণু (Egg) বলা হয়। এ দুধরনের জননকোষ একই ফুলে বা একই দেহে সৃষ্টি হতে পারে। উন্নত উদ্ভিদে এ দুধরনের জননকোষ একই দেহে সৃষ্টি হয়।এরা সহবাসী উদ্ভিদ। যখন দুধরনের জননকোষ আলাদা দেহে সৃষ্টি হয় তখন সেই উদ্ভিদকে ভিন্নবাসী উদ্ভিদ বলে।

জননকোষ সৃষ্টির পূর্ব শর্ত এই যে, জনন মাতৃকোষকে অবশ্যই মিয়োসিস (Meiosis) পদ্ধতিতে বিভাজিত হতে হয়। ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা জনন মাতৃকোষের অর্ধেক হয়ে যায়। অবশ্য পুং ও স্ত্রী জননকোষদ্বয় মিলিত হয়ে যে জাইগোট সৃষ্টি করে তাতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা পুনরায় জনন মাতকোষের সমান হয়ে যায়। পরে এই জাইগোটটি মাইটোটিক কোষ বিভাজনের (Mitotic cell division) মাধ্যমে বারবার বিভাজিত হয়ে একটি নতুন জীবদেহ সৃষ্টি করবে। এ ভাবে একটি জীব বহু জীবের জন্ম দিয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় জীব তার ভবিষ্যৎ বংশধর সৃষ্টি করে বংশধারা রক্ষা করে।

প্রজনন না হলে জীবের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যেত। একটি ভাইরাস বা ব্যাকটোরিয়া হতে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকল জীব এভাবে বংশধর সৃষ্টি করে প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তবে কি উপায়ে প্রজনন ঘটবে তা জীবের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এ জন্যই নিম্নশ্রেণির জীব যেখানে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জনন ঘটায় সেখানে উচ্চ পর্যায়ের জীবে জটিল প্রক্রিয়ায় যৌন জনন সংঘঠিত হয়।

উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ–ফুল

প্রজননের জন্য রূপান্তরিত বিশেষ ধরনের বিটপই (Shoot) ফুল। ফুল উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ। আমরা জানি যে একটি আদর্শ ফুলের পাঁচটি অংশের মধ্যে দুটি অংশ (পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক) প্রজননের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। এরা সরাসরি প্রজননে অংশ নেয়। কিন্তু অন্য অংশগুলো সরাসরি অংশ গ্রহণ না করলেও প্রজননে গুরত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে। যে ফুলে পাঁচটি অংশ উপস্থিত থাকে তাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে। এর যেকোনো একটি অংশ না থাকলে সে ফুলকে অসম্পূর্ণ ফুল বলে। বৃন্তযুক্ত ফুলকে সবৃন্তক এবং বৃন্তহীন ফুলকে অবৃন্তক ফুল বলে। যখন কোনো ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক দুটোই উপস্থিত থাকে সেটি উভলিঙ্গ ফুল (Bisexual flower), পুংস্তবক বা স্ত্রীস্তবকের যেকোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে একলিঙ্গ ফুল (Unisexual flower) ও দুটোই অনুপস্থিত থাকলে ক্লীব ফুল (Neuter flower) বলে।

ফুলের বিভিন্ন অংশ

পুষ্পাক্ষ (Thallamus) : সাধারণত এটি গোলাকার এবং ফুলের বৃন্তশীর্ষে অবস্থান করে। পুষ্পাক্ষের উপর বাকি চারটি স্তবক পরপর সাজানো থাকে। পুষ্পাক্ষ ফুলকে আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরে।

বৃতি (Calyx) : ফুলের বাহিরের স্তবককে বৃতি বলে । বৃতি খণ্ডিত না হলে সেটি যুক্তবৃতি, কিন্তু যখন এটি খণ্ডিত হয় তখন তাকে বিযুক্তবৃতি বলে। এর প্রতিটি খণ্ডকে বৃত্যাংশ বলে। সবুজ বৃতি খাদ্য প্রস্তুত কাজে অংশ নেয়। এদের প্রধান কাজ ফুলের ভিতরের অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি ও পোকার আক্রমন থেকে রক্ষা করা। তবে যখন বৃতি রঙ বেরঙের হয় তখন তারা পরাগায়নে সাহায্য করে অর্থাৎ পরাগায়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এমন পোকামাকড়, পশু, পাখি ইত্যাদিকে আকর্ষণ করে।

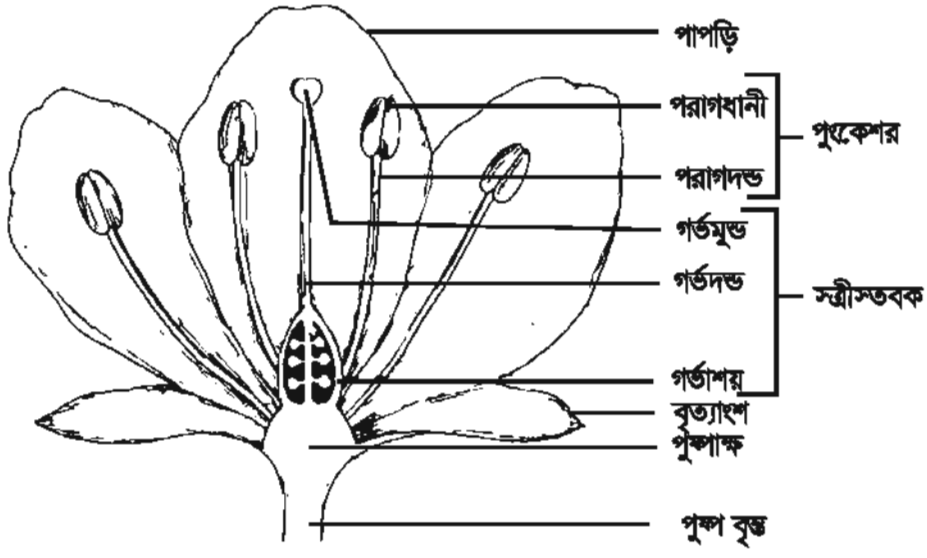

চিত্র–১১.১একটি ফুলের বিভিন্ন অংশ (লম্বচ্ছেদ)।

দলমন্ডল (Corolla) : এটি বাহিরের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তবক। এরা খণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ডকে দলাংশ বা পাপড়ি বলে। পাপড়িগুলি যুক্ত থাকলে যুক্তদল এবং আলাদা থাকলে বিযুক্তদল বলা হয়। এরা সাধারণত রঙিন হয়। এরা ফুলের অত্যাবশ্যকীয় অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। উজ্জল ঝলমলে রঙের দলমন্ডল পোকামাকড় ও পশুপাখি আকর্ষণ করে এবং পরাগায়নে সাহায়তা করে। অনেক সময় কোনো কোনো পোকামাকড় ফুলের পাপড়িতে বসে মধু খেতে সাহায্য করে। এসব কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে পরাগায়নের কাজটি হতে থাকে।

পুংস্তবক (Androecium) : এটি ফুলের তৃতীয় স্তবক এবং একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। এই স্তবকের প্রতিটি অংশকে পুংকেশর বলে। একটি পুংস্তবকে এক বা একাধিক পুংকেশর থাকতে পারে। পুংকেশরের দন্ডের মতো অংশকে পুংদন্ড এবং শীর্ষের থলের মতো অংশকে পরাগধানী বা পরাগরেণু থলি বলে। পরাগধানী ও পুংদন্ড সংযোগকারী অংশকে যোজনী বলে। পরাগধানীর মধ্যে পরাগ উৎপন্ন হয়। এই পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয়ে পোলেন টিউব গঠন করে। এই পোলেন টিউবে পুংজনন কোষ (Malegamet) উৎপন্ন হয়। পুংজননকোষ সরাসরি জনন কাজে অংশ গ্রহণ করে। কখনও পুংস্তবকের পুংদন্ডগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে।আবার পরাগথলিগুলোও কখনও পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। পরাগদন্ড এক গুচ্ছে থাকলে তাকে একগুচ্ছ (Monadelphous), যেমন– জবা; দুইগুচ্ছে থাকলে দ্বিগুচ্ছ (Diadelphous), যেমন– মটর এবং বহুগুচ্ছে থাকলে তাকে বহুগুচ্ছ (Polyadelphous) পুংস্তবক বলা হয়, যেমন– শিমুল । যখন পরাগধানী একগুচ্ছে থাকে তখন তাকে যুক্তধানী বা সিনজেনেসিয়াস (Syngenesious), মুক্ত অবস্থায় এবং পুংকেশর দলমন্ডলের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে দললগ্ন (Epipetalous) পুংস্তবক বলে যেমন– ধুতুরা।

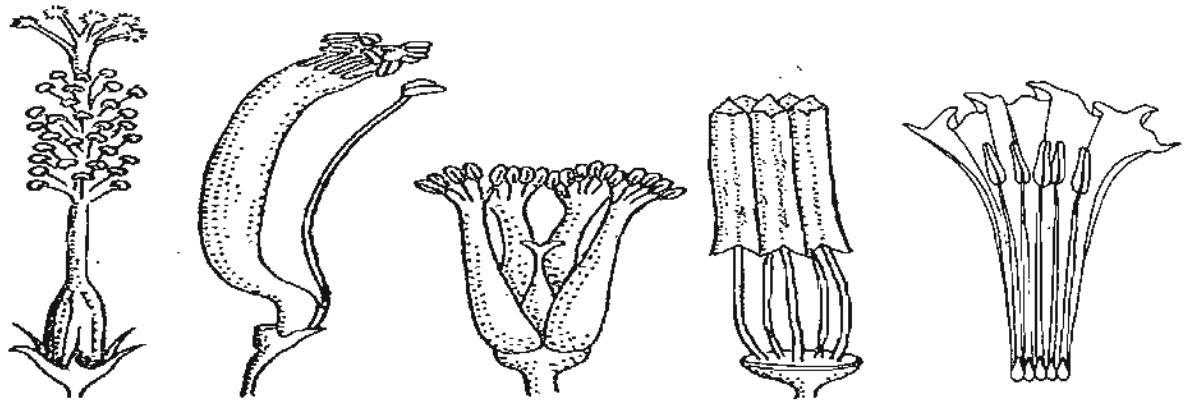

চিত্র–১১.২ : বিভিন্ন ধরনের পুংকেশর ক–একগুচ্ছ, খ–দ্বিগুচ্ছ, গ–বহুগুচ্ছ, ঘ– যুক্তধানী এবং ঙ– দললগ্ন।

স্ত্রীস্তবক (Gynoecium) : স্ত্রীস্তবক বা গর্ভকেশর এর অবস্থান ফুলটির কেন্দ্রে। এটি ফুলের আর একটি অত্যাবশ্যকীয় স্তবক। স্ত্রীস্তবক এক বা একাধিক গর্ভপত্র (Carpel) নিয়ে গঠিত হতে পারে। একটি গর্ভপত্রের তিনটি অংশ, যথা– গর্ভাশয় (Ovary), গর্ভদন্ড (Style) ও গর্ভমুন্ড (Stigma)। যখন কতগুলো গর্ভপত্র নিয়ে একটি স্ত্রীস্তবক গঠিত হয় এবং এরা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে তখন তাকে যুক্তগর্ভপত্রী (Syncarpous), আর আলাদা থাকলে বিযুক্তগর্ভপত্রী (Polycarpous) বলে।

গর্ভাশয়ের ভিতরে এক বা একাধিক ডিম্বক বিশেষ নিয়মে সজ্জিত থাকে। এসব ডিম্বকের মধ্যে স্ত্রী প্রজননকোষ বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। এই ডিম্বাণুই পুংস্তবকের ন্যায় সরাসরি জনন কাজে অংশ গ্রহণ করে।

কাজ–১ : ফুলের বিভিন্ন স্তবক পর্যবেক্ষণ।
উপকরণ : একটি ফুল, ব্লেড, চিমটা, ব্লটিং পেপার।
ফুল সংগ্রহ করে এর যে কোনো একটির বিভিন্ন অংশ আলাদা করে ব্লটিং পেপারে সাজিয়ে রাখ।

কাজ–২ : গর্ভাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ।
উপকরণ : একটি পরিণত ফুল, ব্লেড, সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র।
ফুল থেকে গর্ভাশয় আলাদা করে ব্লেড দিয়ে প্রস্থে এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা কর। যা যা দেখলে খাতায় লেখ।

পুষ্পমঞ্জরি

পুষ্পমঞ্জরি তোমরা সবাই দেখেছ। গাছের ছোট একটি শাখায় ফুলগুলো বিশেষ একটি নিয়মে সাজানো থাকে। ফুলসহ এই শাখাকে পুষ্পমঞ্জরি বলে। যে শাখায় ফুলগুলি সজ্জিত থাকে তকে মঞ্জরিদণ্ড বলে। এ শাখার বৃদ্ধি অসীম হলে অনিয়ত পুষ্পমঞ্জরি ও পুষ্প উৎপাদনের ফলে বৃদ্ধি থেমে গেলে তাকে নিয়ত পুষ্পমঞ্জরি বলে। পরাগায়নের জন্য পুষ্পমঞ্জরির গুরুত্ব খুব বেশি।

চিত্র ১১.৩ : ক অনিয়ত পুষ্পমঞ্জরি, খ নিয়ত পুষ্পমঞ্জরি

প্রজননের প্রধান দুটো ধাপ হচ্ছে যথাক্রমে পরাগায়ন ও নিষেক। নিম্নে এদুটো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

পরাগায়ন

পরাগায়নকে পরাগ সংযোগও বলা হয়। পরাগায়ন ফল ও বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার পূর্বপর্ব। ফুলের পরাগধানী হতে পরাগরেণুর একই ফুলে অথবা একই জাতের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে। পরাগায়ন দুপ্রকার, যথা– ১. স্ব–পরাগায়ন ও ২. পর–পরাগায়ন।

১. স্ব–পরাগায়ন : একই ফুলে বা একই গাছের ভিন্ন দুটি ফুলের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে তখন তাকে স্ব–পরাগায়ন বলে। সরিষা, কুমড়া, ধুতুরা ইত্যাদি উদ্ভিদে স্ব–পরাগায়ন ঘটে।

স্ব–পরাগায়নের ফলে পরাগরেণুর অপচয় কম হয়, পরাগায়নের জন্য বাহকের উপর নির্ভর করতে হয় না এবং পরাগায়ন নিশ্চিত হয়। এর ফলে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় তাতে বৈশিষ্ট্যেরও কোনো পরিবর্তন আসে না বলে প্রজাতির গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে। এভাবেই কোনো একটি প্রজাতির চরিত্রগত বিশুদ্ধতা বজায় থাকে। তবে নতুন প্রজন্মের উদ্ভিদে নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে না। নতুন প্রজন্মের গাছ কম জীবনীশক্তিসম্পন্ন বীজের সৃষ্টি করে। নতুন গাছের অভিযোজন ক্ষমতা কমে যায় এবং এক সময়ে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে।

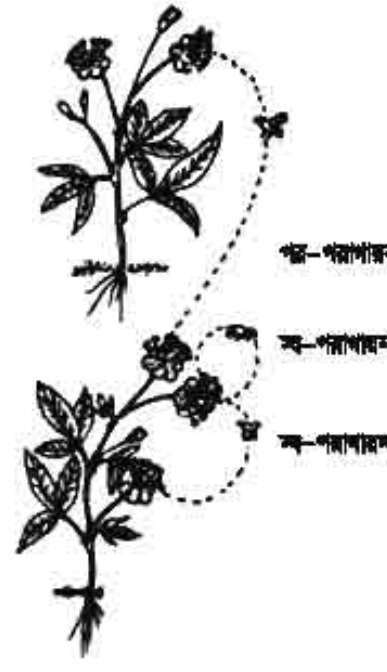

চিত্র ১১.৪ : স্ব–পরাগায়ন ও পর–পরাগায়ন

২. পরপরাগায়ন : একই প্রজাতির দু'টি ভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে যখন পরাগ সংযোগ ঘটে তখন তাকে পর–পরাগায়ন বলে। শিমুল, পেঁপে ইত্যাদি গাছের ফুলে পর–পরাগায়ন হতে দেখা যায়।

পর–পরাগায়নের ফলে নতুন চরিত্রের সৃষ্টি হয়, বীজের অঙ্কুরোদ্গমের হার বৃদ্ধি পায়, বীজ অধিক জীবনীশক্তি সম্পন্ন হয় ও নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। দুটি ভিন্ন গুণসম্পন্ন গাছের মধ্যে পরাগায়ন ঘটে তাই এর ফলে যে বীজ উৎপন্ন হয় তা নতুন গুণসম্পন্ন হয়। এ বীজ থেকে যে গাছ জন্মায় তাও নতুন গুণসম্পন্ন হয়। একারণে এসব গাছের নতুন ভ্যারাইটির সৃষ্টি হয়। তবে এটি বাহক নির্ভর প্রক্রিয়া হওয়ায় পরাগায়নের নিশ্চয়তা থাকে না, এতে প্রচুর পরাগরেণুর অপচয় ঘটে ফলে প্রজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়।

পরাগায়নের মাধ্যম

পরাগ স্থানান্তরের কাজটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো মাধ্যমের দ্বারা হয়ে থাকে। যে পরাগ বহন করে গর্ভমুন্ড পর্যন্ত নিয়ে যায় তাকে পরাগায়নের মাধ্যম বলে। বায়ু, পানি, কীট–পতঙ্গ, পাখি, বাদুড়, শামুক এমনকি মানুষ এ ধরনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। মধু খেতে অথবা সুন্দর রঙের আকর্ষণে পতঙ্গ বা প্রাণী ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়। সে সময়ে ঐ ফুলের পরাগরেণু বাহকের গায়ে লেগে যায়। এই বাহকটি যখন অন্য ফুলে গিয়ে বসে তখন পরাগ পরবর্তী ফুলের গর্ভমুন্ডে লেগে যায়। এভাবে পরাগায়ন ঘটে। পরাগায়নের মাধ্যমগুলোর সাহায্য পেতে ফুলের গঠনে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

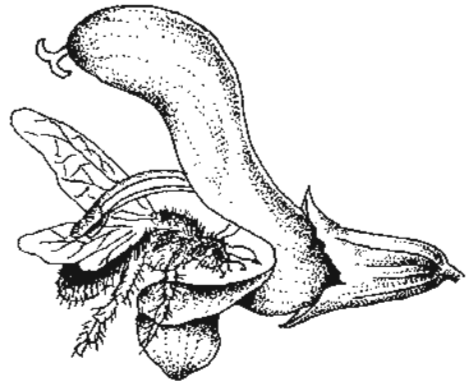

চিত্র–১১.৫: পতঙ্গপরাগী ফুল।

পতঙ্গ পরাগী ফুল বড়, রঙ্গীন ও মধুগ্রন্থিযুক্ত এবং পরাগরেণু ও গর্ভমুন্ড আঁঠালো সুগন্ধযুক্ত হয়, যেমন– জবা, কুমড়া, সরিষা ইত্যাদি।

বায়ুপরাগী ফুল, হালকা ও মধুগ্রন্থিহীন। এসব ফুলে সুগন্ধ নেই। এরা সহজেই বাতাসে ভেসে যেতে পারে। এদের গর্ভমুন্ড আঁঠালো ও শাখান্বিত, কখনও পালকের মতো ফলে বাতাস থেকে পরাগরেণু সহজেই সংগ্রহ করে নিতে পারে, যেমন–ধান।

পানিপরাগী ফুল আকারে ক্ষুদ্র এবং হালকা। এরা সহজেই পানিতে ভাসতে পারে। এসব ফুলে সুগন্ধ নেই। স্ত্রীপুষ্পে বৃন্ত লম্বা কিন্তু পুংফুলের বৃন্ত ছোট। পরিণত পুংপুষ্প বৃন্ত থেকে খুলে পানিতে ভাসতে থাকে এবং স্ত্রী পুষ্পের কাছে পৌঁছালে সেখানেই পরাগায়ন ঘটে, যেমন– পাতাশ্যাওলা।

চিত্র–১১.৬: প্রাণিপরাগী ফুল।

প্রাণীপরাগী এসব ফুল মোটামুটি বড় ধরনের হয় তবে ছোট হলে ফুলগুলো পুষ্পমঞ্জরিতে সজ্জিত থাকে।এদের রং আকর্ষণীয় হয়।এসব ফুলে গন্ধ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে যেমন– কদম, শিমুল,কচু ইত্যাদি।

পুং–গ্যামেটোফাইটের উৎপত্তি (Microsporogenesis)

পরাগরেণু পুং–গ্যামেটোফাইটের প্রথম কোষ। পূর্ণতাপ্রাপ্তির পরপর পরাগরেণু পরাগথলিতে থাকা অবস্থায়ই অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। পরাগরেণুর কেন্দ্রিকাটি মাইটোটিক পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়। এ বিভাজনে একটি বড় কোষ ও একটি ক্ষুদ্র কোষ সৃষ্টি হয়। বড়কোষটিকে নালিকোষ (Tube cell) এবং ক্ষুদ্র কোষটিকে জেনারেটিভ কোষ (Generative Cell) বলে।

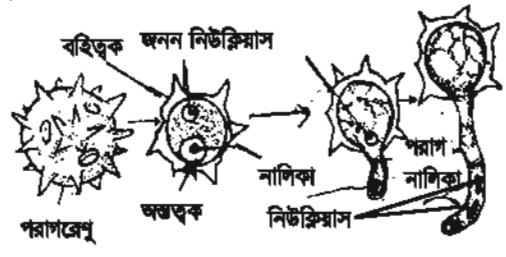

চিত্র–১১.৭ : পুং–গ্যামেটোফাইট উৎপত্তির বিভিন্ন ধাপ

নালিকোষ বৃদ্ধিপাপ্ত হয়ে পরাগনালি (Polen tube) এবং জেনারেটিভ কোষটি বিভাজিত হয়ে দুটি পুংজনন কোষ (Male gametes) উৎপন্ন হয়। জেনারেটিভ কোষের এ বিভাজন পরাগরেণুতে অথবা পরাগনালিতে সংঘটিত হতে পারে।

স্ত্রী–গ্যামেটোফাইটের উৎপত্তি (Magasporogenegis)

ভ্রূণপোষক কলায় (Nucellus tissue) ডিম্বক রন্ধ্রের কাছাকাছি একটি কোষ আকারে সামান্য বড় হয়। এর প্রোটোপ্লাজম ঘন এবং কেন্দ্রিকাটি তুলনামূলকভাবে বড়। এ কোষটি বিয়োজন বিভাজন (Meiosis) এর মাধ্যমে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) কোষ সৃষ্টি করে। সর্বনিম্ন কোষটি ছাড়া বাকি তিনটি কোষ বিনষ্ট হয়ে যায়। সর্বনিম্ন এই বড় কোষটি বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমশ ভ্রূণথলিতে পরিনত হয়। এ কোষটির কেন্দিকা হ্যাপ্লয়েড (n)। এই কেন্দ্রিকাটি বিভক্ত হয়ে দুটি কেন্দ্রিকায় পরিণত হয়। এ কেন্দ্রিকাদ্বয় ভ্রূণথলির দুই মেরুতে অবস্থান নেয়। এবার এ দুটি কেন্দ্রিকার প্রতিটি পরপর দুবার বিভক্ত হয়ে চারটি করে কেন্দ্রিকার সৃষ্টি করে।

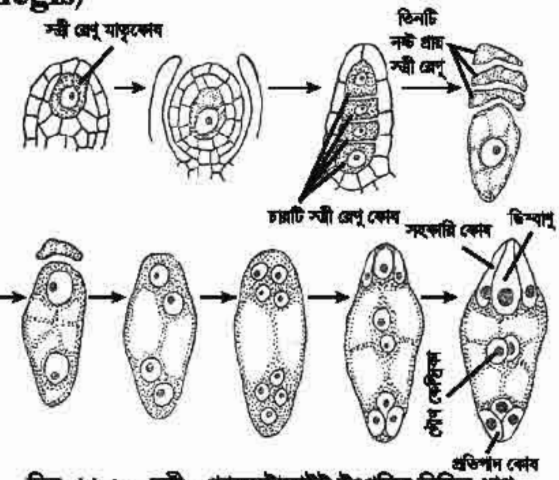

চিত্র–১১.৮ : স্ত্রী– গ্যামেটোফাইট উৎপত্তির বিভিন্ন ধাপ

এর পরবর্তী ধাপে দুইমেরু থেকে একটি করে কেন্দ্রিকা ভ্রূণথলির কেন্দ্রস্থলে এসে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড (2n) গৌণ কেন্দ্রিকা (Secondary nucleus) সৃষ্টি করে। দুই মেরুর কেন্দ্রিকাগুলো সামান্য সাইটোপ্লাজম সহকারে কোষের সৃষ্টি করে। ডিম্বকরন্ধ্রের দিকের কোষ তিনটিকে গর্ভযন্ত্র (Egg apparatus) বলে। এর মাঝের কোষটি বড়। একে ডিম্বাণু (Egg) ও অন্য কোষকে সহকারি কোষ (Synergids) বলা হয়। গর্ভযন্ত্রের বিপরীত দিকের কোষ তিনটিকে প্রতিপাদ কোষ (Antipodal cells) বলে। এভাবেই ভ্রূণথলির গঠন প্রক্রিয়া শেষ হয়।

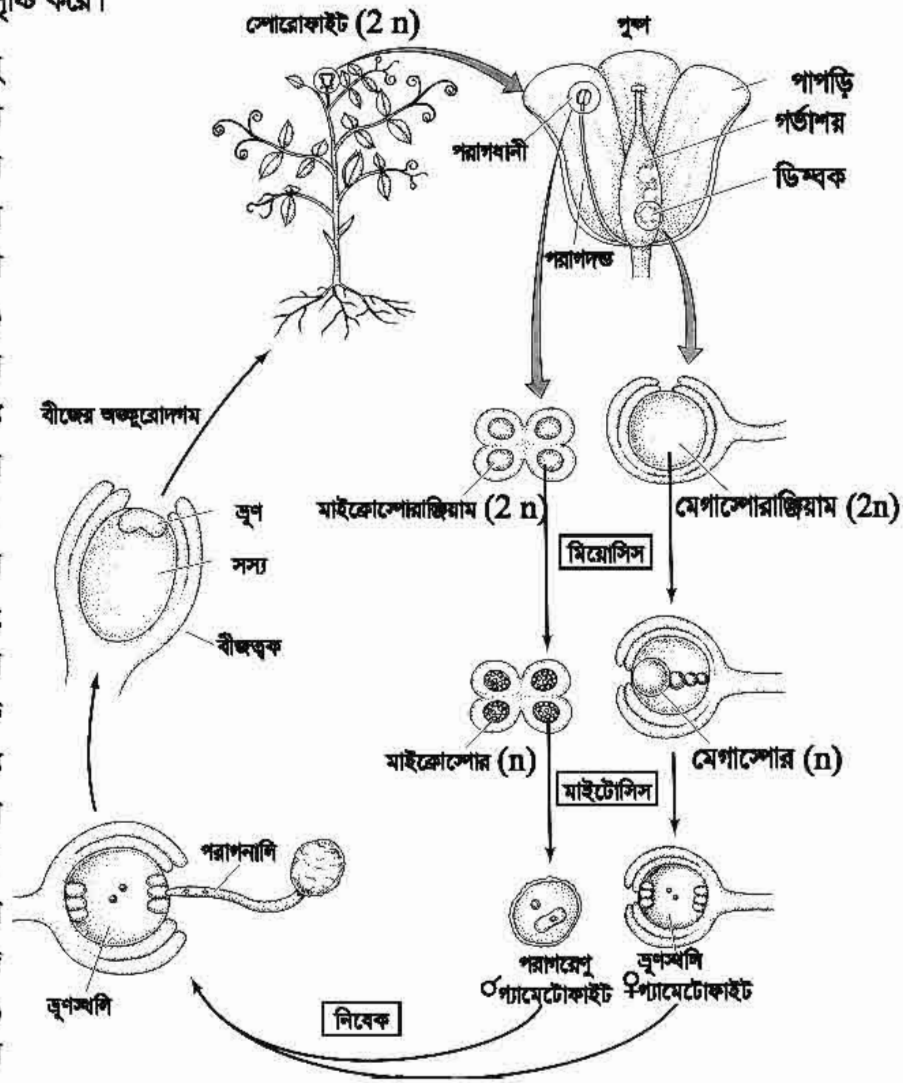

চিত্র ১১.৯ : সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবন চক্র

নিষেক (Fertilization)

পরাগায়নের ফলে পরিণত পরাগরেণু গর্ভপত্রের গর্ভমুন্ডে (Style) পতিত হয়। এরপর পরাগনালিকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে গর্ভদন্ড ভেদ করে। এবং কিছু তরল পদার্থ শোষণ করে স্ফীত হয়ে উঠে। এক সময় এ স্ফীত অগ্রভাগটি ফেটে পুংজনন কোষ দুইটি ভ্রূণথলিতে মুক্ত হয়। এর একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট (Zygote) সৃষ্টি করে। অপর পুংজনন কোষটি গৌণ কেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হয়ে ট্রিপ্লয়েড (3n) সস্য কোষ (Endosperm cells) এর সৃষ্টি করে।

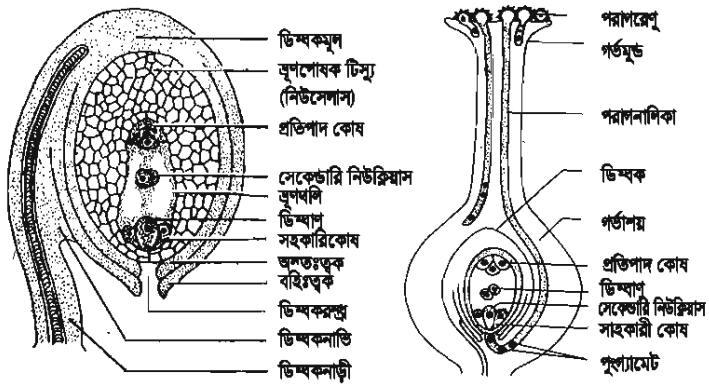

চিত্র–১১.১১: ডিম্বাণুর গঠন ও নিষেক প্রক্রিয়া।

প্রায় একই সময়ে দুটি পুংজনন কোষের একটি ডিম্বাণু ও অপরটি গৌণ কেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হয়। এ ঘটনাকে দ্বিনিষেক (Double fertilization) বলা হয়।

নতুন স্পোরোফাইট গঠন (Development of new sporophyte)

জাইগোট কোষটি স্পোরোফাইটের প্রথম কোষ। এর প্রথম বিভাজনে দুটি কোষ সৃষ্টি হয়। একই সাথে সস্যের পরিস্ফুটণও ঘটতে শুরু করে। জাইগোটের বিভাজন অনুপ্রস্থে (Transversely) ঘটে। ডিম্বকরন্ধ্রের দিকের কোষকে ভিত্তি কোষ (Basal cell) এবং ভ্রূণথলির কেন্দ্রের দিকের কোষটিকে এপিক্যাল কোষ (Apical cell) বলা হয়। একই সাথে এ কোষ দুটির বিভাজন চলতে থাকে। ধীরে ধীরে এপিক্যাল কোষটি একটি ভ্রূণে পরিণত হয়। একই সাথে ভিত্তি কোষ থেকে ভ্রূণধারক (Suspensor) গঠন করে। ক্রমশ বীজপত্র, ভ্রূণমূল ও ভ্রূণকান্ডের সৃষ্টি হয়। ক্রমান্বয়ে গৌণকেন্দ্রিকাটি সস্যটিস্যু উৎপন্ন করে। এই সস্য কোষগুলো ট্রিপ্লয়েড অর্থাৎ এর কেন্দ্রিকায় 3n সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। পরিণত অবস্থায় ডিম্বকটি সস্য ও ভ্রূণসহ বীজে পরিণত হয়। এ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইটের সৃষ্টি করে।

অতএব দেখা গেল একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনচক্রে স্পোরোফাইট ও গ্যামেটোফাইট নামক দুইটি স্তর একটির পর একটি চক্রাকারে চলতে থাকে।

ফলের উৎপত্তি : আমরা ফল বলতে সাধারণত আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আঙুর, আপেল, পেয়ারা, সফেদা ইত্যাদি সুমিষ্ট ফলগুলোকে বুঝি। লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, পটল এরাও ফল। এদের কাঁচা খাওয়া হয় না বলে এদের সবজি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এরা সবাই ফল। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলেই ফল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া গর্ভাশয়ে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তার কারণে ধীরে ধীরে এটি ফলে পরিণত হয় এবং এর ডিম্বকগুলো বীজে রূপান্তরিত হয়। নিষিক্তকরণের পর গর্ভাশয় এককভাবে অথবা ফুলের অন্যান্য অংশসহ পরিপুষ্ট হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে তাকে ফল বলে।

শুধু গর্ভাশয় ফলে পরিণত হলে তাকে প্রকৃত ফল বলে, যেমন– আম, কাঁঠাল। গর্ভাশয়সহ ফুলের অন্যান্য অংশ পুষ্ট হয়ে যখন ফলে পরিণত হয় তখন তাকে অপ্রকৃত ফল বলে, যেমন– আপেল, চালতা ইত্যাদি। সব প্রকৃত ও অপ্রকৃত ফলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন– সরল ফল, গুচ্ছফল ও যৌগিক ফল।

প্রাণীর প্রজনন : প্রাণীজগতে দুই ধরনের প্রজনন দেখা যায়। যথা– ১. অযৌন প্রজনন (Asexual reproduction) ও ২. যৌন প্রজনন (Sexual reproduction)।

১. **অযৌন প্রজনন** : নিম্ন শ্রেণির প্রাণীতে অযৌন প্রজনন ঘটে। মুকুলোদগম (Budding), বিভাজন, খণ্ডায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অযৌন জনন হয়।

২. **যৌন প্রজনন** : যে প্রক্রিয়ায় দুইটি বিপরীত লিঙ্গের প্রাণী পুং ও স্ত্রী জনন কোষ বা গ্যামেট (Gamete) উৎপন্ন করে এবং তাদের নিষেকের মাধ্যমে প্রজনন ঘটায় ও সন্তান–সন্ততি উৎপন্ন করে তাকে যৌন প্রজনন বলে।

নিষেক (Fertilization) : যৌন প্রজননের জন্য নিষেক প্রয়োজন। এটি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। যৌন প্রজননে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনকে নিষেক বলে। শুক্রাণু সক্রিয়ভাবে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে এবং এদের নিউক্লিয়াস দুটি পরস্পর একীভূত হয়। একীভূত হয়ে যে কোষটি উৎপন্ন হয় তাকে নিষেক ক্রিয়া সংঘটিত করার জন্য কিছু সময় লাগে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উভয়ই হ্যাপ্লয়েড (n) অর্থাৎ এক প্রস্থ ক্রোমোজোম (Chromosome) বহন করে। জাইগোট ডিপ্লয়েড (2n) বা দুইপ্রস্থ ক্রোমোজোমবিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুং উভয় জননকোষের পূর্ণতা প্রাপ্তি নিষেকের পূর্বশর্ত।

নিষেক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। কেবল একই প্রজাতির পরিণত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে এটি সংঘটিত হয়। নিষেক সাধারণত অপরিবর্তনশীল। একবার নিষিক্ত হলে ঐ ডিমটিকে পুনরায় নিষিক্ত করা যায় না। নিষেক দুই ধরনের–

১. বহিঃনিষেক (External Fertilization) এবং ২. অন্তঃনিষেক (Internal Fertilization)।

১. **বহিঃনিষেক** : যে নিষেক ক্রিয়া প্রাণীদেহের বাইরে সংঘটিত হয় তা বহিঃনিষেক নামে পরিচিত। এ ধরনের নিষেক সাধারণত পানিতে বাস করে এমন সব প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন– বিভিন্ন ধরনের মাছ। তবে এর ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন– হাঙ্গার এবং কয়েক প্রজাতির মাছ।

২. **অন্তঃনিষেক** : স্ত্রী দেহের জননাঙ্গে সংঘটিত নিষেক অন্তঃনিষেক নামে পরিচিত। সাধারণত সঙ্গমের মাধ্যমে পুরুষ প্রাণী তার শুক্রাণু স্ত্রী জননাঙ্গে প্রবেশ করিয়ে এ ধরনের নিষেক ঘটায়। অন্তঃনিষেক ডাঙায় বসবাসকারী অধিকাংশ প্রাণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নিষেকের কয়েকটি মৌলিক তাৎপর্য– নিষেক ভ্রূণে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যাকে পুনঃস্থাপিত করে, ডিম্বাণুকে পরিস্ফুটনের জন্য সক্রিয় করে তোলে, ক্রোমোজোম কর্তৃক বহনকৃত পিতা–মাতার বৈশিষ্ট্যসমূহকে একত্রিত করে ও ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে।

নিচের ব্লক চিত্রের সাহায্যে মানুষের প্রজননের ধাপগুলো দেখানো হলো:

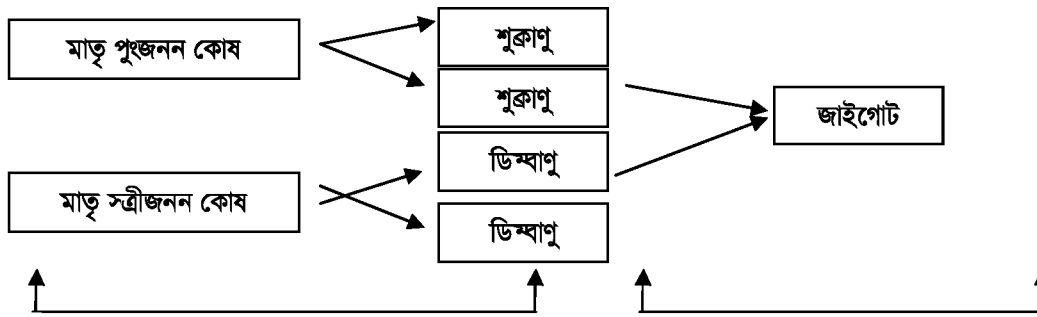

চিত্র ১১.১২ : মানব প্রজনেনর বিভিন্ন ধাপ (ব্লক চিত্র)

বংশবিস্তার এবং তার সংরক্ষণের জন্য প্রজনন প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ প্রক্রিয়ায় মাতৃগর্ভে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় ও সন্তান জন্ম নেয়। মানুষ একলিঙ্গা বিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ প্রজননের জন্য স্ত্রী ও পুরুষে পৃথক পৃথক অঙ্গ বর্তমান।

মানব প্রজননে হরমোনের ভূমিকা

ইতোমধ্যে তোমরা জেনেছ যে হরমোন এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। যা নালিহীন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। এটি রাসায়নিক দূত হিসেবে রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় এবং শারীরবৃত্তিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে। হরমোন নির্দিষ্ট অথচ স্বল্পমাত্রায় নিঃসৃত হয়ে নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি বা কম নিঃসরণ হলে দেহের বিভিন্ন কাজের ব্যাঘাত ঘটে। দেহে নানা রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

আমাদের দেহে নিম্নলিখিত গ্রন্থিগুলো প্রজনন সংক্রান্ত হরমোন নিঃসরণ করে।

১. পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland) ২. থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland) ৩. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (Adrenal gland) ৪. শুক্রাশয়ের অনালগ্রন্থি (Testis) ৫. ডিম্বাশয়ের অনালগ্রন্থি (Ovary) ৬. অমরা (Placenta)।

পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন ও উৎপাদক হরমোন নিঃসৃত হয়। এ হরমোনগুলো জননগ্রন্থি বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কাজ নিয়ন্ত্রণ, মাতৃদেহে স্তন ও দুগ্ধ ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া এগুলো জরায়ুর সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন নিঃসৃত হয়। এ হরমোন দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি, যৌন লক্ষণ প্রকাশ ও বিপাকে সহায়তা করে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন যৌনাঙ্গ বৃদ্ধি ও যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে। শুক্রাশয় থেকে নিঃসৃত টেস্টোস্টেরন ও অ্যান্ড্রোজেন শুক্রাণু উৎপাদন, দাঁড়ি গোফ গজানো, গলার স্বর বদলানো ইত্যাদি যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে। ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন ও রিলাক্সিন হরমোন মেয়েদের নারী সুলভ লক্ষণগুলো সৃষ্টি, ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণ, গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ভ্রূণ, অমরা ইত্যাদির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া ডিম্বাণু উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অমরা থেকে নিঃসৃত গোনাডোট্রপিক ও প্রোজেস্টেরন ডিম্বাশয়ের অনাল গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে ও স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

মানব শিশু জন্মগ্রহণের সময় তাদের প্রজননতন্ত্র অপরিণত অবস্থায় থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে, দৈহিক বৃদ্ধির সময় তাদের প্রজনন তন্ত্রের অঙ্গসমূহের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটতে থাকে। হরমোন এ সব কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশু তার বাল্যকাল অতিক্রম করে কৈশোর ও তারুণ্যে উপনীত হয়। কৈশোর ও তারুণ্যের সন্ধিকালই হলো বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময় ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ ঘটে। তাদের দেহের বাইরে ও ভিতরে পরিবর্তন ঘটে, যেমন– ছেলেদের গোঁফ দাড়ি গজায়, গলার স্বর পরিবর্তন হয় ও কাঁধ চওড়া হয় ইত্যাদি।

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের দেহে যেসব পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা হলো– নারীসুলভ লজ্জা ও সংকোচ প্রকাশ, দেহত্বক কোমল হয়, ঋতুস্রাব বা মাসিক হয় ও চেহারায় কমনীয়তা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মেয়েদের নির্দিষ্ট সময় পর পর রক্তস্রাব হয়। একে মাসিক বা ঋতুস্রাব বলে। বয়ঃসন্ধিকালের ১–২ বছর পর মেয়েরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। সাধারণত ৪০–৫০ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের ঋতুস্রাব চক্র চলতে থাকে। এরপর ঋতুস্রাব চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। একে মেনোপজ (Menopause) বা রজনিবৃত্তিকাল বলে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার গর্ভাবস্থায় মেয়েদের রক্তস্রাব সাময়িক বন্ধ থাকে। সন্তান প্রসবের প্রায় দেড় মাস পর স্বাভাবিক রক্তস্রাব আবার শুরু হয়।

বিবাহ একটি সামাজিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক বন্ধন। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী–স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় একটি পরিবার গড়ে উঠে। তারা দুজনে নির্দ্বিধায় মেলামেশা করতে পারে। তাদের মাঝে প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিবাহের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট বয়স সীমা থাকা দরকার। মেয়েদের ২০ বছর বয়সের আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। বাল্য বিবাহের ফলে মেয়েরা অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করে। এতে গর্ভবতী মা ও সন্তান উভয়েরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

স্বামী–স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যৌন মিলন ঘটে। যৌন মিলনের সময় পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রী প্রজনন অঙ্গে প্রবেশ করে। শুক্রাণুতে লেজ থাকে। যা তাকে সাঁতরিয়ে স্ত্রী জননতন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করতে সহায়তা করে। পরিণত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে স্ত্রীর ডিম্বনালিতে। এই মিলনকে নিষেক বলে। তবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, একটি শুক্রাণু দ্বারা একটি মাত্র ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়। এভাবে মানব দেহের ভিতরে অন্তঃনিষেক ঘটে। এ বিশেষ পদ্ধতিতে শুক্রাণুর একপ্রস্থ ক্রোমোজোম (n) ও ডিম্বাণুর একপ্রস্থ ক্রোমোজোমের (n) মিলন ঘটে ফলে দুইপ্রস্থ ক্রোমোজোমের (2n) সমন্বয়ে জাইগোট (Zygote) উৎপন্ন হয়।

ভ্রূণের বিকাশ : নিষিক্ত ডিম্বাণু ধীরে ধীরে ডিম্বনালি বেয়ে জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় নিষিক্ত ডিম্বাণুর কোষ বিভাজন বা ক্লীভেজ চলতে থাকে। কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায়ের গঠনমুখ ভ্রূণ ডিম্বনালি থেকে জরায়ুতে পৌঁছায়। এ পর্যায়ে ভ্রূণকে ব্লাস্টোসিস্ট (Blastocyst) বলা হয়। জরায়ুতে এর পরে যে ঘটনাবলীর অবতারণা হয় তা ভ্রূণ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

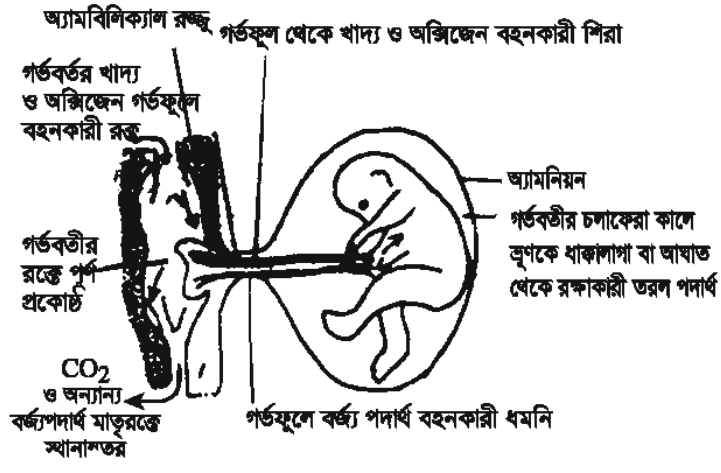

চিত্র ১১.১৩ : মাতৃগর্ভে আমরা ও ভ্রূণ

ব্লাস্টোসিস্ট পরবর্তী পর্যায়গুলো সমাপনের জন্য ভ্রূণকে জরায়ুর প্রাচীরে সংলগ্ন হতে হয়। জরায়ুর প্রাচীরে ভ্রূণের এ সংযুক্তিকে ভ্রূণ সংস্থাপন (Implantation) বা গর্ভধারণ বলে। জরায়ুর অন্তঃগাত্রে সংলগ্ন অবস্থায় ভ্রূণটি বৃদ্ধি পায় ও মানব শিশুতে পরিণত হয়। জরায়ুর অন্তঃগাত্রে ভ্রূণের সংস্থাপন হওয়ার পর থেকে শিশু ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়কে গর্ভাবস্থা বলে। এ সময় মাসিক বা রজচক্র বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত ৩৮–৪০ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভাবস্থা বিদ্যমান থাকে।

অমরা (Placenta) : যে বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে মাতৃ জরায়ুতে ক্রমবর্ধমান ভ্রূণ এবং মাতৃ জরায়ু টিস্যুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে অমরা বা গর্ভফুল বলে। ভ্রূণ জরায়ুতে পৌঁছানোর ৪–৫ দিনের মধ্যে সংস্থাপন সম্পন্ন হয়। ক্রমবর্ধনশীল ভ্রূণের কিছু কোষ এবং মাতৃ জরায়ুর অন্তঃস্তরের কিছু কোষ মিলিত হয়ে ডিম্বাকার ও রক্তনালি সমৃদ্ধ অমরা গঠন করে। এভাবে ভ্রূণ ও মাতৃ জরায়ুর অন্তঃস্তরের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য অস্থায়ী অঙ্গ তৈরি করে। প্রসবের সময় অমরা দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

অমরার সাহায্যে ভ্রূণ জরায়ুর গাত্রে সংস্থাপিত হয়। এতে ভ্রূণের কোনো ক্ষতি হয় না। ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের দরকার। শর্করা, আমিষ, স্নেহ, পানি ও খনিজ লবণ ইত্যাদি অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্ত থেকে ভ্রূণের রক্তে প্রবেশ করে। অমরা অনেকটা ফুসফুসের মতো কাজ করে। অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্ত থেকে অক্সিজেন গ্রহণ এবং ভ্রূণ থেকে

কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে। অমরা বৃক্কের মতো কাজ করে। বিপাকের ফলে যে বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় তা অমরার মাধ্যমে ভ্রূণের দেহ থেকে অপসারিত হয়। অমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরি করে। এ হরমোন ভ্রূণের রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বাভাবিক গঠনে সাহায্য করে।

নিষেকের ১২ সপ্তাহের মধ্যে অমরা গঠিত হয়। গর্ভাবস্থায় অমরার মাধ্যমে ভ্রূণ ও মায়ের দেহ প্রয়োজনীয় পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থ আদান–প্রদান করে।

অমরাতে প্রচুর রক্তনালি থাকে। অমরার আম্বিলিকাল কর্ড ভ্রূণের নাভির সাথে যুক্ত থাকে। একে নাড়ীও বলা হয়। এটা মূলত একটি নালি যার ভেতর দিয়ে মাতৃদেহের সাথে ভ্রূণের বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ঘটে। গর্ভাবস্থায় অমরা থেকে এমন কতকগুলো হরমোন নিঃসৃত হয় যা মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন ও প্রসব সহজ করতে সহায়তা করে।

ভ্রূণ আবরণী

প্রত্যেক প্রজাতিতে ভ্রূণের জন্য মাতৃদেহের ভিতর সহজ, স্বাভাবিক ও নিরাপদ পরিবর্ধনের ব্যবস্থা হিসেবে ভ্রূণের চারদিকে কতকগুলো ঝিল্লী বা আবরণ থাকে। এগুলো ভ্রূণের পুষ্টি, গ্যাসীয় আদান–প্রদান, বর্জ্য নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজে সহায়তা করে। ভ্রূণ আবরণীগুলো ক্রমবর্ধনশীল ভ্রূণকে রক্ষা করে এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়।

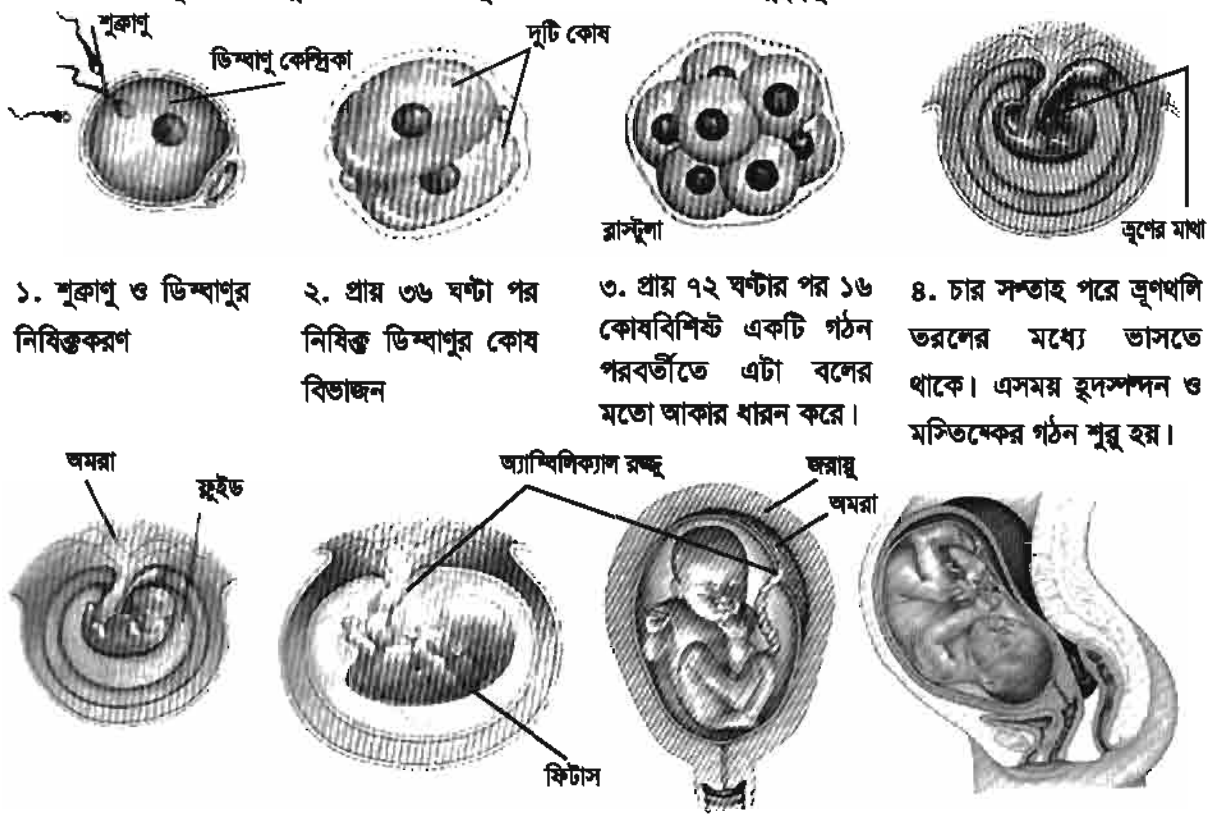

১. শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ

২. প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর নিষিক্ত ডিম্বাণুর কোষ বিভাজন

৩. প্রায় ৭২ ঘণ্টার পর ১৬ কোষবিশিষ্ট একটি গঠন পরবর্তীতে এটা বলের মতো আকার ধারন করে।

৪. চার সপ্তাহ পরে ভ্রূণথলি তরলের মধ্যে ভাসতে থাকে। এসময় হৃদস্পন্দন ও মস্তিষ্কের গঠন শুরু হয়।

৫. প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে ভ্রূণের বৃদ্ধি চলতে থাকে এবং হাত ও পায়ের গঠনের মুকুলের মতো অঙ্গানু সৃষ্টি হয়।

৬. প্রায় ৮ সপ্তাহ পরে ভ্রূণকে ফিটাস বলা হয়। কিন্তু অঙ্গাগুলো ছোট আকারে থাকে।

৭. ২৮ সপ্তাহ পরে ফিটাস পূর্ণাঙ্গতাপ্রাপ্ত হয়। ভ্রূণের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

৮. ৩৮ সপ্তাহে জরায়ু ভিতর ফিটাসের মাথা নিচের দিকে ঘুরে যায় এবং ভূমিষ্ঠ প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি চলতে থাকে।

চিত্র ১১.১৪ : ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশ

ভ্রূণ মাতৃগর্ভে গড়ে প্রায় ৪০ সপ্তাহ অবস্থান করে। ঐ একই সময়ে গর্ভবতী মায়ের অগ্র পিটুইটারি ও অমরা থেকে হরমোন নিঃসরণ শুরু হয়। ৪০ তম সপ্তাহে হরমোনদ্বয় সক্রিয় হয়। প্রসবের পূর্বে জরায়ু নির্দিষ্ট ব্যবধানে সংকুচিত হতে থাকে ও ব্যথা–বেদনার সৃষ্টি হয়। এই ক্রমবর্ধমান বেদনাকে প্রসব বেদনা বলে। প্রসবের শেষপর্যায়ে ভ্রূণের বাইরের পর্দাগুলো ফেটে যায়। এর ভিতরের তরল বাইরে নির্গত হয়। এক পর্যায়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।

প্রজনন সংক্রান্ত রোগ

এইড্স (Acqired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) : বর্তমান বিশ্বে এইডস্ একটি মারাত্মক ঘাতক ব্যাধি হিসেবে পরিচিত। ১৯৮১ সনে রোগটা আবিষ্কৃত হয়। Acqired Immune Deficiency Syndrome এর প্রত্যেকটি শব্দের অদ্যাক্ষর দিয়ে এ রোগটির নামকরণ করা হয়েছে। UNAIDS এর এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখেরও বেশি লোক AIDS এর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। এর মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ হলো নারী। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১৬৪টি দেশে এই রোগের বিস্তার ঘটেছে। Human Immune Deficiency Virus সংক্ষেপে HIV ভাইরাস–এর আক্রমণে এইডস হয়। এই ভাইরাস শ্বেত রক্তকণিকার ক্ষতি সাধন করে ও এ কণিকার এন্টিবডি তৈরিতে বিঘ্ন ঘটায়। ফলে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা ও এন্টিবডির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। এই ভাইরাস মানবদেহে সুপ্ত অবস্থায় অনেকদিন থাকতে পারে। এই ভাইরাসের আক্রমণে রোগীর দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায় ফলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ এইডস রোগীর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার মতো কোনো ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয়নি।

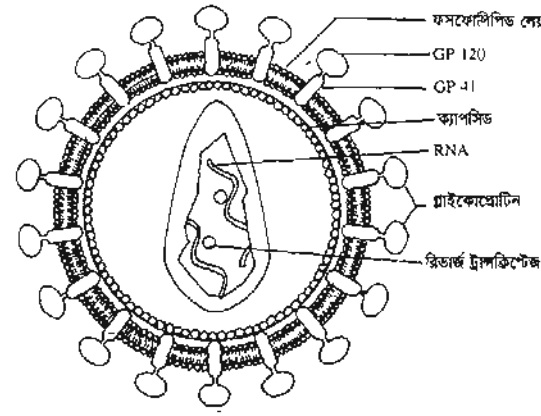

চিত্র ১১.১৫ : HIV এর গঠন

এইডস রোগের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে একজন সুস্থ ব্যক্তি এই ঘাতক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। যেমন–

১. এইডস আক্রান্ত পুরুষ ও মহিলার যৌন মিলনের মাধ্যমে এ রোগ হয়। দুর্ঘটনাজনিত রক্তক্ষরণ, প্রসবজনিত রক্তক্ষরণ, বড় অস্ত্রোপচার, রক্তশূন্যতা, থ্যালাসেমিয়া, ক্যান্সার ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেহে রক্ত সঞ্চালন প্রয়োজন হয়। এই অবস্থায় এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর রক্ত সুস্থ ব্যক্তির দেহে সঞ্চালন করলে এইডস রোগ হয়।

২. এইডস এ আক্রান্ত বাবা মায়ের সন্তান এইডস রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্ত মায়ের দুধ শিশু পান করলে সে শিশুও এইডস এ আক্রান্ত হতে পারে।

৩. HIV জীবাণুযুক্ত ইনজেকশানের সিরিঞ্জ, সুঁচ, দন্ত চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং অপারেশনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমেও সুস্থ ব্যক্তি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

৪. আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপনকালে এ রোগ সংক্রমিত হয়।

এইডস রোগের লক্ষণ

রোগ জীবাণু সুস্থ দেহে প্রবেশ করার প্রায় ৬ মাস পরে এই রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। এর আগে উক্ত ব্যক্তি যে এইডস রোগের বাহক তা বোঝা যায় না। লক্ষণগুলো হলো–

- অতি দ্রুত রোগীর ওজন কমতে থাকে।
- এক মাসেরও বেশি সময়ব্যাপী একটানা জ্বর থাকে অথবা জ্বর জ্বর ভাব দেখা দেয়।
- একমাস বা তারও বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হয়।
- অনেকদিন ধরে শুকনো কাশি হতে থাকে।
- ঘাড় ও বগলে ব্যথা অনুভব করা, মুখ–মণ্ডল খসখসে হয়ে যায়।
- মুখমণ্ডল, চোখের পাতা, নাক ইত্যাদি অঙ্গ হঠাৎ ফুলে যায় ও সহজে ফোলা কমে না।
- সারা দেহে চুলকানি হয়া।

এইডস রোগ প্রতিরোধের উপায়

তোমরা অষ্টম শ্রেণিতে এই রোগ সম্পর্কে জেনেছ। এস আমরা সেগুলো মনে আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নেই।

- এইডস প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি?
- এই রোগ বিস্তারের কারণগুলো থেকে বিরত থেকে রোগটি প্রতিরোধ করা কি সম্ভব? তোমরা প্রতিরোধের উপায়গুলো বোর্ডে লেখ ও একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি কর।

কাজ: তোমরা ৫ জন করে এক একটি দলে ভাগ হয়ে এইডস প্রতিরোধের বিষয়ে পোস্টার/লিফলেট অঙ্কন কর।

অনুশীলনী

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষকে এক লিঙ্গাবিশিষ্ট প্রাণী বলা হয় কেন?

২. জরায়ু কী? এর প্রয়োজনীয়তা কী?

৩. অমরা কী? অমরার কাজ কী?

৪. এইডস রোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

৫. কীভাবে সন্তান সম্ভবা মায়ের যত্ন নিতে হবে? ব্যাখ্যা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফুলকে উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ বলা হয় কেন বর্ণনা কর।

২. এইডস রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন ফুলে দ্বিগুচ্ছ পরাগদণ্ড থাকে?

ক. জবা খ. মটর

গ. শিমুল ঘ. সূর্যমুখী

২. বায়ুপরাগী ফুল–

i. আকারে বড় হয়

ii. গর্ভমুণ্ড শাখাবিহীন হয়

iii. মধুগ্রন্থি অনুপস্থিত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

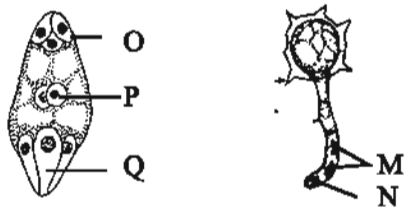

৩. উদ্দীপকের কোনটি পরিবর্তিত হয়ে বীজ হয়?

ক. N খ. O

গ. P ঘ. Q

৪. সস্যকলা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে কোনটি?

ক. M ও Q খ. M ও P

গ. M ও N ঘ. N ও P

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.

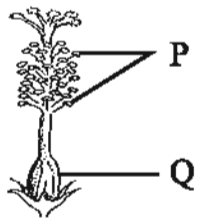

ক. পরাগথলি কী?

খ. অনিয়ত পুষ্পমঞ্জুরি বলতে কী বুঝায়?

গ. P অংশটি এই ফুলে অনুপস্থিত থাকলে পরাগায়নের ক্ষেত্রে কী ঘটবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. Q চিহ্নিত অংশটি কীভাবে প্রজাতিকে রক্ষা করে যুক্তিসহ তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

২. ১২ বছরের হৃদয় ছোটবেলা থেকে সুরেলা কণ্ঠে গান গায়। ইদানিং কিছু দেহিক ও মানসিক পরিবর্তনের পাশাপাশি তার গলার স্বর মোটা হয়ে গেছে। তাই তার মা চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি বললেন এ সময়ে শিশুদের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক।

ক. অমরা কী?

খ. AIDS কে ঘাতক রোগ বলা হয় কেন?

গ. হৃদয়ের ঐ সময়ের ঘটনাগুলো ঘটার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হৃদয়ের ঐ সময়ে পরিবারের বড়দের তার প্রতি করণীয় ভূমিকাগুলো ব্যাখ্যা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

জীবের বংশগতি ও বিবর্তন

মাতা–পিতার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যাবলী বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। মাতাপিতা থেকে বৈশিষ্ট্য সন্তানে কীসের মাধ্যমে কীভাবে স্থানান্তরিত হয় তা আমরা এ অধ্যায়ে জানতে পারব। এ অধ্যায়ে আমরা আরও জানতে পারব যে– জীবজগতের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি বর্তমান এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষ (Ancestor) থেকে উদ্ভূত হয়ে বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

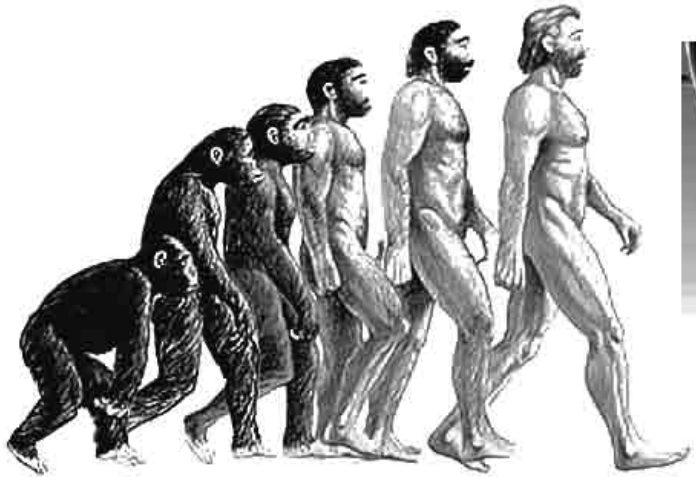

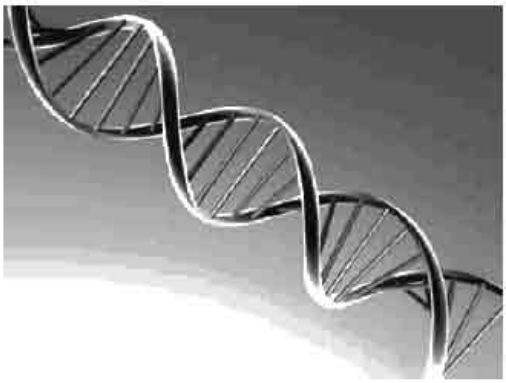

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বংশগতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বংশপরম্পরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় স্থানান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বংশগতির তথ্য স্থানান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- DNA প্রতিরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বংশগতির তথ্য স্থানান্তরে ডিএনএ (DNA)এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- DNA টেস্টের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লিঙ্গ নির্ধারণে পুরুষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জেনেটিক ডিসঅর্ডারের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব।
- বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বর্ণনা করতে পারব।
- প্রজাতির টিকে থাকায় বিবর্তনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- মা–বাবার সাথে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ণয় করতে পারব।
- আমাদের জীবনে ডিএনএ (DNA) টেস্টের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পৃথিবীর সব জীব তার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী প্রজন্মে প্রায় অবিকল স্থানান্তর ও পরিস্ফুটিত হয়। পৃথিবীর সব জীবের ক্ষেত্রেই এই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযোজ্য। তাই আমরা ধান গাছের বীজ থেকে ধান, আমের বীজ থেকে আমগাছ, পাটের বীজ থেকে পাটগাছ জন্মাতে দেখি। এভাবেই বংশানুক্রমে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততির দেহে সঞ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো ''বংশগতি'' (Heredity)। বংশগতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ও গবেষণা করা হয় বংশগতিবিদ্যা (Genetics) নামক জীববিজ্ঞানের বিশেষ শাখায়।

কাজ : মা–বাবার সাথে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত কর এবং ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

বংশ পরম্পরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী উপাদান (বংশগতিবস্তু) : মাতাপিতার বৈশিষ্ট্যাবলী তাদের সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয় বংশগতিবস্তু (Hereditary material) র মাধ্যমে। এগুলো হলো ক্রোমোজোম, জিন, ডিএনএ (DNA) ও আরএনএ (RNA)। নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ক্রোমোজোম (Chromosome) : বংশগতির প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রোমোজোম। এটি নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওপ্লাজমে বিস্তৃত এবং সূত্রাকার ক্রোমাটিন দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানী Strasburger (১৮৭৫) সর্বপ্রথম ক্রোমোসোম আবিষ্কার করেন। প্রজাতির বৈশিষ্ট্যভেদে কোষে এর ডিপ্লয়েড (দুই সেট ক্রোমোসোম, যার একসেট পিতা থেকে আসে এবং আর একসেট মাতা থেকে আসে) সংখ্যা ২ হতে ১৬০০ পর্যন্ত হতে পারে। একটি ক্রোমোসোম সাধারণত ৩.৫ থেকে ৩০.০ মাইক্রন দৈর্ঘ্যে ও ০.২ থেকে ২.০ মাইক্রন প্রস্থে হয়ে থাকে (১ মাইক্রন = $\frac{১}{১০০০}$ মিমি)। ক্রোমোজোমের কাজ হলো মাতাপিতা হতে জিন (যা জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রন করে) সন্তানসন্ততিতে বহন করে নিয়ে যাওয়া। মানুষের চোখের রং, চুলের প্রকৃতি, চামড়ার গঠন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ক্রোমোসোম কর্তৃক বাহিত হয়ে বংশগতির ধারা অক্ষুন্ন রাখে। এ কারণে ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌতভিত্তি (Physical basis of heredity) বলে আখ্যায়িত করা হয়।

DNA : ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান ডিএনএ হলো ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (Deoxyribo Nucleic Acid)। এটি সাধারণত দ্বিসূত্রবিশিষ্ট পলিনিউক্লিওটাইডের সর্পিলাকার গঠন। একটি সূত্র অন্যটির পরিপূরক। এতে পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা, নাইট্রোজেনঘটিত বেস (এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন) ও অজৈব ফসফেট থাকে। এই তিনটি উপাদান কে একত্রে 'নিউক্লিওটাইড' বলে। DNA ক্রোমোজোমের স্থায়ী পদার্থ। মার্কিন বিজ্ঞানী Watson ও ইংরেজ বিজ্ঞানী Crick ১৯৫৩ সালে সর্বপ্রথম DNA অনুর Double helix বা দ্বি–সূত্রী কাঠামোর বর্ণনা দেন এবং এ কাজের জন্য তাঁরা নোবেল পুরস্কার পান। নাইট্রোজেন বেসগুলো দুধরনের। যথা– পিউরিন ও পাইরিমিডিন। এডিনিন (A) ও গুয়ানিন (G)- বেস হলো পিউরিন এবং সাইটোসিন (C) ও থায়ামিন (T)-বেস হলো পাইরিমিডিন। একটি সূত্রের এডিনিন (A) অন্য সূত্রের থায়ামিন (T) এর সাথে দুইটি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত (A=T) থাকে এবং একটি সূত্রের গুয়ানিন (G) অন্য সূত্রের সাইটোসিনের (C) এর সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত ($G \equiv C$) থাকে। অর্থাৎ এই বন্ধন সর্বদা একটি পিউরিন ও পাইরিমিডিনের মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং দুটি সূত্রের একটি অন্যটির পরিপূরক কিন্তু এক রকম নয়। হেলিক্সের প্রতিটি পূর্ণ ঘূর্ণন ৩৪A^0 (Angstrom) দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং একটি পূর্ণ ঘূর্ণনের মধ্যে ১০টি নিউক্লিওটাইড থাকে। সুতরাং পার্শ্ববর্তী দুটি নিউক্লিওটাইডের দূরত্ব (উপর থেকে নিচে) ৩.৪A^0।

DNA এর দুটি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র বিপরীতভাবে (Antiparallel) অবস্থান করে। অনেকটা প্যাঁচানো সিঁড়ির ধাপের মতো, ক্ষারগুলি শায়িত (Flat) ভাবে প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ DNA অণুর বাইরের দিকের দণ্ড দুটি (প্রধান অক্ষ) পর পর সুগার ও ফসফেট দ্বারা গঠিত এবং এদের ভিতরের দিকে N_2 বেস অবস্থান করে। প্রকৃতকোষেও DNA সূক্ষ্ম সূতার মতো কিন্তু আদিকোষের DNA সাধারণত গোলাকার হয়ে থাকে এবং এর দৈর্ঘ্য কয়েক মাইক্রন থেকে কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এটি হাজার হাজার নিউক্লিওটাইডের বা নিউক্লিক এসিডের সমন্বয়ে গঠিত। DNA ডবল হেলিক্সের ব্যাস সর্বত্র ২০A^0। DNA ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান এবং বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি (Chemical basis of heredity)। DNA–ই জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক ও বাহক যা জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সরাসরি বহন করে মাতাপিতা থেকে তাদের বংশধরে নিয়ে যায়।

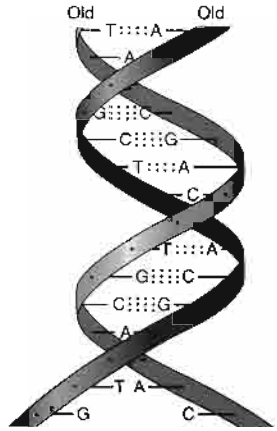

চিত্র ১২.১ : ডিএনএ

RNA : RNA হলো রাইবোনিউক্লিক এসিড (Ribonucleic Acid)। অধিকাংশ RNA তে একটি পলিনিউক্লিওটাইডের সূত্র থাকে। এতে পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট এবং নাইট্রোজেন বেস (এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল) থাকে। RNA ভাইরাসের ক্রোমোজোমে স্থায়ী উপাদান হিসেবে RNA পাওয়া যায়। কিছু সংখ্যক ভাইরাসের ক্ষেত্রে (যেমন– TMV, Tobacco Mosaic Virus) DNA অনুপস্থিত। অর্থাৎ যে সমস্ত ভাইরাস DNA দ্বারা গঠিত নয় তাদের নিউক্লিক এসিড হিসেবে থাকে RNA। এসব ক্ষেত্রে RNA–ই বংশগতির বস্তু হিসেবে কাজ করে।

জিন (Gene) : জীবের সব দৃশ্য ও অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী এককের নাম জিন। এর অবস্থান জীবের ক্রোমোজোমে। ক্রোমোজোমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে তাকে 'লোকাস' (Locus) বলে। এক জোড়া প্রতিরূপ ক্রোমোজোমে (Homologus chromosome) জিন জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট জিন থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক জিন মিলিতভাবে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে। আবার কোনো কোনো সময় একটি জিন একাধিক বৈশিষ্ট্যও নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন গবেষনার তত্ত্ব থেকে জানা গেছে যে, জিনই বংশগতির নিয়ন্ত্রক। বিভিন্ন জীবে জিনের সংখ্যা এক নয়। তবে একই প্রকৃতির জীবে তা প্রায় সবসময় একই থাকে। জিনগুলো সাধারণ নিয়মে ক্রোমোজোমের DNA অনুসূত্রের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৃথক ও রৈখিকভাবে পরপর সাজানো থাকে।

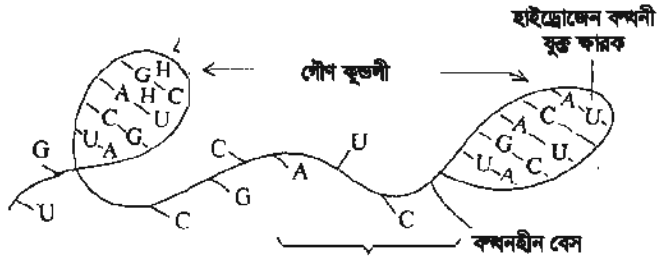

চিত্র ১২.২ : আরএনএ

মাতাপিতা থেকে প্রথম বংশধরে জীবের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাকে প্রকট বৈশিষ্ট্য বলে এবং এই প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে জিন দায়ী তাকে প্রকট জিন বলে এবং যে জিনের বৈশিষ্ট্যটি প্রথম বংশধরে প্রকাশ পায় না তবে দ্বিতীয় বংশধরে এক–চতুর্থাংশ জীবে প্রকাশ পায় তাকে প্রচ্ছন্ন জিন বলে। গ্রেগর জোহান মেন্ডেল ১৮৬৬ সালে মটরশুঁটি নিয়ে গবেষণাকালে বংশগতির ধারক ও বাহকরূপে যে ফ্যাক্টরের (factor) কথা উল্লেখ করেছিলেন সেটি আজ 'জিন' রূপে পরিচিত হয়েছে। গ্রেগর জোহান মেন্ডেল কে বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয়।

DNA অনুলিপন (DNA replication): এই প্রক্রিয়ায় একটি DNA অণু থেকে আর একটি নতুন DNA অণু তৈরি হয় বা সংশ্লেষিত হয় । DNA অর্ধ–রক্ষণশীল পদ্ধতিতে অনুলিপিত হয়। এই পদ্ধতিতে DNA সূত্র দুটির হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙ্গে গিয়ে আলাদা হয় এবং প্রতিটি সূত্র তার পরিপূরক (Complementary) নতুন সূত্র সৃষ্টি করে। পরে একটি পুরাতন সূত্র ও একটি নতুন সূত্র সংযুক্ত হয়ে DNA অণুর সৃষ্টি হয়। একটি পুরাতন মাতৃ সূত্রক এবং একটি নতুন সৃষ্ট সূত্রকের সমন্বয়ে গঠিত বলে একে অর্ধ–রক্ষণশীল পদ্ধতি বলে। ১৯৫৬ সালে Watson ও Crick এ ধরনের DNA অনুলিপন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব করেন ।

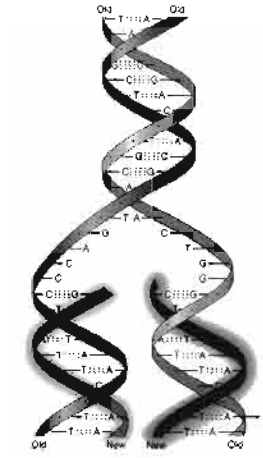

চিত্র ১২.৩ : ডিএনএ অণুলিপন

> **কাজ :** শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের বড় কাগজে রঙিন পেন্সিল দিয়ে ডিএনএ অংকন করে প্রদর্শনের জন্য শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে দিতে বলবেন।

ডিএনএ টেস্ট

বর্তমান শতাব্দীতে ডিএনএ প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং এর ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ এবং ঔষধ শিল্পে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত সাক্ষ্যপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শী নির্ভর বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি আজ বাংলাদেশেও সুবিচার পাবার এক নতুন উপায় ডিএনএ টেস্ট।

ডিএনএ টেস্টের বিজ্ঞানভিত্তিক এক ব্যবহারিক পদ্ধতিকে বলা হয় ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং। এছাড়া ডিএনএ টাইপিং, ডিএনএ টেস্টিং ইত্যাদি নামও প্রচলিত আছে। ডিএনএ টেস্ট সুসম্পন্ন করার জন্যে প্রথম প্রয়োজন জৈবিক নমুনা। ব্যক্তির হাড়, দাঁত, চুল, রক্ত, লালা, বীর্য ইত্যাদি বা টিস্যু মূল্যবান জৈবিক নমুনা হতে পারে। অপরাধস্থল কিংবা অপরাধের শিকার এমন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত জৈবিক নমুনার ডিএনএ নকশাকে (Small profile) তুলনা করা হয় সন্দেহভাজনের কাছ থেকে নেয়া রক্ত বা জৈবিক নমুনার ডিএনএ নকশার সাথে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে নমুনা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডিএনএ আলাদা করে নিতে হয়। পরে একাধিক সীমাবদ্ধ–এনজাইম (Small restriction enzyme) দিয়ে কেটে ছোট ছোট টুকরা করা হয়। এক বিশেষ পদ্ধতি ইলেকট্রোফোরেসিস্ (Small electrophoresis) এগারোজ বা পলিএক্রিলামাইড জেল এ ডিএনএ টুকরোগুলো তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যান্ড আকারে আলাদা করা হয়। এক ধরনের বিশেষ নাইট্রোসেলুলোজ কাগজে রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপ ডিএনএ প্রোবের সাথে হাইব্রিডাইজ করে এক্স–রে ফিল্মের উপর রেখে অটোরেডিওগ্রাফ পদ্ধতিতে দৃশ্যমান ব্যান্ডের সারিগুলো নির্ণয় করা হয় এবং অপরাধস্থল থেকে প্রাপ্ত নমুনার সাথে সন্দেহভাজন নমুনার মিল ও অমিল চিহ্নিত করে তুলনা করা হয়। এই পদ্ধতিটিকে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং বলা হয়। বর্তমানে পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (Polymerase chain reaction) বা পিসিআর (PCR) পদ্ধতিতে আরও নিপুনভাবে অল্প নমুনা ব্যবহার করে নির্ভুল ভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

মানুষের লিঙ্গ নির্ধারন

মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে প্রায় একই পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ হয়। মানবদেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬ বা ২৩ জোড়া, এর মধ্যে ৪৪ টিকে বা ২২ জোড়াকে অটোজোম (Autosome) এবং ১ জোড়াকে সেক্স–ক্রোমোজোম (Sex chromosome) বলা হয়। অটোজোমগুলি শারীরবৃত্তীয়, ভ্রূণ ও দেহ গঠন ইত্যাদি কার্যাদিতে অংশগ্রহণ করে, লিঙ্গ নির্ধারনে এদের কোনো ভূমিকা নেই। সেক্স ক্রোমোজোম দুটি এক্স (X) এবং ওয়াই (Y) নামে পরিচিত। লিঙ্গ নির্ধারনে এরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

স্ত্রীলোকের ডিপ্লয়েড কোষে দুটি সেক্স ক্রোমোজোমই X ক্রোমোজোম অর্থাৎ XX। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে একটি X অপরটি Y ক্রোমোজোম অর্থাৎ XY। X এবং Y উভয় ধরনের সেক্স–ক্রোমোজোমই আকৃতিতে লম্বা এবং রডের মতো, তবে Y ক্রোমোজোম X ক্রোমোজোমের তুলনায় কিছুটা ছোট। স্ত্রীলোকদের ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু সৃষ্টির সময় যখন মিয়োসিস বিভাজন ঘটে তখন প্রতিটি ডিম্বাণু অন্যান্য ক্রোমোজোমের সাথে একটি করে X ক্রোমোজোম লাভ করে। অপরপক্ষে, পুরুষে শুক্রাণু সৃষ্টির সময় অর্ধেক সংখ্যক শুক্রাণু একটি করে X ক্রোমোজোম এবং অবশিষ্ট অর্ধেক শুক্রাণু একটি করে Y ক্রোমোজোম লাভ করে। ডিম্বাণু পুরুষের X বা Y বহনকারী যে কোনো একটি শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হতে পারে। ফলে জাইগোট দুটি X অথবা একটি X এবং একটি Y ক্রোমোজোম বিশিষ্ট হতে পারে। দুটি X নিয়ে অর্থাৎ XX নিয়ে যে শিশু জন্মাবে সে হবে একটি মেয়ে, আর যে শিশু একটি X এবং একটি Y অর্থাৎ XY ক্রোমোজোম নিয়ে পৃথিবীতে আসবে সে হবে একটি ছেলে।

মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের কলা কৌশল ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কন্যা বা পুত্রসন্তানের জন্ম হবার ব্যাপারে মায়ের আদৌ কোনো ভূমিকা নেই। কারণ মা সব সময় কেবলমাত্র X বহনকারী ডিম্বাণু তৈরি করে। অপরদিকে পিতা X এবং Y উভয় ধরনের শুক্রাণু উৎপাদন করে। গর্ভধারনকালে কোন ধরনের শুক্রাণু মাতার X বহনকারী ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হবে তার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সন্তানের লিঙ্গ। যেহেতু নিষেকে কেবলমাত্র একটি শুক্রাণুই ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয় তাই পিতার X অথবা Y শুক্রাণুর কোনটি সাফল্যজনকভাবে নিষেক ঘটাবে তার উপর নির্ভর করে সন্তানের লিঙ্গ। যদি X বহনকারী শুক্রাণু নিষেক ঘটায় তাহলে জাইগোট হবে XX, অর্থাৎ সন্তান হবে কন্যা। আর যদি Y বহনকারী শুক্রাণু নিষেকে অংশগ্রহণ করে সেক্ষেত্রে জাইগোটে X এবং Y ক্রোমোজোম থাকবে অর্থাৎ ক্রোমোজোম দুটি হবে XY। ফলে শিশু যথারীতি পুত্র সন্তান হবে। অজ্ঞতার জন্য কন্যা–সন্তান প্রসব করায় অনেক সমাজে মাকেই দায়ী করে। এজন্য তাকে অনেক সময় গঞ্জনাও সহ্য করতে হয়। যদিও এটি একটি নিছক দৈবঘটনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তবুও দায়ী যদি কাউকে করতেই হয় তা করতে হবে পিতাকে, মাতাকে নয়।

চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হলো–

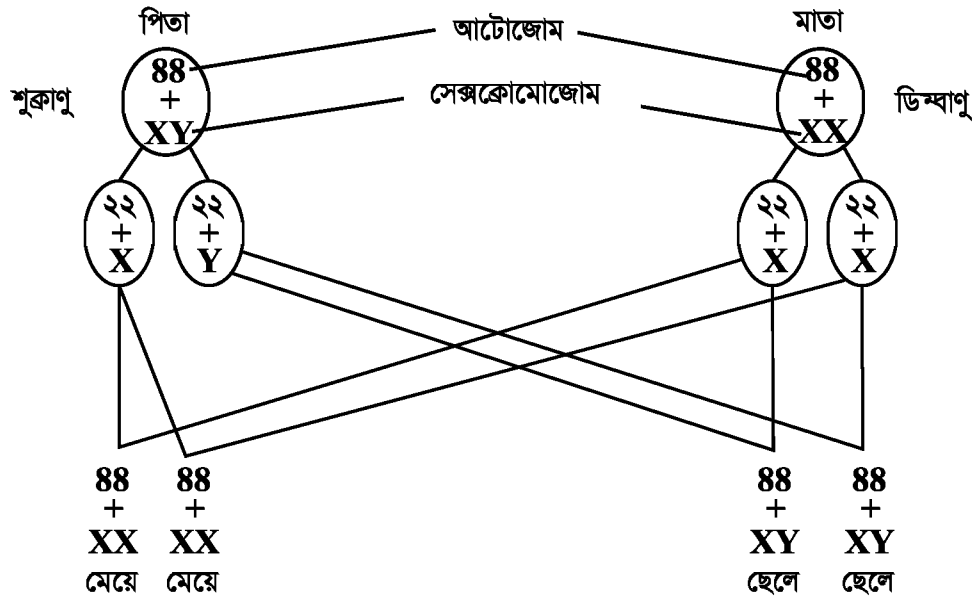

চিত্র ১২.৪ : মানুষের লিঙ্গ নির্ধারন

কাজ: সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে নিচের ছক পূরণের মাধ্যমে তা নির্ণয় কর।				
♀ মা ♂ বাবা	X	Y	X	Y
X	XX মেয়ে			XY ছেলে
X				
X				
X				

জেনেটিক ডিসঅর্ডার বা বংশগতি ব্যাধি/অস্বাভাবিকতা

কালার ব্লাইন্ড বা বর্ণান্ধতা

কালার ব্লাইন্ড বা বর্ণান্ধতা এমন এক অবস্থা যখন কেউ কোনো রঙ সঠিকভাবে চিনতে পারে না। রঙ চিনতে আমাদের চোখের স্নায়ু কোষে রঙ সনাক্তকারী পিগমেন্ট থাকে। কালার ব্লাইন্ড অবস্থায় রোগীদের চোখে স্নায়ু কোষের রঙ সনাক্তকারী পিগমেন্টের অভাব থাকে। যদি কারো একটি পিগমেন্ট না থাকে তখন সে লাল আর সবুজ পার্থক্য করতে পারে না। এটা সর্বজনীন কালার ব্লাইন্ড সমস্যা। একাধিক পিগমেন্ট না থাকার কারণে লাল ও সবুজ রঙ ছাড়াও রোগী নীল ও হলুদ রঙ পার্থক্য করতে পারে না। সাধারণত প্রতি ১০ জনে ১ জন পুরুষ কালার ব্লাইন্ড হতে দেখা যায়। তবে খুব কম মহিলারাই এই অসুখে ভোগেন।

বংশগতি ছাড়াও কোনো কোনো ঔষধ যেমন– বাত রোগের জন্য হাইড্রক্সি–ক্লোরোকুইনিন সেবনে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে চোখের রঞ্জিন পিগমেন্ট নষ্ট হয়ে রোগী কালার ব্লাইন্ড হতে পারে। এই ধরনের অসুখ নির্ণয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া শ্রেয়।

থ্যালাসেমিয়া

থ্যালাসেমিয়া রক্তের লোহিত রক্ত কণিকার এক অস্বাভাবিক অবস্থাজনিত রোগের নাম। এই রোগে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো নষ্ট হয়। ফলে রোগী রক্ত শূন্যতায় ভোগে। এই রোগ বংশ পরম্পরায় হয়ে থাকে। থ্যালাসেমিয়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বংশবাহিত রক্তজনিত সমস্যা। ধারণা করা হয় দেশে প্রতিবছর ৭০০০ শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে এবং বর্তমানে প্রায় এক লাখ রোগী আছে।

লোহিত রক্তকোষ দুধরনের প্রোটিন দ্বারা তৈরি, α–গ্লোবিউলিন এবং β– গ্লোবিউলিন। থ্যালাসেমিয়া হয় লোহিত রক্ত কোষে এ দুটি প্রোটিনের জিন নষ্টের কারণে। ফলে ত্রুটিপূর্ণ লোহিত রক্তকোষ উৎপাদিত হয়। দুধরনের থ্যালাসেমিয়া দেখা যায়। আলফা (α) থ্যালাসেমিয়া রোগ তখনই হয় যখন α– গ্লোবিউলিন তৈরির জিন অনুপস্থিত থাকে কিংবা পরিবর্তিত হয়। এই ধরনের রোগ দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, চীন ও আফ্রিকার জনগনের মাঝে বেশি দেখা যায়। অণুরূপভাবে বিটা (β) থ্যালাসেমিয়া তখনই হয় যখন β– গ্লোবিউলিন প্রোটিন উৎপাদনে ব্যাহত হয়। এ ধরনের রোগ ভূ–মধ্যসাগরীয় এলাকাবাসীদের মাঝে বেশি দেখা গেলেও কিছু পরিমাণ আফ্রিকান, আমেরিকান, চীন ও এশিয়াবাসীদের মধ্যেও দেখা যায়।

বিটা থ্যালাসেমিয়াকে 'কুলির থ্যালাসেমিয়া'ও বলা হয়। জীনের প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে থ্যালাসেমিয়াকে দুভাবে দেখা হয়। থ্যালাসেমিয়া মেজরের ক্ষেত্রে শিশু তার বাবা ও মা উভয় থেকে থ্যালাসেমিয়া জিন পেয়ে থাকে। থ্যালাসেমিয়া মাইনরের ক্ষেত্রে শিশু থ্যালাসেমিয়া জিন তার বাবা অথবা তার মায়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এ ধরনের শিশুরা থ্যালাসেমিয়ার কোনো উপসর্গ দেখায় না তবে থ্যালাসেমিয়া জিনের বাহক হিসেবে কাজ করে।

লক্ষণ:

তীব্র থ্যালাসেমিয়ার কারণে জন্মের পূর্বেই মায়ের পেটে শিশুর মৃত্যু হতে পারে। থ্যালাসেমিয়া মেজর আক্রান্ত শিশুরা জন্মের পর প্রথম বছরেই জটিল রক্তশূন্যতা রোগে ভোগে।

চিকিৎসা:

সাধারণত নির্দিষ্ট সময় পর পর রক্ত প্রদান ও নির্দিষ্ট ঔষধ খাইয়ে থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা দেয়া হয়। রোগীদের লৌহ সমৃদ্ধ ফল বা ঔষধ খেতে হয় না, কারণ তা শরীরে জমে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে। থ্যালাসেমিয়া মেজর রোগীদের ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। এছাড়া যকৃৎ নষ্ট হলে অন্যান্য অসুখ এবং জন্ডিস দেখা দেয়।

জৈব বিবর্তন তত্ত্ব

এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে মহাবিশ্বে জীবনের স্পন্দন শুধুমাত্র এই পৃথিবীতেই দেখা যায়। পৃথিবীতে বর্তমানে যত জীব রয়েছে তারা বিভিন্ন সময়ে এই ভূমন্ডলে আবির্ভূত হয়েছে। আবার অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী সময়ের আবর্তে লুপ্ত হয়ে গেছে। ডাইনোসর আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। আবার কোনো কোনো জীব ধীর পরিবর্তন ঘটিয়ে এখনও টিকে আছে। কয়েক হাজার বছর সময়ের ব্যাপকতায় জীব প্রজাতির পৃথিবীতে আবির্ভাব ও টিকে থাকার জন্যে যে পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রক্রিয়া তাকে জৈব বিবর্তন (Organic evolution) বলে।

চার্লস রবার্ট ডারউইন একজন ইংরেজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী ছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৮৩১ সালে তিনি এইচ. এম. এস. বিগল (H. M.S. Beagle) জাহাজের একজন প্রকৃতিবিদ হিসেবে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং জাহাজে বিশ্বের অনেক স্থান ভ্রমণ করেন। তিনি আটলান্টিক মহসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ, তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস, মালদ্বীপ, ব্রাজিল ও গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে প্রায় পাঁচ বছর ধরে পরিভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করেন।

পরবর্তীতে টমাস ম্যালথাস (১৭৬৬–১৮৩৪)–এর জনসংখ্যা তত্ত্ব পাঠ করে ডারউইন প্রাণীকূলের প্রকৃতিতে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার উপর চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। ম্যালথাস মনে করতেন পৃথিবীতে মানব জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি অসুস্থতা ও সীমিত খাদ্য সরবরাহের কারণে ব্যাহত হয়। ব্রুনাই বসবাসরত প্রকৃতিবিদ আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাণী–জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণতত্ত্বে তাঁর মতামতগুলো ডারউইনকে ১৮৫৮ সালে লিখে পাঠান যা ডারউইনকে তাঁর নিজের মতবাদসমূহ প্রস্তাব করতে অনুপ্রেরণা দেয়। পরে ১৮৫৮ সালে ১ জুলাই লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাণী–জনসংখ্যার পরিবর্তনের উপর ওয়ালেস ও তার নিজের অভিমতগুলি পেশ করে ডারউইন আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১৮৫৯ সালে তার *The Origin of Species by Means of Natural Selection* বইটি প্রকাশিত হয়। বইটির ১২০০ কপির সবগুলি প্রথম দিনেই বিক্রি হয়ে যায়।

ডারউইন ও ওয়ালেসের বিবর্তনতত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিচে উল্লেখ করা হলো:

জীবজগতে ভিন্নতা (Variation) : ডারউইন লক্ষ করেছিলেন যে, পৃথিবীতে দুটি প্রাণী বা প্রাণীগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে এক রকম নয়। একই প্রজাতির মধ্যে এমনকি একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। ডারউইনের মতে অবিরাম সংগ্রামের ফলে, নিজকে রক্ষার জন্যে নানা রকম শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে জীবে জীবে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। নিচে কুকুর প্রজাতির মাঝে ভিন্নতা দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১২.৫: কুকুর প্রজাতির ভিন্নতা

জীবের অত্যধিক প্রজননের প্রবণতা : প্রকৃতিতে প্রতিটি জীবের প্রজনন ক্ষমতা, জন্মহার ও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার সংখ্যা পার্থক্য রয়েছে। প্রজন্মকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এটি জীবের সহজাত ক্ষমতা। এর ফলে বেঁচে থাকা প্রাণী অপেক্ষা প্রজননকৃত প্রাণীর সংখ্যা বহুগুণ বেশি হয়। একটি কাতলা মাছ চট্টগ্রামের হালদা নদীতে এক ঋতুতে প্রায় ৩ থেকে ৫ লক্ষ ডিম দিয়ে থাকে। অনুকূল পরিবেশে এখান থেকে জন্ম নেয়া পোনার মাত্র কয়েক হাজার মাছ বেঁচে থেকে বড় হবার সুযোগ পেয়ে থাকে। তেমনি প্রাপ্ত বয়স্ক একটি ইলিশ মাছ মেঘনা নদীর অববাহিকায় আকার ভেদে প্রায় ৩.০ থেকে ১০ লক্ষ পর্যন্ত ডিম ছেড়ে থাকে। ধারণা করা হয়, অনুকূল পরিবেশে খুব অল্প সংখ্যক জাটকা শেষ পর্যন্ত বেঁচে থেকে বড় ইলিশ হতে পারে। মেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে হাতির প্রজনন সবচেয়ে ধীর গতিতে হয়। ডারউইন হিসাব করে দেখান যে এক জোড়া হাতি থেকে জন্ম নেওয়া সব হাতি যদি বেঁচে থাকে, আর তারা যদি সবাই প্রজননক্ষম হয় তাহলে ৭৫০ বছরে হাতির সংখ্যা হবে ১৯ লক্ষ। কিন্তু প্রকৃতিতে তা দেখা যায় না। উদাহরণগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, যদি কোনো প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি অনিয়ন্ত্রিত ভাবে অব্যাহত থাকত, তবে যেকোনো একটি প্রজাতি কয়েক বছরে সারা পৃথিবী ভরে ফেলত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় না। মানবসৃষ্ট কারণে যেমন, অতিরিক্ত আহরণ, পরিবেশ দূষন ইত্যাদি প্রকৃতিতে নানাভাবে জনসংখ্যা (Population) নিয়ন্ত্রণ করে। ধারণা করা যায় প্রকৃতিতে রুই পোনা বা জাটকা নিধন না হলে, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে আমাদের নদনদীতে রুই, কাতলা বা ইলিশ মাছের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যেতে পারত।

জীবের বাঁচার সংগ্রাম (Struggle for existance) : ডারউইন যুক্তি উত্থাপন করেন যে, যেহেতু প্রতিটি প্রাণী অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি পরিমাণে সন্তান জন্ম দেয়, সেহেতু বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীর মধ্যে সংগ্রাম অবধারিত। আর এই সংগ্রাম মূলতঃ খাদ্য, বাসস্থান ও প্রজনন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে। জীবের টিকে থাকার ব্যাপারে নিচের বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচ্য:

১. প্রতিটি প্রাণীর জন্যে খাদ্য ও বসবাসযোগ্য স্থান সীমিত। এর ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার বহু প্রাণী খ্যাদ্যাভাবে অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। দেখা গেছে কোনো দ্বীপাঞ্চলে হরিণ ছাড়া হলে ওরা বড় হয়, বংশ বৃদ্ধি করে ও সংখ্যায় দ্রুত বেড়ে যায়। পরে অতিরিক্ত হরিণ গাছের পাতা বা ঘাস খেয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে অনাহারে তাদের মড়ক দেখা দেয় এবং হরিণ সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।

২. পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণী জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে আন্তঃপ্রজাতিক প্রতিযোগিতা যেমন, রুইমাছ–রুইমাছে, বিড়াল–বিড়ালে কিংবা বানর–বানরে সংগ্রাম অথবা ভিন্ন দুটি প্রজাতির মধ্যে অর্থাৎ আন্তঃপ্রজাতিক প্রতিযোগিতা যেমন সাপ–বেজী, প্রজাপতি–মৌমাছি ইত্যাদি পারস্পরিক সংগ্রামে লিপ্ত।

৩. প্রতিটি প্রাণী প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করছে। বন্যা, খরা, ঝড়, বৃষ্টি, অত্যধিক গরম, শীত, আগ্নেয়গিরি, সুনামি, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি একটি পরিবেশের জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহু জীবের জীবন ধ্বংস হয়। সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) : ডারউইনের মতে জীবন–সংগ্রামে সেই সব প্রাণী সাফল্য লাভ করে যাদের শারীরিক গঠন প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়। তারা পরিবর্তনশীলতায় দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অভিযোজিতগুণগুলো বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে বেঁচে থাকার বা বিবর্তনের প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। অন্যদিকে যারা এ ধরনের পরিবর্তনশীলতায় অংশগ্রহণ করতে পারে না তারা প্রকৃতি কর্তৃক মনোনীত হয় না। ফলে তাদের বিলুপ্তি ঘটে। প্রাচীনকালের প্রাণী ডাইনোসর বলিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠভাবে অভিযোজিত না হতে পারায় বিলুপ্ত হয়েছে।

যোগ্যতমের টিকে থাকা (Survival of the fittest) : যে বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও প্রবৃত্তি জীব বা তার বংশধরকে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে তোলে, সেসব অনুকূল বৈচিত্র্যের অধিকারী হয়। এই গুণাবলী বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, প্রতিকূল বৈচিত্র্য সম্পন্ন জীব, জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়ে কালক্রমে ধ্বংস হয়। ডারউইন জীবজগতে এ ধরনের অভিযোজনকে প্রকৃতিতে বাঁচার সংগ্রামে টিকে থাকার প্রধান অবলম্বন বলে মনে করেছেন। প্রকৃতিতে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী এমন কিছু অভিযোজনের অধিকারী হয়, যা তাদের বেঁচে থাকার জন্য বিশেষ সহায়ক। মরুভূমিতে অনেক গাছের পানি সংরক্ষন করার কৌশল, প্রাণীর আত্মরক্ষায় ছদ্মবেশ (Mimicry) কিংবা অনুকৃতির আশ্রয় নেয়। এই অভিযোজনগুলি অভিব্যক্তির উল্লেখযোগ্য উপাদান।

প্রজাতির টিকে থাকায় বিবর্তনের গুরুত্ব

বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভবকালে দেখা যায় অনেক প্রজাতি কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে ডাইনোসরের কথা বলা যায়। দেখা গেছে যে সময়ের সাথে যে প্রজাতিটির টিকে থাকার ক্ষমতা যত বেশি সে বিবর্তনের আবর্তে তত বেশিদিন টিকে থাকতে পারে। অর্থাৎ যে পরিবেশ, জীবন প্রবাহ ও জনমিতির মানদন্ডে বিবর্তনে যে যত বেশি খাপ খাওয়াতে পারবে সেই প্রজাতিটি টিকে থাকবে। এটিকে অনেক ক্ষেত্রে অভিযোজন বলা হয়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. RNA কী?

২. জিন কী?

৩. ক্রোমোসোম কে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয় কেন?

৪. অটোসেম কী?

৫. থ্যালাসেমিয়া বলতে কী বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। DNA অনুলিপন কীভাবে হয় চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইউরাসিল কোথায় পাওয়া যায়?

ক. ডি. এন. এ খ. আর. এন. এ

গ. জিন ঘ. লোকাস

২. আর. এন. এ তে থাকে–

i. রাইবোজ শর্করা

ii. অজৈব ফসফেট

iii. নাইট্রোজেন ঘটিত বেস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

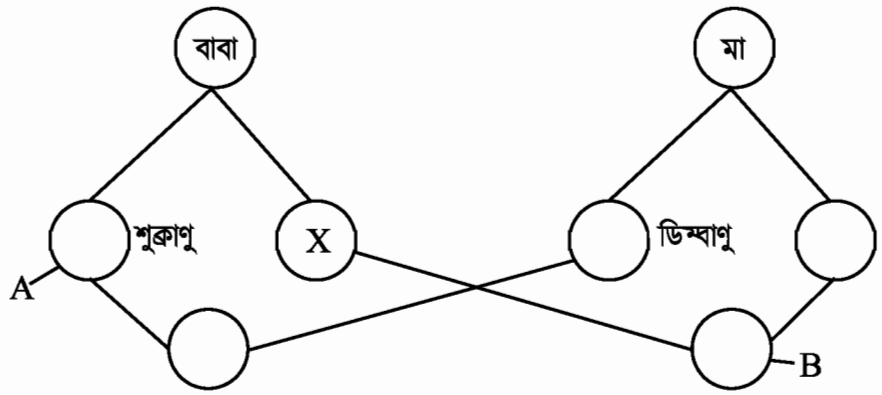

৩. উদ্দীপকে X অবস্থায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা কয়টি থাকে?

ক. ৪৬টি খ. ৪৪টি

গ. ২৩টি ঘ. ২২টি

৪. উদ্দীপকের A এবং B তে কোন ধরনের লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম আছে।

ক. X XY খ. X XX

গ. Y XX ঘ. Y XY

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সিফাত একজন কৃষক। তার দুইটি কন্যা সন্তান রয়েছে। বড় কন্যাটি দেখতে হুবহু বাবার মতো এবং ছোট কন্যাটির চুল, গায়ের রং বাবার মতো হলেও দেখতে মায়ের মতো। সম্প্রতি তার আরও একটি কন্যা সন্তান হওয়াতে সে তার স্ত্রীর উপর ভীষন ক্ষুব্ধ। গ্রামের স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে সে জানতে পারে কন্যা সন্তান জন্মের জন্য সিফাতই দায়ী।

ক. বংশগতি বিদ্যা কী?

খ. অনুলিপণ বলতে কী বুঝায়?

গ. সিফাতের সন্তানদের ক্ষেত্রে এরূপ ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সিফাতের ক্ষুব্ধ হওয়াটা অযৌক্তিক কেন? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

২. সোহেল টেলিভিশনের একটি চ্যানেলে দেখতে পেল যে, ব্রাজিলের একটি শহরে পোষা বিড়ালের মেলা হচ্ছে। সে দেখল, একই প্রজাতি হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন বিড়ালের আকার, রং, বর্ণ ভিন্ন। পরবর্তীতে একদিন সে দেখে, বন্য পরিবেশে বিড়ালের বেড়ে উঠার চিত্র। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তার বাবা তাকে বিবর্তন ও অভিযোজন সম্পর্কে ধারণা দেন।

ক. লোকাস কী?

খ. অভিযোজন বলতে কী বুঝায়?

গ. সোহেলের দেখা প্রাণীগুলোর ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের প্রথম পরিবেশের প্রাণীকে যদি দ্বিতীয় পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে কী ঘটবে বিশ্লেষণ কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জীবের পরিবেশ

জীবের চারপাশের জড় ও জীবজ সমুদয় বস্তু নিয়েই জীবের পরিবেশ গঠিত হয়। আলো, হাওয়া, ঝড়–বৃষ্টি, মাটি, পানি যেমন একটি জীবের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তাকে ঘিরে যে জীব জগৎ তার প্রভাবও ঐ জীবের জীবনে অবশ্যই থাকে। একটি জীবের জীবন ধারণের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব পদক্ষেপগুলো নিতে হয় তা অবশ্যই একই পরিবেশে বসবাসকারী অন্য জীবের জীবনাচারে প্রভাব ফেলে। জীব জগতে খাদ্য শিকল ও খাদ্য জাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাকে বাদ দিয়ে জীবের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না।

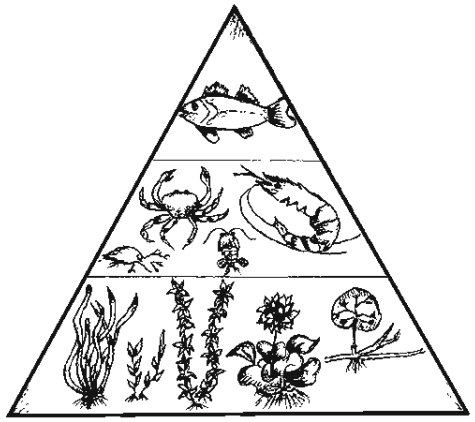

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বাস্তুতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- খাদ্য শিকল ও খাদ্য জাল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ ও পুষ্টি উপাদানের সম্পর্ক তুলনা করতে পারব।
- ট্রফিক লেভেলের মধ্যে শক্তির সম্পর্ক তুলনা করতে পারব।
- শক্তি পিরামিডের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য শিকল সীমিত রাখতে শক্তি পিরামিডের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীব বৈচিত্র্য এবং জীব বৈচিত্র্যের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিভিন্ন জীবের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃনির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- একটি নির্বাচিত এলাকার উৎপাদক, খাদক, বিয়োজক এবং পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।
- একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের উপাদানসমূহ দূষিত হওয়ার কারণ নির্ণয় করতে পারব।
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ, খাদ্য শিকল, খাদ্য জালের প্রবাহচিত্র অংকন করতে সক্ষম হব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের উপাদানের অবদান উপলব্ধি করতে পারব এবং এর সংরক্ষণে সচেতন হব।

বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

পৃথিবীর সব জীব, জড় এবং ভৌত অবস্থা সব মিলেই আমাদের পরিবেশ। জীব সক্রিয়ভাবে জড়জগৎ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং বর্জ্য পদার্থ হিসেবে বা মৃত্যুর পর পরিবেশে মিশে গিয়ে সে সব গৃহীত উপাদান আবার জড় পরিবেশেই ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ বায়ু থেকে কার্বন ডাই–অক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রধান খাদ্য কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) তৈরির সময় অক্সিজেন ত্যাগ করে। পুরো জীবজগৎ (উদ্ভিদ ও প্রাণী)–এর শ্বসনের জন্য যতটুকু অক্সিজেন প্রয়োজন তার একটি বড় অংশ আসে ঐ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া থেকে। সবুজ– অসবুজ উভয় প্রকার উদ্ভিদ মাটি বা পানি থেকে কিছু খনিজলবণও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তৃণভোজী প্রাণীরা নানাভাবে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ খেয়ে বাঁচে। বিভিন্ন স্তরের মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজী বা অন্যান্য ক্ষুদ্রতর মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সকল প্রাণীর বর্জ্যপদার্থ পরিবেশেই মিশে যায়। তাছাড়া মৃত্যুর পর উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ পচনক্রিয়ার মাধ্যমে আবার পরিবেশেই ফিরে যায়। এই পচানোর কাজটি করে ব্যাকটেরিয়াসহ কিছু অণুজীব। এভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য প্রাকৃতিক নিয়মেই বজায় থাকে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং উভয় প্রকার জীব ও জড় পদার্থের মধ্যে শক্তি ও বস্তুর এই আদান প্রদানকে বলা হয় মিথস্ক্রিয়া, আর এরূপ মিথস্ক্রিয়ায় আন্তঃসম্পর্ক ঘটে, পৃথিবীর এমন যেকোনো অঞ্চলই হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)। সুতরাং বাস্তুতন্ত্র বলতে ভূপৃষ্ঠের এমন কোনো একককে বোঝায় যেখানে জড়, খাদ্য উৎপাদনকারী সবুজ উদ্ভিদ, খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল কিছু প্রাণী এবং মৃত জীবদেহ পরিবেশে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য অণুজীব আছে এবং এসব উপাদানের মধ্যে যথাযথ আন্তঃসম্পর্ক বর্তমান। জীবজগতের পুষ্টি ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদানের উৎস হিসেবে মাটি, পানি ও বায়ুর প্রয়োজন হয় ।

বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ : জীব সম্প্রদায়, পরিবেশের জড় পদার্থ এবং ভৌত পরিবেশ মিলেই কোনো স্থানের বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠে। এই তিনটি প্রধান উপাদানের প্রত্যেকটিতে রয়েছে আবার অনেক ধরনের ছোট ছোট উপাদান। জীব উপাদানগুলো সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়।

(ক) জড় উপাদান (Nonliving matters) : পরিবেশের জড় পদার্থগুলো জীব উপাদানের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে, শ্বসনের জন্য অক্সিজেন যোগায় এবং বেশ কিছু পুষ্টি উপাদানও সরবরাহ করে। বাস্তুতন্ত্রের সকল জড় উপাদানকে আবার অজৈব এবং জৈব দুভাগে ভাগ করা যায়।

(১) অজৈব বস্তু (Inorganic matters) : পানি, বায়ু এবং মাটিতে অবস্থিত খনিজ পদার্থ অর্থাৎ যেসব পদার্থ কোনো জীবদেহ থেকে আসেনি, বরং জীবের উদ্ভবের আগেই পরিবেশে ছিল সেগুলো বাস্তুতন্ত্রের অজৈব উপাদান যেমন– ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, লৌহ, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই–অক্সাইড ইত্যাদি।

(২) জৈব বস্তু (Organic matters) : উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ বা এসব জীবের মৃতদেহ থেকে যেসব জড় বস্তু বাস্তুতন্ত্রে যোগ হয় তাদের বলা হয় জৈব উপাদান। এগুলো সচরাচর হিউমাস নামে পরিচিত। হিউমাসের উপাদানের মধ্যে আছে ইউরিয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন কোষ, টিস্যু, অঙ্গ ইত্যাদি। জৈব বস্তু উদ্ভিদের জন্য বেশি পুষ্টিকর। তাই উদ্ভিদ চাষে বেশি করে জৈব সার দিতে হয়। বহু প্রাণীও হিউমাসসমৃদ্ধ মাটি বেশি পছন্দ করে।

(খ) ভৌত উপাদান (Physical components) : পরিবেশে সূর্যালোকের পরিমাণ, তাপমাত্রা, বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, বায়ুর চাপ ও বায়ুপ্রবাহ, ভূপৃষ্ঠ থেকে গভীরতা (মাটির নিচে বা পানির নিচে) এবং উচ্চতা ইত্যাদি বহু উপাদান বাস্তুতন্ত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এসব উপাদান মিলে গড়ে ওঠে কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ু। এসবই কোনো বাস্তুতন্ত্রের ভৌত উপাদান।

(গ) জীবজ উপাদান (Living components) : জীবকুল বাস্তুতন্ত্রের সক্রিয় উপাদান। এরাই তাদের কাজের মাধ্যমে পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন আনে। পরিবেশের জীব উপাদানগুলো প্রধানত তিন প্রকার। যথা: (১) উৎপাদক, (২) খাদক ও (৩) বিয়োজক।

(১) উৎপাদক (Producer) : সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বায়ু থেকে কার্বন ডাই–অক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রধান খাদ্য কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) তৈরি করে। এ সময় উপজাত হিসেবে অক্সিজেন ত্যাগ করে। পুরো প্রাণীজগৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের প্রধান খাদ্য শর্করার জন্য এই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এমনকি অসবুজ উদ্ভিদও কোনো না কোনোভাবে তাদের জীবনধারনের জন্য সবুজ উদ্ভিদের উপরই নির্ভরশীল। তাই সালোকসংশ্লেষণ হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদন প্রক্রিয়া। আর উৎপাদক হলো সবুজ উদ্ভিদকুল। এই উৎপাদক উদ্ভিদগুলোকে অন্য কথায় বলা হয় স্বভোজী (Autotroph)। কারণ তারা নিজের খাবার নিজেই তৈরি করতে পারে, অন্য কোনো জীবের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হয় না।

(২) খাদক (Consumer) : কোনো প্রাণীই পরিবেশের জড় পদার্থ থেকে খাদ্য তৈরি করতে পারে না। তারা খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। তাই এদের বলা হয় পরভোজী জীব। যেসব প্রাণী সরাসরি উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে তাদেরকে বলা হয় তৃণভোজী প্রাণী। এদের অপর নাম প্রথম শ্রেণির খাদক। ঘাস ফড়িং, মুরগি, গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি প্রথম শ্রেণির খাদক।

যেসব প্রাণী তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদের বলা হয় গৌণ খাদক বা দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক। এরা এক ধরনের মাংসাশী প্রাণী। ব্যাঙ, শিয়াল, বাঘ ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক।

যেসব প্রাণী গৌণ খাদকদের খেয়ে বাঁচে তারাও মাংসাশী প্রাণী। এদের বলা যায় তৃতীয় শ্রেণির বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খাদক। সাপ, ময়ুর, বাঘ ইত্যাদি এই শ্রেণির খাদক।একটি বিশেষ শ্রেণির খাদক জীবন্ত প্রাণীর চেয়ে মৃত প্রাণীর মাংস বা আবর্জনা খেতে বেশি পছন্দ করে। যেমন– শকুন, শিয়াল, হায়েনা ইত্যাদি। এদের নাম দেওয়া হয়েছে আবর্জনাভুক বা ধাঙর (Scavenger)। কারণ এরা মৃতদেহ বা আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিষ্কার রাখে।

(৩) বিয়োজক (Decomposer) : ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি অতিক্ষুদ্র জীব বা অণুজীব উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ এবং মৃতদেহ থেকে তাদের খাদ্য গ্রহণ করে এবং পরিণামে এসব বর্জ্য বিয়োজিত হয়ে মাটি বা পানির সাথে মিশে যায়। এই মিশে যাওয়া উপাদান তখন উদ্ভিদের পক্ষে আবার খাদ্য উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তাই এই অণুজীবগুলোকে বলা হয় বিয়োজক বা পরিবর্তক।

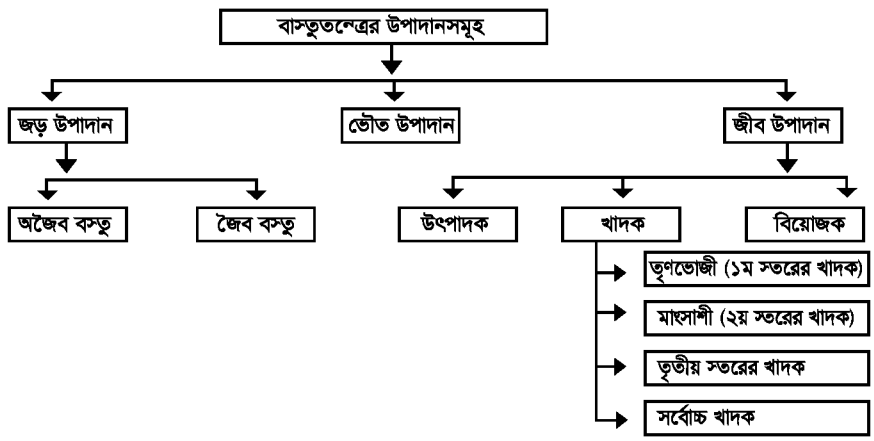

চিত্র ১৩.১ : বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ (ছক আকারে)

পুকুরের বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem of a pond) : জলভাগের বাস্তুতন্ত্র কাছে থেকে ভালো করে দেখার জন্য সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে পুকুর। পুকুরে বসবাসরত জীব ও জড় পদার্থের নিবিড় সম্পর্ক ভালোভাবে বোঝা যায়। জড় উপাদানগুলো হলো বিভিন্ন প্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থ, পানি, সূর্যালোক, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ইত্যাদি। সজীব উপাদানগুলোর মধ্যে আছে উৎপাদক, প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক, তৃতীয় স্তরের খাদক ও বিভিন্ন রকম বিয়োজক।

উৎপাদক : উৎপাদক হচ্ছে সালোকসংশ্লেষণকারী বিভিন্ন প্রকার শৈবাল ও অগভীর পানির উদ্ভিদ। পানিতে ভাসমান ক্ষুদ্র জীবদের প্ল্যাংকটন বলে। ফাইটোপ্লাংকটন বা উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন, সবুজ জলজ শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে তাই এদের উৎপাদক বলে।

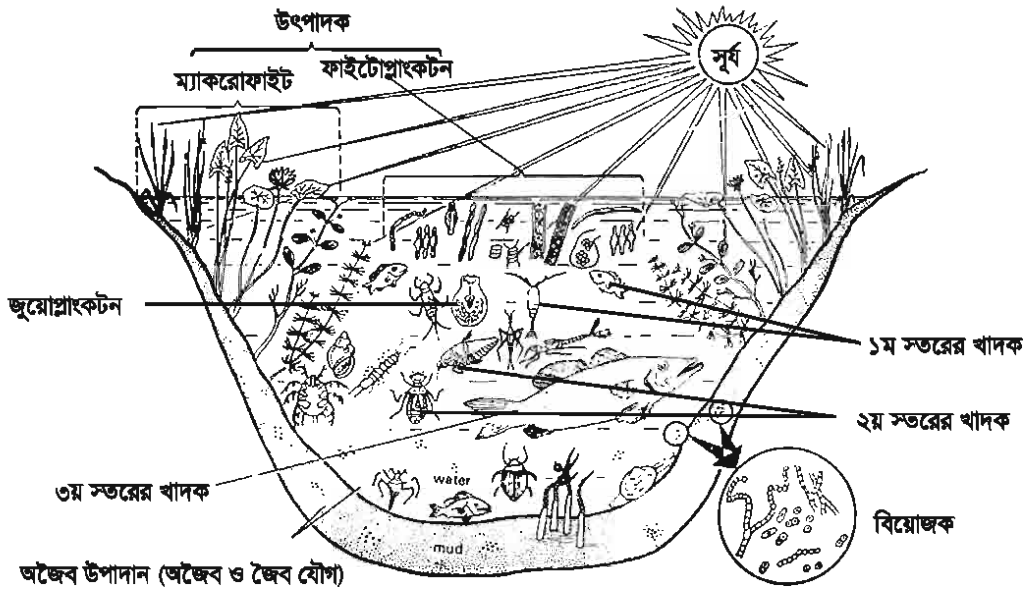

চিত্র ১৩.১ : একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র

প্রথম স্তরের খাদক : নানা ধরনের ভাসমান ক্ষুদে পোকা, মশার শূককীট, অতিক্ষুদ্র প্রাণী, জুয়োপ্ল্যাংকটন প্রভৃতি প্রথম স্তরের খাদক। ভাসমান ক্ষুদ্র প্রাণীদের জুয়োপ্ল্যাংকটন বলে। এ খাদকগুলো নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না তাই সরাসরি উৎপাদককে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে।

দ্বিতীয় স্তরের খাদক : ছোট মাছ, কিছু জলজ পতঙ্গ, ব্যাঙ প্রভৃতি দ্বিতীয় স্তরের খাদক। এরা নিজে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না এবং উৎপাদককেও খাদ্য হিসেবে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। এরা প্রথম স্তরের খাদকদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

তৃতীয় স্তরের খাদক: কোনো কোনো ছোট মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি দ্বিতীয় স্তরের খাদককে ভক্ষণ করে তাদের তৃতীয় স্তরের খাদক বলে। শোল, বোয়াল, ভেটকি প্রভৃতি বড় মাছ, বক ইত্যাদি হচ্ছে তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ খাদক।

বিয়োজক: পুকুরের পানিতে বহু ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া মৃতজীবী হিসেবে বাস করে, এদের বিয়োজক বলে। এরা পানিতে ভাসমান বা পানির তলায় কাদার মধ্যে বাস করে। এরা জীবিত বা মৃত প্রাণীদের আক্রমণ করে ও পচনে সাহায্য করে, ফলে উৎপাদকের ব্যবহার উপযোগী জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থ পুনরায় সৃষ্টি হয়। এসব বিয়োজিত উপাদানগুলো আবার পুকুরের উৎপাদক শ্রেণির জীব ব্যবহার করে।

খাদ্য শিকল (Food chain) : যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদানগুলোর মধ্যে প্রথম কাজে নামে উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদ। তারা খাদ্য তৈরি না করলে তৃণভোজী প্রাণী ও মাংসাশী প্রাণীরা খাদ্য সঙ্কটে পড়ে মারা যেতে পারে।যখন খাদ্য শক্তি উৎপাদক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের খাদকদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন সেই প্রবাহকে এক সাথে খাদ্য শিকল বলা হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মাঠের সবুজ ঘাস উৎপাদক, ঘাস ফড়িং সে ঘাসের অংশবিশেষ খেয়ে বাঁচে। ব্যাঙ ঐ ঘাস ফড়িংকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, আর সাপ সে ব্যাঙকে আস্ত গিলে খায়। যদি মনে করা হয় সাপটি আকারে ছোট এবং আশেপাশে বেশ বড় একটি গুঁইসাপ আছে। তাহলে সুযোগ পেলে ঐ গুঁইসাপ সাপটিকে আবার গিলে খাবে। সেক্ষেত্রে খাদ্যশৃঙ্খলটিকে নিচের মতো করে লেখা যাবে:

ঘাস	ফড়িং	ব্যাঙ	সাপ	গুঁইসাপ
উৎপাদক	প্রথম স্তরের খাদক	দ্বিতীয় স্তরের খাদক	তৃতীয় স্তরের খাদক	সর্বোচ্চ স্তরের খাদক

বিভিন্ন প্রকার বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য শিকল বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা: (১) শিকারজীবী খাদ্য শিকল, (২) পরজীবী খাদ্য শিকল, (৩) মৃতজীবী খাদ্য শিকল ।

(১) **শিকারজীবী খাদ্য শিকল (Predator food chain)** : যে খাদ্য শিকলে প্রথম স্তরের খাদক আকারে সবচেয়ে ছোট থাকে এবং পর্যায়ক্রমে উপরের খাদকেরা নিচের স্তরের খাদকগুলো শিকার ধরে খেয়ে একেবারে শেষ করে দেয় সেরূপ শিকলকে বলা হয় শিকারজীবী খাদ্য শিকল। উপরে বর্ণিত খাদ্য শিকলটি একটি শিকারজীবী খাদ্য শিকল।

(২) **পরজীবী খাদ্য শিকল (Parasitic food chain)** : পরজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের চেয়ে বড় আকারের পোষকদেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি পরজীবীর উপর আরেক ধরনের ক্ষুদ্রতর পরজীবী তার খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল হয়। এ ক্ষেত্রে খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথম ধাপে সবসময় সবুজ উদ্ভিদ নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে শিকলটি থাকে অসম্পূর্ণ, যেমন–

মানুষ ⟶ মশা ⟶ ডেঙ্গুভাইরাস।

(৩) **মৃতজীবী খাদ্য শিকল (Saprophytic food chain)** : জীবের মৃতদেহ থেকে শুরু হয়ে যদি কোনো খাদ্যশৃঙ্খল একাধিক খাদ্যস্তরে বিন্যস্ত হয় তবে সেরূপ শিকলকে বলা হয় মৃতজীবী খাদ্য শিকল। যেমন–

মৃতদেহ ⟶ ছত্রাক ⟶ কেঁচো।

বলাবাহুল্য এই খাদ্য শিকল অবশ্যই অসম্পূর্ণ এবং এরূপ শিকল বাস্তুতন্ত্রের যাবতীয় মিথস্ক্রিয়া বা আন্তঃসম্পর্কের অংশমাত্র তৈরি করে। পরজীবী ও মৃতজীবী খাদ্য শিকল সব সময়ই অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ এখানে কোনো উৎপাদক নেই। এই উভয় প্রকার খাদ্য শিকল তাদের কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য শিকারজীবী খাদ্য শিকলের প্রথম এক বা একাধিক স্তরের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শিকল উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

খাদ্য জাল (Food web)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শিকলে একই খাদক বিভিন্ন স্তরে স্থান পেতে পারে। এভাবে বেশ কয়েকটি খাদ্য শিকল একত্রিত হয়ে একটি জালের মতো গঠন তৈরি করে। একে খাদ্য জাল বলে। স্থলজ ও জলজ উভয় পরিবেশের জন্য এই ঘটনা সত্য। পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের নিচের উদাহরণটি থেকে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে–

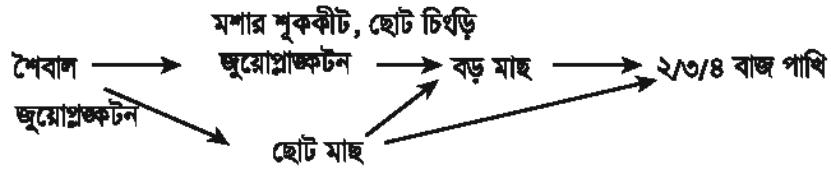

চিত্র :১৩.৩ খাদ্যজাল

উপরের চিত্রে দেখা যায় উৎপাদক শৈবাল জুয়োপ্লাঙ্কটন এবং ছোট মাছকে সরাসরি খাদ্য সরবরাহ করে। জুয়োপ্লাঙ্কটনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে ছোট এবং বড়মাছ উভয়ই। বড়মাছ আবার ছোটমাছকে খায়। বাজ পাখি ছোট মাছ এবং বড় মাছের একই প্রজাতির একটু ছোট সদস্যদের সহজেই খেতে পারে। এখানে পাঁচটি জীব বিভিন্নভাবে বেশ কয়েকটি খাদ্য শিকল তৈরি করে। এভাবে যে খাদ্যজাল তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র এর চেয়েও জটিল খাদ্যজাল তৈরি হতে পারে।

উপরের খাদ্যজালে মোট চারটি খাদ্য শিকল পাওয়া যায়।

১. শৈবাল ⟶ ছোট মাছ ⟶ বাজ পাখি।

২. শৈবাল ⟶ জুয়োপ্লাঙ্কটন ⟶ বড় মাছ ⟶ বাজ পাখি।

৩. শৈবাল ⟶ ছোট মাছ ⟶ বড় মাছ ⟶ বাজ পাখি।

৪. শৈবাল ⟶ জুয়োপ্লাঙ্কটন ⟶ ছোট মাছ ⟶ বড় মাছ ⟶ বাজ পাখি।

বনভূমির বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য জাল হতে পারে নিম্নরূপ:

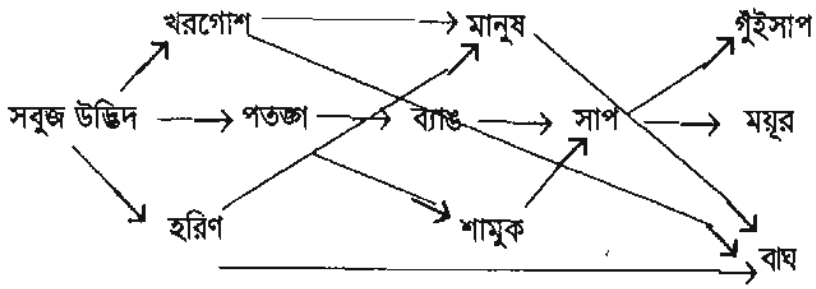

চিত্র–১৩.৪ : বনভূমির একটি খাদ্যজাল

কাজ: চিত্র ১৩.৩ এ উল্লেখিত খাদ্যজালে যেসব খাদ্য শিকল আছে তা লেখ।

বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টি প্রবাহ (Nutrient flow in ecosystm) : উদ্ভিদ অজৈব বস্তু গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ যে খাদ্য তৈরি করে তার কিছু অংশ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে, অবশিষ্টাংশ উদ্ভিদ দেহেই জমা থাকে। তৃণভোজী প্রাণী এসব উদ্ভিদ খায় এবং পর্যায়ক্রমে মাংসাশী প্রাণীগুলো এসব তৃণভোজীদের খায় । এসব উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মৃত্যুর পর বিয়োজকগুলি এদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে অজৈব বস্তুতে রূপান্তরিত করে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ এসব অজৈব বস্তু গ্রহণ করে এবং পুনরায় খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহার করে থাকে। পুষ্টিদ্রব্যের এরূপ চক্রাকারে প্রবাহিত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে পুষ্টিপ্রবাহ বলে। খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে এরূপ পুষ্টির প্রবাহ বাস্তুতন্ত্রের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

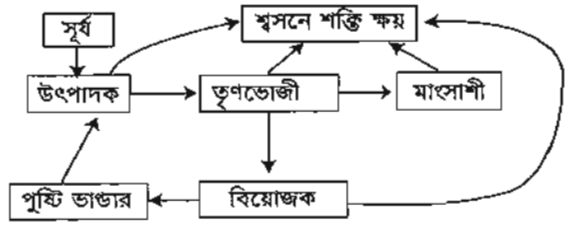

চিত্র–১৩.৫ : পুষ্টিদ্রব্য প্রবাহ এবং শক্তি প্রবাহের সংক্ষিপ্ত চিত্র

বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ (Energy flow in the ecosystem) : যেকোনো বাস্তুতন্ত্রের শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্য থেকে যে পরিমাণ আলো ও তাপশক্তি পৃথিবীতে এসে পৌঁছে তার বড়জোড় ২% সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ বাস্তুতন্ত্রের পরবর্তী ধাপগুলোর জন্য প্রাথমিকভাবে উৎপন্ন শর্করায় রাসায়নিক শক্তি হিসেবে মজুদ করে। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য শিকলের মাধ্যমে উদ্ভিদে জমা হওয়া এই শক্তি বিভিন্ন খাদ্যস্তরে পৌঁছায়। শেষ পর্যন্ত বিয়োজকের কাজের ফলে সকল শক্তি আবার পরিবেশে ফিরে আসে।

তৃণভোজী প্রাণীরা অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের প্রথম স্তরের খাদকেরা সবুজ উদ্ভিদের পাতা, কান্ড, ফুল, ফল, বীজ বা মূল খেয়ে জীবন ধারণ করে। এভাবে সবুজ উদ্ভিদে উৎপাদিত রাসায়নিক শক্তি প্রথমে তৃণভোজী প্রাণীতে পৌঁছে। মাংসাশী প্রাণী যারা প্রথম স্তরের খাদকদের (তৃণভোজী প্রাণীদের) খেয়ে বাঁচে তারাই দ্বিতীয় স্তরের খাদক। প্রথম স্তরের খাদক থেকে এভাবে রাসায়নিক শক্তি দ্বিতীয় স্তরের খাদকের দেহে স্থানান্তরিত হয়। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় স্তরের খাদক থেকে রাসায়নিক শক্তি খাদ্য আকারে তৃতীয় স্তরের খাদকে পৌঁছে। যদি তৃতীয় স্তরের খাদককে আরও উচ্চতর কোনো খাদক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তবে একই প্রক্রিয়ায় শক্তি সর্বোচ্চ স্তরের খাদকে পৌঁছে।

সব জীবে মৃত্যুর পর তার শক্তি গ্রহণ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়। তখন ঐ মৃতদেহে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি বিয়োজকের কাজের ফলে ভেঙে জড় পদার্থ বা শক্তি আকারে পরিবেশে ফিরে আসে। পরিবেশের বিভিন্ন জড় বস্তুর মধ্যে জমা হওয়া এই শক্তি তখন আবার উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী হয়। আর এভাবে খাদ্যচক্রের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রে প্রাকৃতিক শক্তির প্রবাহ চলতে থাকে।

সব ধরনের খাদ্য শিকলেই প্রতিটি স্তরে কিছু শক্তির অপচয় হয়। উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদ থেকে তৃণভোজী প্রাণী যতটা শক্তি গ্রহণ করে তার শরীরে ততটা শক্তি জমা হয় না। আবার দ্বিতীয় স্তরের খাদক তৃণভোজী প্রাণীর দেহ থেকে যে পরিমাণ পুষ্টিদ্রব্য গ্রহণ করে তার নিজের দেহে সে পরিমাণ পুষ্টি পৌঁছে না, কিছুটা জড় পরিবেশে মুক্ত হয়। এভাবে এক জীব থেকে আরেক জীবে খাদ্যশক্তি স্থানান্তরের সময় বেশ কিছু শক্তি বাস্তুতন্ত্রের সাধারণ নিয়মেই এই তন্ত্রের বাইরে চলে যায়। এই কারণে খাদ্য শিকলে খাদ্যস্তরের সংখ্যা যত কমানো যায় শক্তির অপচয় তত কম হয়।

ট্রফিক লেভেলের মধ্যে শক্তির সম্পর্ক : খাদ্য শিকলের প্রতিটি স্তরকে ট্রফিক লেভেল বলে। সে হিসেবে উৎপাদক, প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক ও চূড়ান্ত স্তরের খাদক প্রত্যেকেই এক একটি ট্রফিক লেভেল। বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক প্রথম বা সর্বনিম্ন ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধিত্ব করে। তৃণভোজী খাদক অর্থাৎ প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধি। এভাবে নিম্ন স্তরের মাংসাশী প্রাণি তৃতীয় ট্রফিক লেভেল ও উচ্চ পর্যায়ের মাংসাশী প্রাণী সর্বোচ্চ ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধিত্ব করে। কোনো খাদ্য শিকলের উৎপাদক বা সর্বনিম্ন ট্রফিক লেভেলে সূর্য থেকে যে শক্তি সংগৃহীত হয় পরবর্তী প্রতিটি ট্রফিক লেভেলে তার কিছু অংশ তাপ হিসেবে বেরিয়ে যায়। এজন্য দেখা যায় যে উৎপাদক যে পরিমাণ শক্তি সূর্য থেকে সংগ্রহ করে তা দ্বিতীয় ট্রফিক লেভলে এসে কমে যায়। তৃতীয় বা সর্বোচ্চ ট্রফিক লেভেলে এসে শক্তির পরিমাণ আরও কমে যায়।

শক্তি পিরামিডের ধারণা : ত্রিকোণাকার ভূমির উপর অবস্থিত যে ত্রিমাত্রিক বস্তুর শীর্ষদেশ সরু তাকে পিরামিড (Pyramid) বলে। কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রে ট্রফিক লেভেলের গঠন একটি পিরামিড আকারে দেখানো যায়। খাদ্য শিকলে যুক্ত প্রতিটি পুষ্টিস্তরের শক্তি সঞ্চয় ও স্থানান্তরের বিন্যাস ছককে শক্তি পিরামিড বলে। উৎপাদক স্তরে পরবর্তি ট্রফিক লেভেলগুলোর চেয়ে শক্তির পরিমাণ অনেক বেশি। উচ্চতর ট্রফিক লেভেলের জীব নিম্ন ট্রফিক লেভেলের জীবদের চেয়ে শ্বসন ও অন্যান্য কাজে ক্রমবর্ধমান হারে অধিক শক্তি তাপ হিসেবে হারায়।এজন্য উৎপাদক পিরামিডের ভূমিতে এবং চূড়ান্ত খাদক শীর্ষে অবস্থান করে।

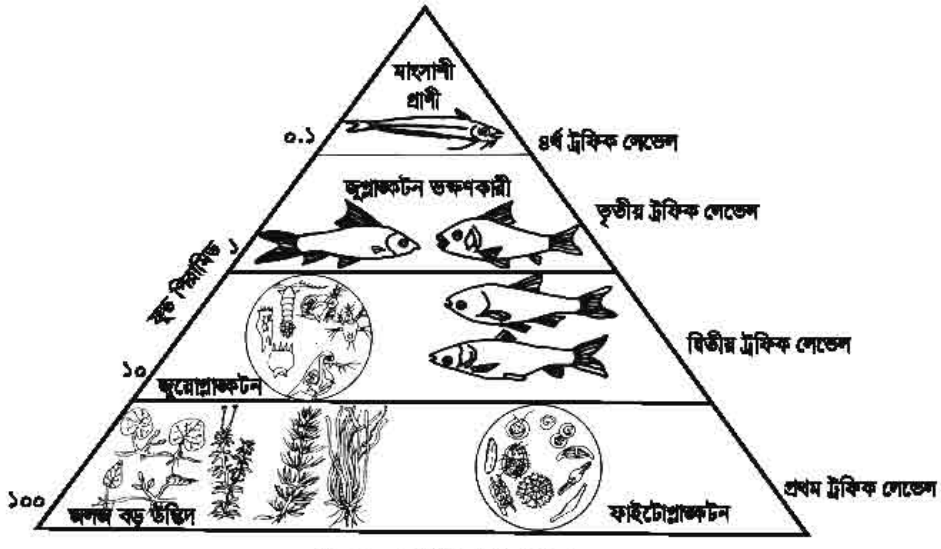

চিত্র ১৩.৬ শক্তির পিরামিড

খাদ্যশিকল সীমিত রাখতে শক্তি পিরামিডের প্রভাব

শক্তির এই প্রবাহ সবসময়েই একমুখী। এ শক্তি প্রবাহকে কখনও বিপরীতমুখী করা যায় না। প্রতিটি ধাপে শতকরা ৮০–৯০ ভাগ শক্তি কমে যায়। শক্তির এ ক্রমবর্ধমান ক্ষয় খাদ্য শিকলের আকারকে ৪ বা ৫টি ধাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। খাদ্য শিকল যত দীর্ঘ হবে উর্ধ্বতম ট্রফিক লেভেলে শক্তির পরিমাণ ততই কমতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এসে কোনো শক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না।

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

জড় ও জীব নিয়ে আমাদের পৃথিবীর পরিবেশ গঠিত। এখানে রয়েছে বহু রকমের জীব ও অজস্র রকমের জড় পদার্থের সমাহার। কত ধরনের জীব আছে আমাদের এই পৃথিবীতে? এর সঠিক হিসেব দেওয়া খুব কঠিন, তবে প্রজাতি (যাদের দৈহিক ও জনন সংক্রান্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পারস্পরিক সাদৃশ্যযুক্ত এবং যারা একই পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত)–এর হিসেবে একে উপস্থাপন করা অনেকটা সহজতর। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ প্রজাতির বর্ণনা ও নামকরণ পাওয়া যায়। প্রতিটি প্রজাতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দিয়ে যেকোনো একটি প্রজাতি অন্যসব প্রজাতি থেকে ভিন্ন ও শনাক্তকরণযোগ্য। যেমন কাঁঠাল একটি প্রজাতি এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়ে একে অন্যান্য প্রজাতি থেকে পৃথক করা সম্ভব। জীবদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকার কারণেই জীব জগৎকে লক্ষ লক্ষ প্রজাতিতে বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আবার মানুষ একটি প্রজাতি। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় সাতশ কোটি মানুষের বাস। এরা সবাই হুবুহু একই রকম নয়, কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যে এরা পরস্পর পৃথক। অর্থাৎ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকে। তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় পৃথিবীতে বিরাজমান জীব সমূহের প্রাচুর্য ও ভিন্নতাই হলো জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)।

জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ

জীববৈচিত্র্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– (১) প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species diversity), (২) বংশগতীয় বৈচিত্র্য (Genetical diversity) ও (৩) বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity)

প্রজাতিগত বৈচিত্র্য : প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলতে সাধারণত পৃথিবীতে বিরাজমান জীবসমূহের মোট প্রজাতির সংখ্যাকেই বুঝায়। কারণ, পৃথকযোগ্য বৈশিষ্ট্যেই এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি ভিন্নতর। যেমন– বাঘের সাথে হরিনের আকার, স্বভাব, হিংস্রতা, সংখ্যা বৃদ্ধির ধরণ ভিন্ন হয়ে থাকে। এক প্রজাতির সাথে অন্য প্রজাতির বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নতাই প্রজাতিগত বৈচিত্র্য।

বংশগতীয় বৈচিত্র্য : একই প্রজাতিভুক্ত সদস্যগণের মধ্যেও অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন একই প্রজাতি কিন্তু তাদের গড়ন, আকার, রোগ–প্রতিরোধ ও পরিবেশ প্রতিকূলতা সহ্য করার ক্ষমতা ভিন্ন। এই পার্থক্যগুলো তৈরি হয় তাদের জিন সংগঠনের সামান্য বৈচিত্র্যের কারণে। কারণ জিনের মাধ্যমেই জীবের বংশগতীয় বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্দিষ্ট জিন থাকে। বিভিন্ন কারণে এই জিনের গঠন ও বিন্যাসের পরিবর্তন হয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং নতুন প্রজাতির উদ্ভব হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় জীবের মধ্যে যে বৈচিত্র্য ঘটে, একেই বলা হয় বংশগতীয় বৈচিত্র্য।

বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য : একটি বাস্তুতন্ত্রের ভৌত উপাদান, রাসায়নিক উপাদান ও জৈবিক উপাদানগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন দেখা দিলে সেখানকার বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটে। এসব পরিবর্তন অবশ্যই ধীর ও ধারাবাহিক। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সেখানে বসবাসরত জীবের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে যে জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য। একটি ছোট পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসতি গড়ে উঠে তা নদীর বাস্তুতন্ত্র থেকে ভিন্নতর। বন, তৃণভূমি, হ্রদ, নদী, জলাভূমি, পাহাড়, সাগর, মরুভূমি প্রভৃতি বাস্তুতন্ত্রে গড়ে উঠে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ এক একটি জীব সম্প্রদায়।

বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের প্রভাব : পরিবেশের উপাদানসমূহ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থেই এই জটিল সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিপুল সংখ্যক জীবের তৎপরতার মধ্য দিয়ে পরিবেশে এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবেশের কেবলমাত্র একটি বিশেষ প্রজাতির বিলুপ্তি বিরাট বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সে কারণে পরিবেশ স্থিতিশীল রাখার জন্য জীববৈচিত্র্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশের যেসব জীব বা প্রাণীকে এক সময় অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত মনে করা হতো সময়ের বিবর্তনে দেখা গেছে সেগুলোই পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের চেকপিক উপকূলে ছিল অসংখ্য ঝিনুক। সেগুলো মাত্র তিনদিনে পরিশুদ্ধ করতে পারত গোটা এলাকার পানি। কিন্তু এখন সেই ঝিনুকের শতকরা ৯৯ ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে অবশিষ্ট ঝিনুকেরা এখন এক বছরেও ঐ পানি পরিশুদ্ধ করতে পারে না। এতে ঐ উপকূলের পানি ক্রমশই কর্দমাক্ত হচ্ছে এবং পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। একটি পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙ একদিনে তার ওজনের সমপরিমাণ পোকা–মাকড় খেতে পারে। এই পোঁকা–মাকড় আমাদের ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু নানা ধরনের কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ব্যাঙ। পাখিদের প্রধান খাদ্যই কীটপতঙ্গ। এর মধ্যে মানুষ ও ফসলের জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গই বেশি। তাছাড়া পরাগায়নের ক্ষেত্রেও পাখির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পেঁচা, ঈগল, চিল ও বাজপাখিকে আমরা শিকারি প্রজাতি বলে জানি। এরা ইঁদুর খেয়ে ইঁদুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রনে রাখে। মানুষের বসতবাড়িতে বসবাসকারী একজোড়া ইঁদুর বিনা বাঁধায় বংশ বিস্তার করলে বছর শেষে ইঁদুরের সংখ্যা দাঁড়াবে

৮৮০ টিতে। কিন্তু একটি পেঁচা দিনে কমপক্ষে তিনটি ইঁদুর খেয়ে হজম করতে পারে। শকুন, চিল ও কাক প্রকৃতির জঞ্জাল সাফ না করলে রোগজীবাণুতে সয়লাব হয়ে যেত পৃথিবী। সে কারণে কোনো জীবকেই অপ্রয়োজনীয় বলা যায় না। পরিবেশ থেকে কোনো প্রজাতি বিলুপ্ত হলে বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিভিন্ন জীবের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া, আন্তঃনির্ভরশীলতা ও পরিবেশের ভারসাম্যতা

সাধারণত সবুজ উদ্ভিদকে স্বনির্ভর বলা হয়, কারণ তারা স্বভোজী (Autotrophic), কিন্তু পরিবেশতাত্ত্বিক দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সবুজ গাছপালাসহ কোনো জীবই স্বনির্ভর নয়। গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীবজন্তু একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত।

একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ পর–পরাগায়নের জন্য (Cross pollination) কীট–পতঙ্গের উপর এবং বীজ বিতরণের জন্য পশুপাখির উপর নির্ভরশীল। প্রাণিকুল শ্বসনক্রিয়া দ্বারা যে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস ত্যাগ করে সবুজ উদ্ভিদকুল সালোকসংশ্লেষণের জন্য তা ব্যবহার করে। আবার সবুজ উদ্ভিদ দিবাভাগে যে অক্সিজেন (O_2) গ্যাস ত্যাগ করে শ্বসনের জন্য প্রাণীকুল তা ব্যবহার করে। তাছাড়া ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও বিভিন্ন প্রকার জীবাণু দ্বারা গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। এক কথায় বলা যায় যে, পারস্পারিক সংযোগ ও নির্ভরশীলতাই জীবনক্রিয়া পরিচালনার চাবিকাঠি। কাজেই জীবজগতে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা ও প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান জৈবিক সম্পর্কগুলোকে সহ–অবস্থান (Symbiosis) নামে আখ্যায়িত করা যায়। আর সম্পর্কযুক্ত জীবগুলিকে সহবাসকারী বা সহ–অবস্থানকারী (Symbionts) বলা হয়। এই সহ–অবস্থানকারী জীবগুলোর মধ্যে যে ক্রিয়া–বিক্রিয়া ঘটে তাকে মিথস্ক্রিয়া বলা হয়। উপরের আলোচনা থেকে এটিও পরিষ্কার হয়েছে যে মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী জীবগুলি পরস্পর আন্তঃনির্ভরশীল, কেহই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবে পরিবেশ বিজ্ঞানী ওডাম (Odum) বলেন যে এই আন্তঃনির্ভরশীল সম্পর্ক দুভাবে হতে পারে, যেমন–

(ক) ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Positive interactions) দ্বারা এবং

(খ) ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Negative interactions) দ্বারা।

(ক) **ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Positive interactions) :** যে আন্তঃসম্পর্কে দুটি জীবের একটি অন্যটিকে সহায়তা করে তাকে ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া বলে। এ ক্ষেত্রে সহযোগীদ্বয়ের একটি বা উভয়ই উপকৃত হতে পারে। লাভজনক এ আন্তঃক্রিয়াকে মিউচুয়ালিজম (Mutualism) ও কমেনসেলিজম (Commensalism) নামে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

মিউচুয়ালিজম (Mutualism) : সহযোগীদের উভয়ই একে অন্যের দ্বারা উপকৃত হয়। যেমন, মৌমাছি, প্রজাপতি, পোকামাকড় প্রভৃতি ফুলের মধু আহরণের জন্য ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় এবং বিনিময়ে ফুলের পরাগায়ন ঘটে। অনেক পাখি এবং বাঁদুড় ফল খেয়ে বাঁচে এবং মল ত্যাগের সাথে ফলের বীজও ত্যাগ করে। এ ভাবে বীজের স্থানান্তর হয় এবং উদ্ভিদের বিস্তার ঘটে। এ বীজ নতুন গাছ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। একটি শৈবাল ও একটি ছত্রাক সহাবস্থান

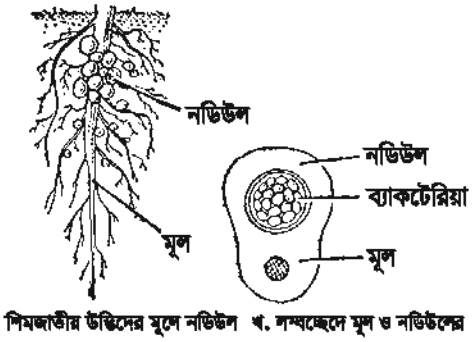

ক. শিমজাতীয় উদ্ভিদের মূলে নডিউল খ. লম্বচ্ছেদে মূল ও নডিউলের

চিত্র ১৩.৭ : মিউচুয়ালিজম

করে লাইকেন গঠন করে। ছত্রাক বায়ু থেকে জলীয়বাষ্প সংগ্রহ এবং উভয়ের ব্যবহারের জন্য খনিজ লবণ সংগ্রহ করে। অপরদিকে শৈবাল তার ক্লোরোফিলের মাধ্যমে নিজের জন্য ও ছত্রাকের জন্য শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। রাইজোবিয়াম (*Rhizobium*) ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় উদ্ভিদের (Leguminous plant) শিকড়ে অবস্থান করে গুটি (Nodule) তৈরি করে এবং বায়বীয় নাইট্রোজেনকে সেখানে সংবন্ধন করে। এই নাইট্রোজেন সহযোগী শিম উদ্ভিদকে সরবরাহ করে এবং বিনিময়ে ব্যাকটেরিয়া সহযোগী উদ্ভিদ থেকে শর্করা জাতীয় খাদ্য পেয়ে থাকে।

কমেনসেলিজম (Commensalism) : এ ক্ষেত্রে সহযোগীদের মধ্যে একজন মাত্র উপকৃত হয়। অন্য সহযোগী সদস্য উপকৃত না হলেও কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেমন, রোহিনী উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে নিজেকে মাটিকে আবদ্ধ করে এবং অন্য বড় উদ্ভিদকে আরোহণ করে উপরে উঠে। এরূপে অন্য বৃক্ষের উপর প্রসারিত হয়ে বেশি পরিমাণে আলো গ্রহণ করে। কাষ্ঠল লতা খাদ্যের জন্য আশ্রয় দানকারী উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে না এবং তার কোনো ক্ষতিও করে না। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ বায়ু থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু আশ্রয়দাতার কোনো ক্ষতি করে না। কিছু শৈবাল অন্য উদ্ভিদদেহের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করে। কিন্তু আশ্রয়দাতার কোনো ক্ষতি করে না।

(ক) রোহিনী উদ্ভিদ

(খ) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ

চিত্র ১৩.৮ কমেনসেলিজম

(খ) ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়া : এ ক্ষেত্রে জীবদ্বয়ের একটি বা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন–

শোষন (Exploitation) : এ ক্ষেত্রে একটি জীব অন্য জীবকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজের অধিকার ভোগ করে। যেমন– স্বর্ণলতা। স্বর্ণলতা হস্টোরিয়া নামক চোষক অঙ্গের মাধ্যমে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ থেকে তার খাদ্য সংগ্রহ করে। কোকিল কখনও পরিশ্রম করে বাসা তৈরি করে না। কাকের বাসায় সে ডিম পাড়ে এবং কাকের দ্বারাই তার ডিম ফোটায়।

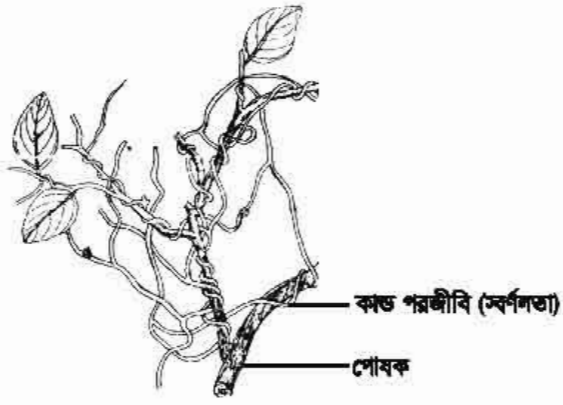

(ক) স্বর্ণলতা ও পোষক উদ্ভিদ

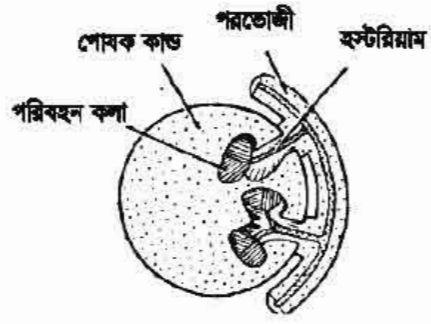

(খ) লম্বচ্ছেদে পোষক–পরভোজী সম্পর্ক

চিত্র ১৩.৯ : পোষন

প্রতিযোগিতা (Competition) : কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আলো, বাতাস, পানি ও খাদ্যের জন্য জীবসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এ প্রতিযোগিতায় সবলরাই টিকে থাকে আর দুর্বলরা বিতাড়িত হয়ে থাকে।

অ্যান্টিবায়োসিস (Antibiosis) : একটি জীব কর্তৃক সৃষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থের কারণে যদি অন্য জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় অথবা মৃত্যু ঘটে তখন সেই প্রক্রিয়াকে অ্যান্টিবায়োসিস বলে অণুজীবজগতের এ ধরনের সম্পর্ক অনেক বেশি দেখা যায়।

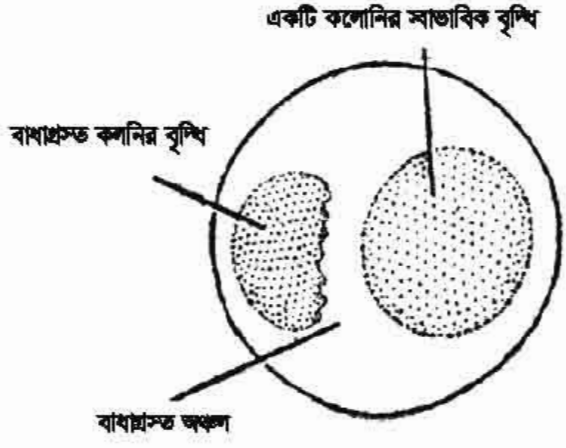

চিত্র ১৩.১০ : এন্টিবায়োসিস

উপরের আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন জীবের মধ্যে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া বিক্রিয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি উপাদান পরস্পরের সাথে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্ক দ্বারা কেউ লাভবান হচ্ছে আবার কেউ ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছে। আর এভাবেই তারা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহটিকে জীবের বসবাসযোগ্য করে রাখার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ অপরিহার্য। এই পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য জীব আর জীবন ধারণের বিভিন্ন উপাদান যেমন মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি। বর্তমান পৃথিবীর অত্যধিক জনসংখ্যার বিভিন্ন ধরনের চাহিদা যেমন– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মেটাতে যেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান। সংকটজনক এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ সচেতন না হয়ে উঠলে বিপর্যয় আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। আমাদের পরিবেশে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃহদাকৃতির প্রাণী বা উদ্ভিদ কেহই অবাঞ্ছিত বা মূল্যহীন নয়। প্রকৃতির রাজ্যে সকল জীব ও জড় পদার্থ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ। লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ, পশু পাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে জীববৈচিত্র্য, যার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে মানব জাতির কল্যাণ ও অস্তিত্ব। অরণ্য, পাহাড়, জলাভূমি, সমুদ্র জীববৈচিত্র্যের অতীব

প্রয়োজনীয় আধার। কাজেই পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে জীববৈচিত্র্য টিকে থাকবে। পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ, জ্বালানি, পানিসহ প্রয়োজনীয় উপকরনাদি পরিবেশ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাবে। পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিশেষ করে বনাঞ্চল ধ্বংস হলে বৃষ্টিপাতের হার কমে যায়, চাষাবাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। গ্রীন হাউস গ্যাস (CO_2, CO, CH_4, N_2O ইত্যাদি) বৃদ্ধি পাবার ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায় যাকে গ্রীনহাউস এফেক্ট (Green houese effect) বলে। গ্রীনহাউস এফেক্ট এর কারণে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাবে ও উপকূল অঞ্চল তলিয়ে যাবে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে, বনাঞ্চল ধ্বংস হবে, বিভিন্ন রোগবালাই এর প্রভাবে ফসলের ক্ষতি হবে, ঝড় জলোচ্ছাস এর তীব্রতা বেড়ে যাবে। পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে গ্রীনহাউস এফেক্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তাই এখন থেকেই পরিবেশ সংরক্ষণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

মানুষ বর্তমানে তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরিবেশকে সংরক্ষণের কথা জোরেশোরে বলা শুরু করেছে। সুস্থ পরিবেশ রক্ষার জন্য সমগ্র বিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলন গড়ে তোলাও জরুরি। বৃক্ষরোপনকে শুধুমাত্র মাস বা সপ্তাহে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিদিন যে গাছ কাটা হবে ঠিক তার দ্বিগুণ গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো এলাকায় শিল্পকারখানা নির্মাণের পূর্বে সেই এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিবেচনা করতে হবে এবং শিল্প বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে হবে। পরিকল্পিত নগরায়ন করতে হবে। নগরায়নের সাথে অবশ্যই বৃক্ষায়ন করতে হবে। জ্বালানি হিসেবে কাঠের পরিবর্তে সৌরশক্তির ব্যবহার করতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে, উপকারী জীবাণু, স্থলজ পোকামাকড় ধ্বংস করে, জলজ ও মাটির বাস্তুতন্ত্রকে নষ্ট করে। কাজেই জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। রসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বিভিন্নভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়। জনসংখ্যা সীমিত রেখে সচেতন ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশ দূষন রোধে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গনসচেনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। প্রচার মাধ্যমকে এ ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্রীন হাউস গ্যাসের উৎপাদন হ্রাস করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমিক্ষয় রোধ করতে প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করতে হবে। এতে যেমন জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় রোধ হবে তেমনি ভূমিক্ষয়ও রোধ হবে। নদী খনন করে, এবং প্রাকৃতিক জলাধারগুলো সংরক্ষণ করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত রাখতে হবে। এতে লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা দূর হবে, পানির বাস্তুতন্ত্র স্বাভাবিক থাকবে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক এবং সেই লক্ষ্যে যে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে তাদেরকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করতে হবে। বায়ু দূষন, পানি দূষন, মাটি দূষন, শব্দ দূষন যাতে না হয় সে রকম সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ নীতিকে যথার্থভাবে অনুসরণ করতে হবে।

কাজ: তোমার এলাকার পরিবেশগত উপাদানসমূহ দূষিত হওয়ার কারণগুলো কী কী তা নির্ণয় কর এবং প্রতিবেদন তৈরি কর।

অনুশীলন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। সিমবায়োসিস কী? ব্যাখ্যা কর।

২। প্লাঙ্কটন বলতে কী বুঝায়?

৩। পরজীবী খাদ্য শৃঙ্খল কাকে বলে?

৪। অ্যান্টিবায়োসিস কাকে বলে?

৫। মিউচুয়ালিজম কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিভিন্ন জীবের মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃনির্ভরশীলতার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে– ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোনটি পরভোজী খাদ্য শৃঙ্খল?

ক. ঘাস হরিণ বাঘ খ. মৃতজীব বিয়োজক অ্যামিবা

গ. জুয়োপ্লাঙ্কটন মাছ হাইড্রা ঘ. সবুজ উদ্ভিদ পাখি শিয়াল

২. কমেনসেলিজম এর মাধ্যমে প্রাণীরা–

i. সহযোগীদের মধ্যে একজন উপকৃত হয়

ii. সহযোগী সদস্য উপকৃত না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

iii. সহযোগীদের উভয়ই উপকৃত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

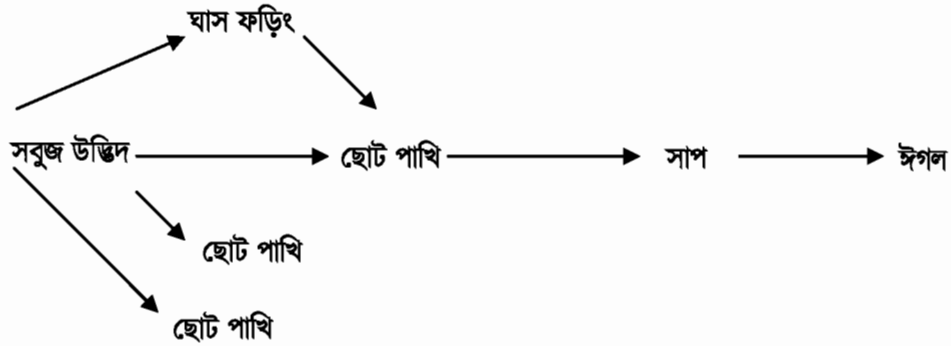

উপরের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

৩. উপরোক্ত চিত্রে কয়টি খাদ্যশৃঙ্খর আছে?

ক. ১ টি খ. ২ টি

গ. ৩ টি ঘ. ৪ টি

৪. উদ্দীপকের আলোকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক কোনটি?

ক. ছোট মাছ খ. শামুক

গ. খরগোশ ঘ. ঘাস ফড়িং

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

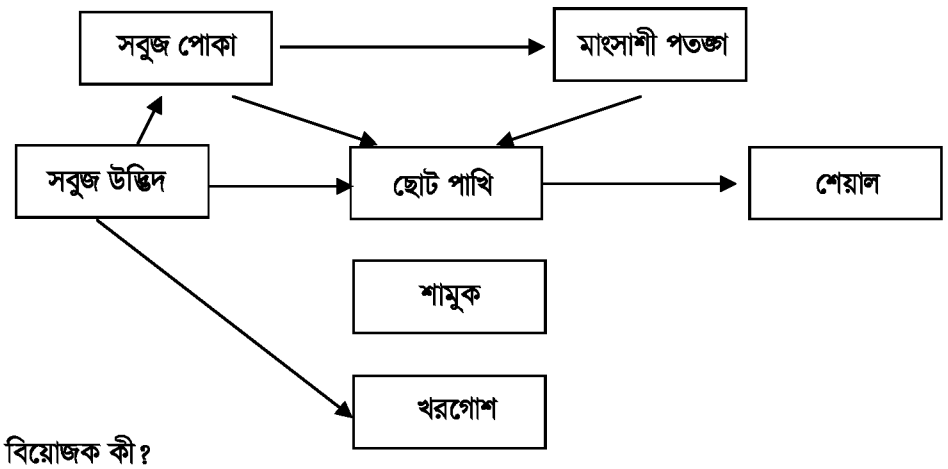

ক. বিয়োজক কী?

খ. খাদ্য জাল কী বুঝিয়ে লিখ?

গ. উপরের খাদ্য জালের কোন খাদ্য শৃঙ্খলটিতে সবচেয়ে বেশি শক্তি ব্যয় হয়, কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপরোক্ত খাদ্য জালে ছোট পাখির বিলুপ্তি ঘটলে বাস্তুতন্ত্রের কী পরিণতি ঘটবে তা বিশ্লেষণ কর।

২.

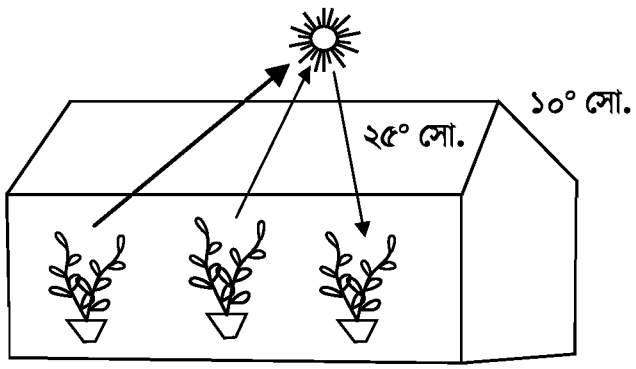

ক. জীববৈচিত্র্য কাকে বলে?

খ. কমেনসেলিজম কী বুঝিয়ে লিখ।

গ. চিত্রে তাপমাত্রা ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে প্রক্রিয়াটির প্রতিক্রিয়া পরিবেশে কী প্রভাব বিস্তার করে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

জীবপ্রযুক্তি

জীবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি (Biotechnology) জীব বিজ্ঞানের একটি ফলিত (Applied) শাখা। যা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহুবিধ সমস্যা সমাধানের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নে, উন্নততর ফসল সৃষ্টিতে, ফসলের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধিতে, পরিবেশ প্রতিরক্ষায় এই প্রযুক্তি ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই প্রযুক্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে জানার চেষ্টা করব।

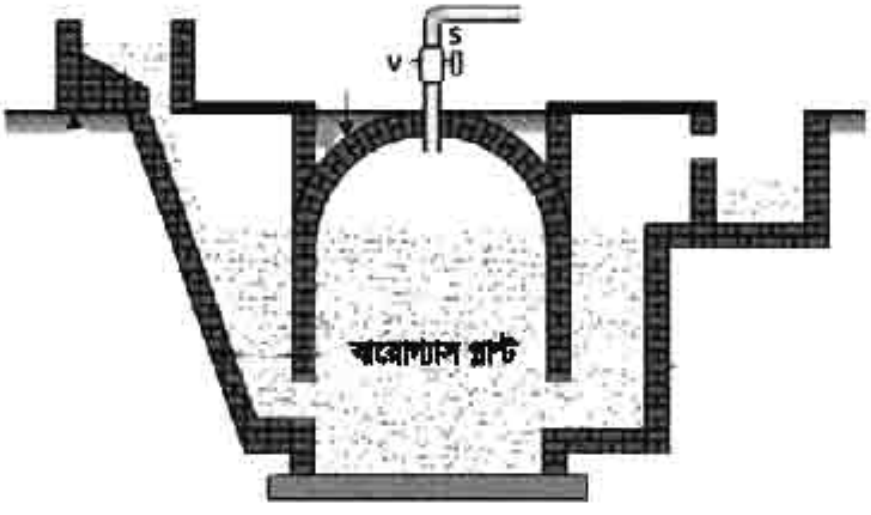

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- জীবপ্রযুক্তির ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- টিস্যু কালচার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শস্য উৎপাদনে টিস্যু কালচারের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শস্য উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- ইনসুলিন এবং হরমোন উৎপাদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- জীবপ্রযুক্তির উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব।
- পশুর রোগ নিরাময়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- জীবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহারের বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- আমাদের প্রতিদিনের জীবনে জীবপ্রযুক্তির অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

জীবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি (Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তি দুটি শব্দ Biology এবং Technology এর সমন্বয়ে গঠিত। Biology শব্দের অর্থ জীব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান এবং Technology শব্দের অর্থ প্রযুক্তি। অর্থাৎ Biology এবং Technology–র আন্ত:সম্পর্কিত বিষয়ই হলো জীবপ্রযুক্তি। ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরিয় প্রকৌশলী কার্লএরেকি (Karl Ereky) সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন। এই প্রযুক্তির প্রয়োগে কোনো জীবকোষ, অনুজীব বা তার অংশবিশেষ ব্যবহার করে নতুন কোনো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব (উদ্ভিদ বা প্রাণী বা অনুজীব) এর উদ্ভাবন বা উক্ত জীব থেকে প্রক্রিয়াজাত বা উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় জীবপ্রযুক্তি কোনো নতুন সংযোজন নয়। মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ জীবপ্রযুক্তির কতিপয় প্রয়োগ শুরু করে। গাঁজন এবং চেলাইকরণের (Fermentation and brewing) মতো প্রযুক্তিজ্ঞান মানুষ প্রায় ৮০০০ বছর আগেই রপ্ত করে। উনিশ শতকে (১৮৬৩) গ্রেগর জোহান মেন্ডেল কর্তৃক কৌলিতত্ত্ব বা জেনেটিক্স–এর সূত্রসমূহ আবিষ্কারের পর থেকে জীবপ্রযুক্তি নতুনরূপে অগ্রযাত্রা শুরু করে। ১৯৫৩ সালে Watson এবং Crick কর্তৃক ডিএনএ ডাবল হেলিক্স মডেল আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় আজকের আধুনিক জীবপ্রযুক্তির উন্মেষ।

জীবপ্রযুক্তির অনেক পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে টিস্যুকালচার (Tissue culture) ও জিন প্রকৌশল (Genetic engineering) পদ্ধতি কৃষি উন্নয়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

টিস্যুকালচার: সাধারণত এক বা একাধিক ধরণের এক গুচ্ছ কোষসমষ্টিকে টিস্যু (Tissue) বা কলা বলা হয়। একটি টিস্যুকে জীবানুমুক্ত পুষ্টিবর্ধক কোন মিডিয়ামে (Nutrient medium) বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়াই হলো টিস্যুকালচার। টিস্যুকালচার উদ্ভিদবিজ্ঞানের একটি অপেক্ষাকৃত নতুন শাখা। উদ্ভিদ টিস্যুকালচারে উদ্ভিদের কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ বা অঙ্গাবিশেষ যেমন পরাগরেণু, শীর্ষ বা পার্শ্বমুকুল, পর্ব, মূলাংশ ইত্যাদিকে কোনো নির্দিষ্ট পুষ্টিবর্ধক মিডিয়ামে জীবানুমুক্ত অবস্থায় কালচার করা হয়। মিডিয়ামসমূহে পুষ্টি ও বর্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান সরবরাহ করা হয়। টিস্যুকালচারের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদের যে অংশ পৃথক করে নিয়ে ব্যবহার করা হয় তাকে 'এক্সপ্ল্যান্ট (Explant) বলে।

টিস্যুকালাচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ

১। **মাতৃউদ্ভিদ নির্বাচন** : উন্নত গুণসম্পন্ন, স্বাস্থ্যবান ও রোগমুক্ত উদ্ভিদকে এক্সপ্লান্টের জন্য নির্বাচন করা হয়।

২। **আবাদ মাধ্যম তৈরি** : উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টি, ভিটামিন, ফাইটোহরমোন, সুক্রোজ এবং প্রায় কঠিন মাধ্যম (Semi-solid medium) তৈরির জন্য জমাট বাঁধার উপাদান, যেমন অ্যাগার (Agar) প্রভৃতি সঠিক মাত্রায় মিশিয়ে আবাদ মাধ্যম তৈরি করা হয়।

৩। **জীবাণুমুক্ত আবাদ প্রতিষ্ঠা** : আবাদ মাধ্যমকে কাচের পাত্রে (টেস্টটিউব, কনিক্যাল ফ্লাস্ক) নিয়ে তুলা বা পলাস্টিকের ঢাকনা দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে অটোক্লেভ (Autoclave) যন্ত্রে ১২১° সে. রেখে তাপমাত্রায়, ১৫ lb/sq. inch চাপে ২০মি. রেখে জীবাণুমুক্ত করা হয়। জীবাণুমুক্ত তরল আবাদকে ঠান্ডা ও জমাট বাঁধার পর এক্সপ্লান্টগুলোকে এর মধ্যে স্থাপন করা (Inoculate) হয়। তারপর কাঁচের পাত্রের মুখ পুনুরায় বন্ধ করে নির্দিষ্ট আলো ও তাপমাত্রা (২৫+২° সে.) সম্পন্ন নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বর্ধনের জন্য রাখা হয়। এই পর্যায়ে আবাদে স্থাপিত টিস্যু বারবার বিভাজনের মাধ্যমে সরাসরি অনুচারা (Plantlets) তৈরি হয় বা ক্যালাস (Callus) বা অবয়বহীন টিস্যুমন্ডে পরিণত হয়। এই টিস্যুমন্ড হতে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে একাধিক অনুচারা (Plantlets) উৎপন্ন হয়।

৪। মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর : এ সমস্ত উৎপাদিত চারাগাছে যদি মূল উৎপন্ন না হয় তবে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা লাভের পর বিটপগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয় এবং তাদেরকে পুনরায় মূল উৎপাদনকারী আবাদ মাধ্যমে স্থাপন করা হয়।

৫। প্রাকৃতিক পরিবেশে তথা মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তর : মূলযুক্ত চারাগুলোকে পানিতে ধুয়ে অ্যাগারমুক্ত অবস্থায় ল্যাবরেটরিতে মাটি ভরা ছোট ছোট পাত্রে স্থানান্তর করা যায়। পাত্রে লাগানো চারাগুলো কক্ষের বাইরে রেখে মাঝে মাঝে বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। পূর্ণাঙ্গ চারাগুলো সজীব ও সবল হয়ে উঠলে সেগুলোকে এক পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাটিতে লাগানো হয়।

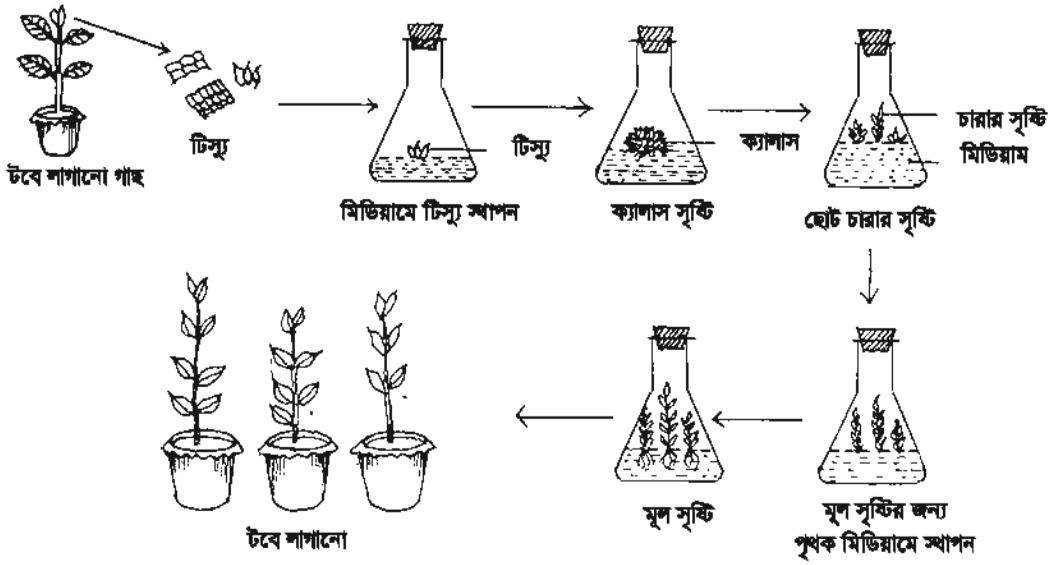

চিত্র ১৪.১ : টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার ক্রমিক পর্যায়

টিস্যুকালচারের ব্যবহার : টিস্যুকালচার প্রযুক্তির কৌশলকে কাজে লাগিয়ে আজকাল উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে এবং উন্নত জাত উদ্ভাবনে ব্যাপক সাফল্য পাওয়া গেছে এবং এ ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর মাধ্যমে উদ্ভিদাংশ থেকে কম সময়ের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অসংখ্য চারা সৃষ্টি করা যায়। সহজেই রোগমুক্ত, বিশেষ করে ভাইরাস মুক্ত চারা উৎপাদন করা যায়। ঋতুভিত্তিক চারা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। স্বল্পসময়ে কম জায়গার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক চারা উৎপাদনের সুবিধা থাকায় চারা মজুদের সমস্যা এড়ানো যায়। যে সব উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না সেগুলোর চারাপ্রাপ্তি ও স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়। বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে টিস্যুকালচার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃত। যে সব ভ্রূনে শস্যকলা থাকে না সে সব ভ্রূন কালচার করে সরাসরি উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। যে সকল উদ্ভিদে যৌনজনন অনুপস্থিত অথবা প্রাকৃতিকভাবে জননের হার কম তাদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যায়। নতুন প্রকৃতির উদ্ভিদ উদ্ভাবনে টিস্যুকালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফরাসী বিজ্ঞানী George Morel (১৯৬৪) প্রমাণ করে দেখান যে, সিম্বিডিয়াম (*cymbidium*) নামক অর্কিড প্রজাতির একটি মেরিস্টেম হতে এক বছরে ৪০ হাজার চারা পাওয়া সম্ভব। উল্লেখ্য যে, সাধারণ নিয়মে একটি সিম্বিডিয়াম উদ্ভিদ হতে বছরে অল্প কয়েকটি চারা উৎপন্ন হয়। থাইল্যান্ড টিস্যুকালচার পদ্ধতির মাধ্যমে একবছরে ৫০ মিলিয়ন অনুচারা উৎপন্ন করে যার অধিকাংশই অর্কিড। এই ফুল রপ্তানি করে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া প্রভৃতি দেশ প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ১৯৫২ সালে মার্টিন নামক বিজ্ঞানি মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে রোগমুক্ত ডালিয়া ও আলুগাছ লাভ করেন।

বর্তমানে মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে কোনো কোনো ভাইরাস রোগাক্রান্ত ফুল ও ফলগাছকে যেমন– আলুর টিউবারকে রোগমুক্ত করা টিস্যুকালচারের একটি নিয়মিত কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। মালয়েশিয়ায় oil palm- এ বংশবৃদ্ধি টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। টিস্যুকালচারের মাধ্যমে চন্দ্রমল্লিকার একটি অঙ্গাজ টুকরা হতে বছরে ৮৮ কোটি চারা গাছ পাওয়া সম্ভব। আইরিস (Iris) এর বিভিন্ন প্রজাতি বা জাতের মধ্যে সংকরায়ন দ্বারা তা হ্রাস করে ২/৩ বছরের পরিবর্তে এক বছরেই সম্ভব হয়েছে। যুঁই (Jasminium) সাম্পেন্‌সান হতে সুগন্ধি আতর এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। উড়োজাহাজ, রকেট প্রভৃতি ভারী ইঞ্জিন চালানোর জন্য এক রকমের তিমি মাছের (Sperm whale) তেলের প্রয়োজন হয়। এই তিমি মাছ ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র জোজোবা (jojoba) নামক গাছ হতে নিষ্কাশিত তেল বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এই গাছ এক বিশেষ মরুভূমির পরিবেশ ছাড়া (যেমন– (Arizona, California) জন্মায় না এবং এদের বংশবৃদ্ধিও অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। টিস্যুকালচারের মাধ্যমে এই গাছের দ্রুত বংশবৃদ্ধি করাই কেবল সম্ভব হয়নি, একে ভারতবর্ষের জলবায়ু উপযোগী করে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশে টিস্যুকালচারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যেমন– বিভিন্ন প্রকার দেশি ও বিদেশি অর্কিডের চারা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। রোগ প্রতিরোধী এবং অধিক উৎপাদনশীল কলার চারা, বেলের চারা, কাঁঠালের চারা উৎপাদন করা হয়েছে। চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস, লিলি, কার্নেশান প্রভৃতি ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করা হয়েছে। কদম, জারুল, ইপিল ইপিল, বক ফুল, সেগুন, নিম প্রভৃতি কাঠ উৎপাদনকারী বৃক্ষের চারা উৎপাদন করা হয়েছে। বিভিন্ন ডাল জাতীয় শস্য, বাদাম ও পাট এর চারা উৎপাদন করা হয়েছে। টিস্যুকালচার প্রয়োগ করে আলুর রোগমুক্ত চারা এবং বীজ মাইক্রোটিউবার উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic engineering)

জীবপ্রযুক্তির বিশেষ রূপ হিসেবে কোষকেন্দ্রের জিনকণার পরিবর্তন ঘটিয়ে জীবদেহের গুণগত রূপান্তর ঘটানোই হলো জিন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। অন্যভাবে বলা যায়, নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA–র পরিবর্তন ঘটানোই হলো ''জিনপ্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে ''রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিও (Recombinant DNA technology) বলা হয়।

এই প্রযুক্তির মাধ্যমে DNA–এর কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এই জীবকে বলা হয় GMO (Genetically Modified Organism) বা GE (Genetically Engineered) বা ট্রান্সজেনিক (Transgenic)।

জিএমও (GMO) বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার ধাপসমূহ :

(ক) কাঙ্ক্ষিত DNA (target DNA) নির্বাচন।

(খ) একটি বাহক নির্বাচন, যার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত DNA খন্ডটি স্থানান্তর করা সম্ভব।

(গ) নির্দিষ্টস্থানে DNA অণুকে ছেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্ট্রিকশন এনজাইম (DNA কে কাটার বিশেষ ধরনের এনাজাইম) নির্বাচন।

(ঘ) ছেদনকৃত DNA খন্ডসমূহ সংযুক্ত করার জন্য DNA লাইগেজ এনজাইম নির্বাচন।

(ঙ) কাঙ্ক্ষিত DNA সহ বাহক DNA এর অনুলিপনের জন্য একটি পোষক (Host) নির্বাচন।

(চ) কাঙ্ক্ষিত DNA খন্ড সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট DNA এর বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়ন।

আধুনিক জীবপ্রযুক্তি বা জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিন স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য অল্পসময়ে সূচারুভাবে স্থানান্তর করা সম্ভব হয় বলে সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবক বা উদ্যোক্তাগণের নিকট প্রচলিত প্রজননের তুলনায় এ প্রযুক্তিটি অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে।

নতুন ফসল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রজননের তুলনায় জিন প্রকৌশল অধিক কার্যকরী, কারণ প্রচলিত প্রজনন প্রক্রিয়ায় জিন স্থানান্তর একই অথবা খুব নিকটবর্তী প্রজাতির মাঝে সীমাবদ্ধ, কিন্তু জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী যে কোনো প্রজাতির মাঝে এক বা একাধিক জিন সরাসরি স্থানান্তর করা সম্ভব। প্রচলিত প্রজননে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। জিন প্রকৌশলের সাহায্যে খুব দ্রুত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণী বা অনুজীব পাওয়া সম্ভব। প্রচলিত প্রজননে কাঙ্ক্ষিত জিনের সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত জিন স্থানান্তর হতে পারে এবং কাঙ্ক্ষিত জিনের স্থানান্তরও অনিশ্চিত। জিন প্রকৌশলে অনাকাঙ্ক্ষিত জিন স্থানান্তরের সম্ভাবনা নেই এবং কাঙ্ক্ষিত জিন স্থানান্তর নিশ্চিত। প্রচলিত প্রজননে কোনো রকম জীবনিরাপত্তা (Biosafety) নিয়ম পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় কিন্তু জিন প্রকৌশলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জীবনিরাপত্তা নিয়ম–নীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। প্রচলিত প্রজননে বিষাক্ততা বা Toxicity পরীক্ষা করা হয় না, কিন্তু জিন প্রকৌশলে বিষাক্ততা বা Toxicity পরীক্ষা করা হয়।

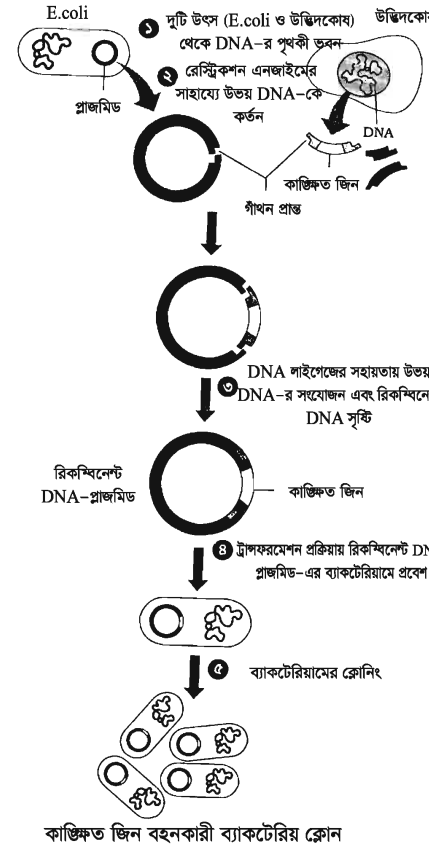

চিত্র ১৪.২ : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি

শস্য উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি হলো সর্বাধুনিক জীব প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন ও উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব সৃষ্টি যা দ্বারা মানুষ সর্বোত্তমভাবে লাভবান হতে পারে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই লক্ষণীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

এই প্রযুক্তির সাহায্যে ক্ষতিকর পোকামাকড় প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন– বিটি ভূট্টা, বিটি তুলা, বিটি ধান (চীনে উদ্ভাবিত) ইত্যাদি। এসব ফল লেপিডোপটেরা (Lepidoptera) এবং কলিওপটেরা (Coleoptera) বর্গের অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষম। উল্লেখ্য *Bacillus thuringiansis* (Bt) নামক ব্যাকটেরিয়ার জিন শস্যে প্রবেশ করানোর কারণে কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত শস্যসমূহকে Bt Corn, Bt Cotton ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হচ্ছে।

এই প্রযুক্তির সাহায্যে ভাইরাস প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন– ভাইরাল কোট প্রোটিনে (Coat Protein) জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে টমেটো মোজাইক ভাইরাস (ToMV), টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV) এবং টোবাকো মাইল্ড গ্রিন মোজাইক ভাইরাস (TMGMV) প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। রিং– স্পট ভাইরাস (PRSV) প্রতিরোধে সক্ষম পেঁপের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। লেট ব্লাইট ছত্রাক প্রতিরোধী জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে লেট ব্লাইট প্রতিরোধী গোল আলুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা চলছে।

জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আগাছানাশক রাসায়নিক পদার্থের বিরূদ্ধে সহনশীলতাসম্পন্ন (Herbicide tolerant) ভূট্টা, তুলা ইত্যাদি ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে বিজ্ঞানীরা আগাছা সহিষ্ণু জিন টমেটোতে স্থানান্তর করে আগাছা সহিষ্ণু (Herbicide tolerant) টমেটো জাত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এভাবে সয়াবিন, ভূট্টা, তুলা, ক্যানোলা (Canola) ইত্যাদি আগাছা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে একই উদ্ভিদে একাধিক বৈশিষ্ট্য (Trait) অনুপ্রবেশ করানো যায়। বাণিজ্যিকভাবে এখন এ ধরণের ট্রানজেনিক উদ্ভিদ সহজলভ্য হয়েছে। যেমন– তুলা এবং ভূট্টার মধ্যে একইসাথে আগাছা সহিষ্ণু (Herbicide tolerant) এবং পোকামাকড় প্রতিরোধী (Insect resistant) বৈশিষ্ট্য অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে।

জিনগত রূপান্তরের মাধ্যমে ফসলের পুষ্টিমান উন্নয়ন করা হয়েছে। যেমন– ধানে ভিটামিন–'এ' তথা বিটা–ক্যারোটিন জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। ধানে লৌহ/আয়রন যোগ করারও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। লবণাক্ততা এবং খরা সহনশীল জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে জিনগত পরিবর্তন (Genetic modification) ঘটিয়ে বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে।

প্রাণীর ক্ষেত্রে : গবাদিপশু যেমন গরুর দুধে আমিষের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য Protein C জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে এটা এখনো গবেষণার পর্যায়ে আছে।

আকার বৃদ্ধি এবং মাংসের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মানুষের বৃদ্ধির জন্য দায়ী হরমোনের জিন স্থানান্তর করে ভেড়ার কৌলিগত পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। ভেড়ার পশমের পরিমান ও গুনগতমান বৃদ্ধির জন্য ব্যাকটেরিয়ার ২ টি জিন, যথা CysE এবং CysM ভেড়ার জিনোমে স্থানান্তর করা হয়েছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে : কৌলিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ইস্ট হতে হেপাটাইটিস বি–ভাইরাসের টিকা (ইন্টারফেরন) তৈরি হচ্ছে।

মানবদেহের ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যবহার করে কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত *E. coli* ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্ট হতে বাণিজ্যিক ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে–যা মানুষের বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত *E. coli* ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্ট হতে মানববৃদ্ধির হরমোন এবং গ্রেনোলুসাইট ম্যাকরোফাজ কলোনি উদ্দীপক উপাদান ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে–এগুলো যথাক্রমে বেটেত্ব, ভাইরাসজনিক রোগ, ক্যানসার, AIDS ইত্যাদির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

মৎস্য উন্নয়নে : মাগুর, কমন কার্প, লইট্টা এবং তেলাপিয়া মাছে স্যামন মাছের বৃদ্ধি হরমোনের (Growth hormone) জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে কৌলিগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এসব মাছের আকার প্রায় ৬০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

পরিবেশ সুরক্ষায় : পেট্রোলিয়াম ও কয়লাখনি এলাকা দূষণমুক্ত কারণ, শিল্পক্ষেত্রে বর্জ্যশোধন পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সহজ ও দ্রুত করার উদ্দেশ্যে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। ড. এম.কে চক্রবর্তী যুক্তরাষ্ট্রে জিন প্রকৌশলের উপর গবেষণা করে নতুন একজাতের Pseudomonas ব্যাকটেরিয়া তৈরি করেছেন যা পরিবেশের তেল ও হাইড্রোকার্বনকে দ্রুত নষ্ট করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে সক্ষম।

কাজ–১: জীবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার বিষয়ে পোস্টার অংকন কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপনকর।

কাজ–২: বাংলাদেশের জীবপ্রযুক্তি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি কর ও শিক্ষকের নিকট জমা দাও।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। কীভাবে আবাদ মাধ্যম তৈরি করা হয়?

২। টিস্যুকালচার বলতে কী বুঝ?

৩। এক্সপ্ল্যান্ট কী?

৪। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?

৫। ট্রান্সজেনিক কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নতজাত উদ্ভাবনে টিস্যুকালচার প্রযুক্তির ভূমিকা উল্লেখ কর।

২। শস্য উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভূমিকা আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. DNA কাটার জন্য বিশেষ এনজাইম কোনটি?

ক. লাইগেজ খ. রেস্ট্রিকশন

গ. লেকটেজ ঘ. লাইপেজ

২. জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ হয়–

i. গাঁজনে

ii. টিস্যুকালচারে

iii. ট্রানজেনিক জীব উৎপন্নে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ইমতিয়াজ তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে খুবই ভালো জাতের একটি বেল গাছের সন্ধান পেল। সে হুবুহু একই বৈশিষ্ট্যের চারা উৎপাদনের জন্য গাছটির পার্শ্বমুকুল নিয়ে এলো এবং তার বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান ল্যাবে এর চারা তৈরি করল।

৩. ল্যাবে ইমতিয়াজের গৃহীত প্রক্রিয়াটি কী?

ক. জীন স্থানান্তরকরণ খ. হরমোন প্রয়োগ

গ. এনজাইমের ব্যবহার ঘ. টিস্যুকালচার

৪. ল্যাবে ইমতিয়াজ কার্যক্রমের ক্রমানুযায়ী ধাপগুলো কোনটি?

ক.	আবাদ মাধ্যম তৈরি এক্সপ্লান্ট স্থাপন অনুচারা উৎপাদন মূল উৎপাদন প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর
খ.	আবাদ মাধ্যম তৈরি অনুচারা উৎপাদন মূল উৎপাদন এক্সপ্লান্ট স্থাপন প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর
গ.	মাতৃউদ্ভিদ নির্বাচন আবাদ মাধ্যম তৈরি একপ্লান্ট স্থাপন অনুচারা উৎপাদন প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর
ঘ.	মাতৃউদ্ভিদ নির্বাচন আবাদ মাধ্যম তৈরি ক্যালাস তৈরি ক্যালাস তৈরি প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জিন প্রকৌশলী ড: হায়দারের বাগানের লেবু গাছগুলোতে প্রচুর লেবুর ফলন হলেও গাছগুলো দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তিনি লক্ষ করলেন তার বাড়ির পাশের জঙ্গলে একজাতের লেবু গাছ রয়েছে যাতে খুব একটা লেবু না হলেও গাছগুলো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। এ দুটি লেবুর জাত থেকে তিনি অধিক ফলনশীল রোগ প্রতিরোধী একটি জাত উদ্ভাবন করলেন। তিনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এর চারা উৎপাদন না করে ল্যাবে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এর চারা তৈরি করলেন।

ক. জীব প্রযুক্তি কী?

খ. GMO বলতে কী বুঝায়?

গ. ড: হায়দারের লেবু গাছের জাত উন্নয়নের কৌশল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ড: হায়দারের বিশেষ প্রক্রিয়ায় চারা তৈরি করার কারণ বিশ্লেষণ কর।

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য
MyMahbub.Com

২০১৩
শিক্ষাবর্ষ
৯,১০–জীববিজ্ঞান

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জ্ঞান মানুষকে সুবিবেচক করে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা বাংলাদেশ

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :